নক্ষত্রলোকের দেবতাত্মা

নারায়ণ সান্যাল



নক্ষত্রলোকের দেবতাত্মা

নারায়ণ সান্যাল

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

॥ কৈফিয়ৎ ॥

'প্রব্যাবিলিটি' বা সম্ভাব্যতার বিচারে অধিকাংশ জ্যোতির্বিজ্ঞানীই আজ বিশ্বাস করেন—সৌরমণ্ডলে না হলেও বহির্বিশ্বে জীব আছে। কেন, তা জানতে হলে আপনাকে পড়তে হবে স্যার জেমস্ জীনস্, জর্জ গ্যামো, বার্ট্রাণ্ড রাসেল প্রভৃতির বই। সাম্প্রতিক কালে দানিকেন একাধিক গ্রন্থ রচনা করে বলতে চেয়েছেন—সম্ভবতঃ বহির্বিশ্বের সেই উন্নততর সভ্যতার প্রতিনিধিরা প্রাগৈতিহাসিক যুগে পৃথিবীতে পদার্পণ করেছিলেন। বিজ্ঞান এখনও তা মেনে নেয়নি। কিন্তু বহির্বিশ্বের সেই জীবদের সঙ্গে সৌরমণ্ডলের এই তৃতীয় গ্রহের বাসিন্দাদের সাক্ষাৎকে মূলধন করে বহুদিন ধরেই কথাসাহিত্যিকেরা বিজ্ঞানভিত্তিক উপন্যাসের জাল বুনেছেন। ভলতেয়ার, এইচ জি. ওয়েলস্ থেকে শুরু করে এ যুগের আর্থার, সি ক্লার্ক পর্যন্ত অনেকেই। তাহলে সেই একই বিষয়বস্তু নিয়ে এ গল্প কেন ফাঁদলুম? তার কৈফিয়ৎ দিই:

প্রথমতঃ 'বিশ্বাসঘাতক' গ্রন্থের জনপ্রিয়তা আমাকে উৎসাহ যুগিয়েছে। সেবার কাহিনীর সঙ্গে পারমাণবিক বোমা নির্মাণের কলাকৌশল মিশিয়ে যে বৈজ্ঞানিক আলোচনা করেছিলাম, সেটা ব্যর্থ হয়নি। তত্ত্বটা ছিল অত্যন্ত দুরূহ—তবু পাঠক পাতা উল্টে পড়েননি। এবার তাই আরো বেশী দুরূহ তাত্ত্বিক আলোচনায় নেমেছি। 'আপেক্ষিকতা-বাদ' এবং 'Space-Time Continuum' নিয়ে বাঙলাভাষায় কোন গ্রন্থে এ-জাতীয় আলোচনা হয়ে থাকলে তা আমার নজর এড়িয়েছে। ইংরাজীতে ঐ অত্যন্ত কঠিন গাণিতিক-সূত্র নিয়ে একাধিক 'পপুলার' বই আছে; যাঁরা ইংরাজী ভালো জানেন না অথচ যাঁরা কৌতূহলী তাঁরা হয়তো এ গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়টি আগ্রহ নিয়ে পড়বেন। এই আমার আশা।

দ্বিতীয়তঃ আমি লক্ষ্য করে দেখেছি,—প্রত্যেক কথাসাহিত্যিক দেখিয়েছেন, বহির্বিশ্বের সেই উন্নত-সভ্যতার জীবদের কাছে আমরা, মানুষেরা, চূড়ান্তভাবে হেরে গেছি। সেটাই স্বাভাবিক—অস্বীকার করব না। অসীম মহাকাশ পাড়ি দিয়ে যাঁরা পৃথিবীতে এলেন আমাদের কাছে, যে-আমরা চাঁদে যেতেই হিমসিম খাচ্ছি, তাঁরা জ্ঞানে-বুদ্ধিতে-কারিগরী বিদ্যায় যে আমাদের গো-বেড়েন দেবেন এটাই তো আশঙ্কা করার। বুদ্ধিবৃত্তিতে মহম্মদের কাছে পর্বত পারবে কেন? তাই ভল্‌তেয়ারের দানবাকৃতি নক্ষত্রান্তরের জীবের কাছে মানুষ

নতজানু, ওয়েল্‌স্‌-এর 'ওয়র অব্ দ্য ওয়ার্ল্ডস' কাহিনীতে মানুষ মঙ্গল-গ্রহবাসীর কাছে পরিত্রাণ পেল নিতান্ত দৈব-দাক্ষিণ্যে—যেন বৃষ্টির কৃপায় 'ইনিংস্ ডিফীট্' এড়ানো গেল। আর্থার ক্লার্কের '2001—A Space Odyssey'—বস্তুতঃ যে গ্রন্থের ছায়াবলম্বনে এ গ্রন্থ রচিত, সেখানেও পৃথিবী গো-হারান্ হেরে গেছে।

আমার মন মানেনি। এটা কেমন কথা? 'ইনিংস্-ডিফীট্' আমাদের অনিবার্য নিয়তি, মানছি। কিন্তু তাই বলে কি ওরা একটাও 'ওভার-বাউণ্ডারি' দেবে না? আর্কিমিডিস্-গ্যালিলেও-নিউটন-আইনস্টাইনের উত্তর-সাধক কি একবার, অন্ততঃ একবার, ক্রীজ্ ছেড়ে বেরিয়ে এসে তেমন একটা লুজ বল তেড়ে 'ওভার-দ্য-বোলার' ফেরত পাঠাতে পারবে না?

নারায়ণ সান্যাল

১৯৭৫

॥ আশির দশকের 'কৈফিয়ৎ' ॥

গ্রন্থটি রচনার পর এক যুগ অতিক্রান্ত—যদি দ্বাদশবর্ষকালকে 'যুগ' বলে ধরা যায়। ইতিমধ্যে বিজ্ঞান অনেক-অনেকটা পথ পাড়ি দিয়েছে। আইনস্টাইনের সূত্রগুলির নানান নূতন ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। আমি কিন্তু আলডুস্ হাক্সলের পদাঙ্ক-অনুসরণে এই সংস্করণে কোনও তথ্যগত পরিবর্তন করছি না। হাক্সলে তাঁর 'ব্রেভ নিউ ওয়ার্ল্ড' লিখেছিলেন ১৯৩২-এ; পরবর্তী সংস্করণে তার কোনও তথ্যগত পরিবর্তন করেননি, যদিও ততদিনে পরমাণুর অন্তর বিদীর্ণ হয়েছে। বরং তিনি লিখেছিলেন, 'ব্রেভ নিউ ওয়ার্ল্ড' রিভিজিটেড' (১৯৫৯)। আর্থার সি. ক্লার্কও তাঁর 'স্পেস ওডিসি 2001' কে অপরিবর্তিত রেখে রচনা করেছিলেন, 'স্পেস ওডিসি 2010'।

আমি স্বভাবগতভাবে পল্লবগ্রাহী। 'নক্ষত্রান্তরলোকে'র কথায় আমার মন নেই। বর্তমানে মেতে আছি কীট-পতঙ্গ নিয়ে। সারা গায়ে মহানন্দে মাখছি এই 'মধুময় ধরণীর ধূলি'-ই!

আশা করি আপনারা আমাকে মার্জনা করবেন।

নারায়ণ সান্যাল

২৬. ৪. ১৯৮৭

প্রথম পর্ব

স্থান : পৃথিবী

কাল : ৬,০০,০০০ খ্রীষ্টপূর্ব (আঃ)

পাত্র : নাম নাই

॥ এক ॥

পশ্চিম-গোলার্ধে নিউ ইয়র্ক নামে একটি মহতী নগরী আছে ; তাহার অনতিদূরে প্রটেস্টান্ট ধর্মাবলম্বনকারীদের নির্মিত রিভার-সাইড চার্চে যদি উপস্থিত হও দেখিতে পাইবে মন্দিরগাত্রে ছয়শতজন মহামানবের মর্মরমূর্তি। সৌরজগতের পৃথিবী নামক এই তৃতীয় গ্রহে সভ্যতার উষামুগ হইতে যে সকল সংখ্যাতীত জ্ঞানী-গুণী-পাণ্ডিতনিচয় মানব-সভ্যতাকে ক্রমোন্নতির তুঙ্গে উপস্থাপিত করায় সচেষ্ট হইয়াছেন তাঁহাদের ভিতর সুনির্বাচিত মাত্র ছয়শতজন যুগাবতার। বুদ্ধ-পিথাগোরাস-গ্যালিলেও-লেওনার্দো-নিউটন-আইনস্টাইনের সেই সংকীর্ণ সীমিত নির্বাচনে আমার এ-কাহিনীর নায়ক-নায়িকাকে তুমি খুঁজিয়া পাইবে না। সে দুর্ভাগ্যের হেতু দ্বিবিধ। প্রথমতঃ ইতিহাস ঐ দম্পতির সন্ধান পায় নাই, নাম শোনে নাই ; দ্বিতীয়তঃ আমার নায়ক-নায়িকা দুর্ভাগ্যবশতঃ 'মানব-মানবী' নামে চিহ্নিত হইবার উপযুক্তও নহে। তাহা না হইলে উক্ত ছয়শতজন স্বনামধন্য যুগান্ত-কারী মানবকের পংক্তিতে উহারাও অমরত্ব লাভ করিত।

ইতিহাস যে উহাদের নাম শোনে নাই তাহার কারণটিও বড় বিচিত্র। বস্তুত-পক্ষে উহাদের আদৌ কোন নাম ছিল না। 'নাম' দিয়া 'রূপ'কে চিহ্নিত করিবার যুগ তখনও অনাগত। নাম নাই, কিন্তু নামহীন রূপের কাহিনী কেমন করিয়া শুনাইব? আসুন, কাহিনীর উপরোধে আমরাই উহাদের নামকরণ করিয়া লই। মনে করা যাউক—আমার নায়কের নাম 'যূথচ্যুত' এবং নায়িকার নাম 'তমসি'। পাঠক এক্ষণে একটি সঙ্গত প্রশ্ন করিতে পারেন : এরূপ সৃষ্টিছাড়া নামকরণ কেন করিলাম? তথাস্তু! সেই কৈফিয়ৎটাই সর্বাগ্রে পেশ করি—

উহাদের আবাস একটি প্রায়লম্ব পর্বতের গুহায়। পার্বত্য সানুদেশের পঞ্চাশ হস্ত পরিমিত নিম্নে একটি আদিম অরণ্যভূমি। পূর্ব হইতে পশ্চিমে সে অরণ্যভূমির দৈর্ঘ্য পরিমাপ করা যায় না—প্রাগৈতিহাসিক যুগের সে যোজনব্যাপী অরণ্যভূম যেন মহাকাশের সহিত প্রতিযোগিতায় দিগন্তে অবলুপ্ত। পরন্তু বিস্তারে সে বন-ভূমি অর্ধক্রোশেরও অনধিক। সেই ভয়ংকরী অরণ্যভূমের অন্ধকার এতাবৎকাল অতিকায় সরীসৃপদলের পদসঞ্চারে ছিল রহস্যময় ; সেই জুরাসিক-যুগের বক্ষপদ দানবকুল দীর্ঘদিন-পূর্বেই জীবন-সংগ্রামে চূড়ান্ত পরাজয় স্বীকার করিয়া জীব-ইতিহাসের মহানেপথ্যে চলিয়া গিয়াছে—রাখিয়া গিয়াছে ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত কিছু অতিকায় জীবাশ্ম। ঐ অর্ধক্রোশব্যাপী অরণ্যভূম ভেদ করিয়া যদি দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হও তাহা হইলে উপনীত হইবে স্বর্ণবালুকাশোভিত এক নদীবেলায়। নামগোত্রহীনা সুবিস্তীর্ণ গৈরিকবসনা এক স্রোতস্বিনীর উপকূলে। উহাদের নিজেদেরই নাম নাই, নদীপর্বতের নাম উহারা কোথায় পাইবে? উহারা না জানুক, জনান্তিকে তোমাদের জানাইতে পারি—কিঞ্চিনূন পঞ্চলক্ষ বৎসরকাল অতিক্রান্ত হইলে নদীটির অভিধা হইবে হোয়াংহোর উপনদী 'য়াং-হো', সানুমানের নাম চৌখৌতিয়েন এবং অঞ্চলটার—উত্তর-চীনখণ্ড। অর্থাৎ যে রঙ্গমঞ্চে আমাদের

এই নাটকটি অভিনীত হইতেছে পঞ্চলক্ষ বৎসর পরে তাহার পরিচয় হইবে—মহা-চীনের রাজধানী পিকিঙ শহরের দক্ষিণ উপকণ্ঠে।

স্থান, কাল এবং পাত্র। স্থানের বর্ণনা দিয়াছি, কালকে চিহ্নিত করিয়াছি। বাকি আছে পাত্র। আমার আখ্যায়িকার নায়ক-নায়িকা উভয়েই সম্পূর্ণ উলঙ্গ। গাত্রচর্মে রোমরাজির আধিক্য। হনু ও চিবুকের অস্থি দৃঢ়নিবদ্ধ, করোটি অপ্রশস্ত, গাত্রচর্ম পিঙ্গলাভ। চতুষ্পদ নয়, নিম্নভাগের পদদ্বয়ে দেহভার রক্ষিত করিয়া সঞ্চরণে সমর্থ; ভাষা আয়ত্তে আসে নাই—জান্তব দুই-চারিটি শব্দ করিতে পারে মাত্র, যাহা শ্রবণ করিয়া স্বজাতীয়রা বুঝিতে পারে, মূল ব্যঞ্জনাটা কী জাতীয়—ত্রাস, উল্লাস অথবা সোহাগ। ইতিপূর্বেই বলিয়াছি আমার নায়ক-নায়িকা মনুষ্য নহে। মনুষ্য নহে, তবে কী? প্রত্যুত্তরে বলিব—উহারা 'প্রায়মানব', আরও সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করিতে হইলে বলা উচিত 'দণ্ডায়মান-প্রায়মানব'; মানব-বিজ্ঞান শাস্ত্রে যাহাদের অভিধা 'হোমো ইরেক্টাস্'। প্রকৃত মানব বলিতে যদি 'হোমো স্যাপিয়েন্স' বুঝি, তাহা হইলে বিবর্তনের পথে মানবের আবির্ভাব হইতে অন্যূন সার্ধ-দুইলক্ষ বৎসর বাকি আছে।

প্রাগৈতিহাসিক মেজোজোয়িক-কল্পের অতিকায় ডাইনোসরসব মৃত—তাহার পরিবর্তে বিশ্বরঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হইয়াছে নূতন কুশীলবদল—স্তন্যপায়ী জীব। জীবন-সংগ্রামের নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাত নিরবচ্ছিন্নভাবেই বর্তমান—প্রবীণা পৃথিবীর নবীন অধীশ্বর যে কে হইবে তাহা এখনও অনিশ্চিত। নক-আউট টুর্নামেণ্টে একে একে সকলেই প্রতিযোগিতার আসর হইতে সরিয়া দাঁড়াইতেছে; শেষ-সংগ্রামে বিজয়ী হওয়ার সম্ভাবনা মাত্র দুইটি প্রতিযোগীর ভিতর সীমিত। সে দুইজন প্রতিযোগী হইতেছে—ঐ প্রায়-মানব হোমো ইরেক্টস্ এবং কৃপাণদন্তী ব্যাঘ্র। প্রায়মানবদের তূণে ব্রহ্মাস্ত্রটি হইতেছে উহাদের ঐ চতুষ্পদী হইতে দ্বিপদীতে উত্তরণ। সম্মুখভাগের দুইটি চরণকে উহারা ভারমুক্ত করিয়াছে, তিন-চারি লক্ষ বৎসরের বিবর্তনেই তাহারা ঐ সম্মুখভাগের পদদ্বয়ের অঙ্গুলিকে সঞ্চালন পদ্ধতি শিখাইয়াছে। প্রস্তরখণ্ড উৎক্ষেপণ এক্ষণে তাহার আয়ত্তাধীন; বিশেষ জাতের প্রস্তরখণ্ড ঘষিয়া কৃত্রিম নখ-দন্ত উদ্ভাবনে পারদর্শী। অতিকায় ম্যামথ অথবা লোমশ গণ্ডারের দল অসীম শক্তির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তাই ঐ প্রায়মানবদের সম্মুখীন হইতে সাহসী হয় না। প্রায়মানব গোষ্ঠীর একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী তখন এই পৃথিবীতে—ঐ কৃপাণদন্তী ব্যাঘ্র বা স্যেবর্ টুথ্‌ড্ টাইগার। দন্তী, নখীই শুধু নয় অত্যন্ত ক্ষিপ্রগতি, অমিত শক্তির অধিকারী তাহারা। জীবন-সংগ্রামে অন্যূন চারিকোটি বৎসর ধরিয়া তাহারা এই দুনিয়ার দখলদার। বিনা রণে ঐ প্রায়মানবদের সে সূচ্যগ্রভাগ মেদিনীর দখল ছাড়িতে রাজী নহে।

মানুষ না হইলেও উহারা প্রায়মানব তো বটে। সে-ক্ষেত্রে আমার নায়ক-নায়িকা এমন নির্জন পর্বতকন্দরে অন্তেবাসীর জীবনযাপন করে কেন? প্রায়-মানবেতর স্তরের প্রায় সকল প্রকার স্তন্যপায়ী জীবই তো যূথবদ্ধতায় বিশ্বাসী। একতাই যে বল, যৌথ-আক্রমণই যে জীবন সংগ্রামে শ্রেষ্ঠ যুদ্ধকৌশল এ সহজাত-বোধ তো সকল প্রকার অনুন্নত জীবেও বর্তমান। তাহাদের তুলনায় ঐ প্রায়-

মানবদের বুদ্ধি-বৃত্তি অনেক বেশী প্রখর—পরিমাপ করিতে পারিলে দেখিতে, উহাদের মস্তিষ্কের আয়তন প্রায় এক লিটার, সহস্র সি. সি.—তাহা হইলে ? এই সমস্যা সমাধানে যদি সফলকাম হইতে পার তবেই বুঝিবে কেন ঐ রিভার-সাইড চার্চে তাহাদের যুগলমূর্তি প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব পরিচ্ছেদের প্রথমেই করিয়াছিলাম !

কিঞ্চিদধিক এক বৎসর পূর্বে ঐ যূথচ্যুত ছিল প্রায়মানব দলভুক্ত একজন সামান্য অসভ্য। সেই প্রায়মানব-যূথের নিবাস বেশী দূরে নহে। ঐ গুহামুখ হইতে পর্বতগাত্র বাহিয়া দশহস্ত পরিমাণ ভূমি অবতরণ করিয়া পূর্বাভিমুখে চাহিলেই পাষাণগাত্রে মধুচক্রের কোষের ন্যায় অসংখ্য অকৃত্রিম গুহা নজরে পড়িবে। ঐ গুহাগুলিই প্রায়মানব গোষ্ঠীর আবাসস্থল। লোমশ-সর্দারের নেতৃত্বে ঐ পর্বতকন্দরগুলিতে বাস করে কিঞ্চিদধিক দ্বিশত প্রায়মানব। স্ত্রী-পুরুষ, যুবক-যুবতী, কিশোর-কিশোরী ও শিশুর দল। না, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা নাই। পঞ্চাশোর্ধ্বে উপনীত হওয়া প্রায়মানবদিগের নিকট এক দুর্লভ সৌভাগ্য। জীবন-সংগ্রামে সেযুগে মৃত্যুর দাবীটাই সমধিক। লোমশ-সর্দার উহাদের দলপতি। শক্তিশালী সে, যূথচ্যুতের তুলনায় তাহার দেহাবয়ব যথেষ্ট পরিমাণে সুগঠিত, অধিক পরিমাণে পেশীবহুল। তথাপি যূথচ্যুতকে লোমশ রীতিমত সমীহ করিয়া চলে। কারণটা কী, তাহা লোমশের স্মরণ নাই ; কিন্তু তাহার অপরিণত মস্তিষ্কের অবচেতনে ঐরূপ একটা নির্দেশকে যেন চিরস্থায়ীভাবে মুদ্রাঙ্কিত করিয়া দিয়াছে : যূথচ্যুতকে পরিহার করাই মঙ্গল। তদ্ভিন্ন এক অহেতুকী কৃতজ্ঞতাবোধও আছে। কেন, তাহার ব্যাখ্যা দিতে পারিবে না লোমশ—কিন্তু মনোভাবটা কি-জানি কেন ঐরূপই।

ইহাই স্বাভাবিক। প্রত্যক্ষ বর্তমান ভিন্ন আর সব কিছুই উহাদের নিকট কুহেলিকাচ্ছন্ন। অতীত বলিয়া কিছু নাই। অতীতের স্মৃতি অসিদ্ধ ; তবু অতীত অভিজ্ঞতার কোন কোন ফলশ্রুতি দুরপনেয় মুদ্রায় মস্তিষ্কে ছাপ ফেলিয়া যায়। পর্বতারোহণের সময় একবার লোমশের পদচ্যুতি ঘটিয়াছিল, পতন-জনিত আঘাতটা স্মরণে নাই,—কিন্তু আজও সে পর্বতগাত্র হইতে অবতরণের সময় সাবধান হয়। যূথচ্যুতের প্রতি ওর মনোভাবটাও একই প্রকারের। সেটা প্রায় তাহার সহজাত সংস্কারের সমপর্যায়ী। আসল কারণটা এই প্রকার :

কিঞ্চিদধিক বৎসর-খানেক পূর্বেকার কথা। তখন যূথচ্যুত ছিল উহাদের দলভুক্ত একজন। যূথচ্যুতের সঙ্গিনীও ছিল সে-দলে। লোমশ তখনও দলপতি হয় নাই, দলের অবিসংবাদিত নেতা ছিল দন্তুর সর্দার। অসীম বলশালী সে, মত্ত হস্তীর ন্যায় তাহার আকার ও ব্যবহার। কেহ কোনদিন তাহার নেতৃত্বে সন্দেহ প্রকাশ করার ধৃষ্টতা দেখায় নাই। দন্তুরের শ্বদন্তটি ছিল অস্বাভাবিক—মুখবিবর বন্ধ থাকিলেও বন্য বরাহের ন্যায় শ্বদন্তটি প্রকট থাকিত। বয়স বোধ করি পঞ্চত্রিংশ ; যূথচ্যুতের অপেক্ষা প্রায় দশ বৎসরের জ্যেষ্ঠ। মধুচক্র গুহা-কন্দরে দলপতি দন্তুরের নির্দেশে উহাদের জীবন পরিচালিত। প্রভাত-সূর্যের প্রথম আলোকরশ্মি গুহাকন্দরে প্রবেশ করিবার পূর্বেই দন্তুর গুহামুখে আসিয়া দাঁড়াইত। চতুর্দিকে সতর্ক দৃক্‌পাত করিয়া একটি হুঙ্কার ছাড়িত। অতঃপর

শ্রেণীবদ্ধভাবে ঢাল্ পর্বতগাত্র বাহিয়া সকলে নামিয়া আসিত নিম্নের অরণ্যভূমে। সম্মুখে ও পিছনে পুরুষ, মধ্যস্থলে স্ত্রীজাতীয়া এবং শিশুরা, দলের পুরোভাগে স্বয়ং দন্তুর। আসিত নদীর কিনারে। অঞ্জলি ভরিয়া নহে, চতুষ্পদের অনুকরণে নদীজলে অধরোষ্ঠ নিমজ্জিত করিয়া আকণ্ঠ জলপান করিত। তৎপরে আহার্য অন্বেষণ। ফলমূল আহরণ ও শিকার। স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে। প্রস্তরখণ্ড সূচ্যগ্র করিতে শিখিয়াছে, ছুঁড়িয়া মারিতেও জানে। ভাষা নাই, আগুনের ব্যবহার জানে না—আগুনকে অত্যন্ত ভয় পায়। কাষ্ঠখণ্ডের এক প্রান্তে কোনও প্রস্তরকে রজ্জুবদ্ধ করিয়া ঘুরাইয়া মারিতে পারিলে যে আঘাত গুরুতর হইতে পারে এ বোধ তখনও জন্মে নাই। তবু শিকার জোটে ; কারণ তৃণভোজী সে প্রাগৈতিহাসিক অরণ্যে পর্যাপ্ত। তাহাদের কাহারও মস্তকে সহজাত যুগল সূচ্যগ্র প্রস্তরখণ্ড ; কাহারও বা আত্মরক্ষার একমাত্র উপায় ক্ষিপ্রতায়। শিকার মিলিলে তাহার সিংহভাগ প্রথমেই দলপতির প্রাপ্য—শিকার যাহার আঘাতেই নিহত হউক না কেন। দলপতি তাহার অংশ গ্রহণ করা মাত্র স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে সকলে মৃত পশুটার উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে। উদ্বৃত্ত কিছুটা থাকিলে পায় শিশুরা। সমস্ত দিবস শিকার করিয়া, ফলমূল আহরণ করিয়া সন্ধ্যা সমাগমে সদলবলে গুহা-কন্দরের দিকে প্রত্যাবর্তন করে। রাত্রে এ অরণ্যভূমি নিষিদ্ধ অঞ্চল। সেটা তখন প্রায়মানবদিগের প্রতিদ্বন্দ্বী 'স্যেবর-টুথড্' ব্যাঘ্রের রাজত্ব। গগনের অনলবর্ষী অগ্নিপিণ্ডটা যখন পশ্চিমের পর্বতান্তরালে আত্মগোপনের উপক্রম করে তখন প্রায়-মানবেরা প্রত্যাবর্তন করে ঐ গুহা-কন্দরের নিরাপদ আশ্রয়ে।

সমাজব্যবস্থা পিতৃতান্ত্রিক তো নহেই এমন কি মাতৃতান্ত্রিকও নহে। মাতৃস্তন্য পান ত্যাগ করার অনতিবিলম্বেই সন্তান আর মায়ের নহে, দলের। দলের প্রায় অর্ধেক স্ত্রী-জাতীয়া, অপ্রাপ্তবয়স্কাদিগকে পৃথক করিলে প্রায় পঞ্চাশেটি নারী সন্তান উৎপাদনে সক্ষম। তাহারা কে কাহার সহিত রাত্রিবাস করে হিসাব নাই। হিসাব না থাকিলেও তাহারও একটি প্রাথমিক রীতি আছে। পশু-শিকারে সিংহ ভাগ গ্রহণের মত এ-ক্ষেত্রেও দলপতির অগ্রাধিকার অনস্বীকার্য। দন্তুর নিজ অভিরুচি অনুসারে কোন যৌবনবতীকে নির্বাচন করিবার পরেই অবশিষ্ট নারী পুরুষ সে রাত্রের মত সঙ্গী বাছিয়া লয়। সে-বিষয়েও যে মতান্তর-মনান্তর দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে রূপান্তরিত না হয় তাহা নহে—কিন্তু সব বিতর্কের চূড়ান্ত রায় দিবার অধিকারও দলপতির। সে নির্দেশ নতমস্তকে মানিয়া লওয়ার রীতি আছে, কারণ তাহার বিকল্পটি সকলেরই জানা। না মানিলে দান-বাকৃতি দন্তুর তৎক্ষণাৎ বিদ্রোহীকে শূন্যে উৎক্ষিপ্ত করিয়া অতলস্পর্শী খাদের দিকে ছুঁড়িয়া দিবে। মুহূর্তমধ্যে প্রায়মানব রাজ্য হইতে কৃপাণদন্তীদের রাজ্যে।

স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে উহারা সকলেই সম্পূর্ণ নিরাবরণ। কটিপর্ণখণ্ডের কোনও প্রয়োজন উহারা অনুভব করে না। জ্ঞানবৃক্ষের ফলের আস্বাদন তখনও হয় নাই। এদিক হইতে প্রায়মানবরা প্রায়-জন্তু। সর্বসমক্ষে উপগত হওয়াতেও কোন সঙ্কোচ নাই।

এমনই একটি সন্ধ্যার কথা। প্রাত্যহিক নিয়মে শিকারান্তে নদীতীরে চতুষ্পদীর ভঙ্গিতে শেষ জলপান করিয়া উহারা শ্রেণীবদ্ধভাবে পর্বত-কন্দরে ফিরিয়া আসিয়াছে। আকাশের অনলবর্ষী বর্তুলাকার অগ্নিপিণ্ডটা পর্বতের অপরপ্রান্তে লুক্কায়িত। কিন্তু নিম্নের বনভূমি নীরন্ধ্র অন্ধকারের তমিস্রায় আজ অবলুপ্ত হয় নাই। অস্তসূর্যের বিপরীত দিক হইতে দ্বিতীয় একটি বর্তুলাকার রজতসূর্য আকাশে উঠিয়া আসিয়াছে এই সন্ধ্যালগ্নেই। তাই গুহামুখ রুপালী আলোর বন্যায় ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। আজ দিনটা ভাল ছিল। শিকারে একটি অতিবৃহৎ সম্বর জাতীয় তৃণভোজী নিহত হইয়াছিল। ঘটনাস্থলেই দস্তুর তাহার বৃকোদরভাগ গ্রহণ করিয়াছে। অপরাপর নরনারীও উদরপূর্তি করিয়াছে।—তবু পশুটা নিঃশেষিত হয় নাই। রাখিয়া আসিলে কৃপাণদন্তীদের ভোগে লাগিবে, তাই ভুক্তাবিশিষ্ট দেহাবশেষ উহারা বহিয়া আনিয়াছে। সকলেই আজ উৎফুল্ল। গুহাকন্দরেরা সমতলে পৌঁছিয়া দস্তুর একটি উদ্গার তুলিল। তারপর পূর্ণ চন্দ্রালোকে হঠাৎ তাহার নজরে পড়িল একটি অপূর্ব দৃশ্য। অপরূপ যৌবনবতী এক নারীমূর্তি!

যুবতী বোধ করি বিংশতিবর্ষীয়া। মেদবর্জিত দীর্ঘকান্তি, মধ্যদেশ ডম্বরু আকার। গুরুনিতম্বিনী এবং পীবরবক্ষা। সুডৌল চিক্কণ নগ্ন শরীরে চন্দ্রালোক প্রতিফলিত—যেন সে সদ্যঃস্নাতা। দস্তুর মোহিত হইয়া গেল।

দস্তুর সর্দার তাহার দলভুক্তদের কাহাকেও সনাক্ত করিতে পারিবে না। নাম নাই থাক, মুখও চেনে না। ভিন্ন দলের কোন প্রায়মানব যদি সকলের অজ্ঞাতসারে সন্তর্পণে উহাদের দলভুক্ত হইয়া পড়ে এবং সে যদি দলপতির নির্দেশ নির্বিচারে মানিয়া চলে তবে দস্তুর তাহাকে বিজাতীয় বলিয়া চিহ্নিত করিতে পারিবে না। ঐ অপরূপ যৌবনবতী নারীরত্নটিকে ইতিপূর্বে কোনদিন দেখিয়াছে কিনা, তাহার সহিত রাত্রিবাস করিয়াছে কিনা এ সংবাদ তাহার অজ্ঞাত। অতীত উহার ধারণার অতীত। ও শুধু চিহ্নিত করিতে পারে বর্তমানকে। চূড়ান্ত ক্ষণিকবাদী সে। সহজাত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছাড়া সে শুধু একটিমাত্র পার্থিব বস্তুকে সনাক্ত করিতে পারে—একটি সূচ্যগ্রভাগ প্রস্তর খণ্ড; একটা হাতিয়ার। প্রাক্তন দলপতির নিকট হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত। ঐ অস্ত্রটির মালিকানাই উহার রাজদণ্ড, উহার রাজচ্ছত্র।

তাৎক্ষণিক উল্লাসে দস্তুর গর্জন করিয়া ওঠে। তাহার দৃষ্টিপথে এক বিকচযৌবনা নারীমূর্তি, যাহার তরঙ্গায়িত প্রতিটি প্রত্যঙ্গের অমোঘ আকর্ষণ উহার পূর্ণ-উদর দেহে চরম পুলকলাভের আমন্ত্রণ লিপি পাঠাইয়াছে। দস্তুর সেই নারীমূর্তির দিকে অগ্রসর হইবামাত্র মেয়েটি সঙ্কুচিত হইয়া যায়। বসিয়া পড়ে। দস্তুর বিরক্ত হয়। যৌবন তাহার উদগ্র, দৈহিক ক্ষমতায় সে বিশেষ, স্বজাতীয় পুরুষদলে সে দলপতি। তাহার সঙ্গলাভে সব স্ত্রীলোকই তো উন্মুখ। তাহা হইলে ঐ মেয়েটির এমন অনীহার কী হেতু?

হেতুটা প্রণিধান করা গেল পরমুহূর্তেই। দস্তুরের পশ্চাদভাগ হইতে ক্ষিপ্র শার্দুলের ন্যায় একটি দীর্ঘকান্তি মেদবর্জিত যুবক অগ্রসর হইয়া আসিল। ক্ষিপ্র

গতি কিন্তু শীর্ণকায়, দস্তুরের দৈহিক ক্ষমতার তুলনায় সে শিশুমাত্র। তাহাকে দেখিয়াই জ্যা-মুক্ত ধনুকের মত মেয়েটি উঠিয়া দাঁড়ায়। যুবকটি অসংকোচে মেয়েটিকে তাহার বক্ষপঞ্জরে টানিয়া লয়—শরণাগতকে অভয়দানের ভঙ্গিতে।

ঐ অজ্ঞাত মানবকের স্পর্ধায় স্তম্ভিত হইয়া গেল দস্তুর। ইচ্ছামাত্র সে ঐ বেতসপত্রের ন্যায় যুবকটির গুলুফ ধরিয়া মস্তকের উপর ঘুরাইয়া ঐ অতল খাদের গভীরে ছুঁড়িয়া ফেলিতে সক্ষম। তবে নাকি আজ তাহার উদর পূর্ণ, তাই সে এক পদ অগ্রসর হইয়া যুবকটিকে একটি চপেটাঘাত করিতে গেল মাত্র। যুবকটি কিন্তু সতর্ক ছিল। পংকিল মৎস্যের ন্যায় সে বিদ্যুৎচমকে এক পার্শ্বে সরিয়া যায়। দস্তুরের নাগালের বাহিরে। ভারসাম্য রক্ষা করিতে দস্তুর অসতর্ক হইয়া পড়ে এবং তৎক্ষণাৎ কী-একটি ভারী দ্রব্য আসিয়া সজোরে আঘাত করিল তাহার চিবুকে। যন্ত্রণায় আর্তনাদ করিয়া উঠে দস্তুর-সর্দার।

দস্তুর বজ্রাহত! বাম হস্তটি আপনা হইতে চিবুক স্পর্শ করে। রক্ত! দস্তুরের একবার মনে হইল কেমন করিয়া এমন ব্যাপার ঘটিল? প্রতিপক্ষ ছিল তাহার হস্তসীমার বাহিরে—তাহা হইলে এ কিসের আঘাত? পরক্ষণেই সে সিদ্ধান্তে আসিল—যুবকটির হস্তে নিশ্চয় কোন প্রস্তর-খণ্ড ছিল, যাহা তাহার নজরে পড়ে নাই। দুরন্ত আক্রোশে একটা গর্জন করিয়া উঠে দস্তুর। ঘুরিয়া দাঁড়াইতেই দেখিল প্রতিপক্ষ গুহামুখের সমতলভূমে দণ্ডায়মান—আঘাত করিয়া সে পলায় নাই। কিন্তু আশ্চর্য! সে নিরস্ত্র নহে। তাহার দক্ষিণহস্তে একটি কাষ্ঠদণ্ড রহিয়াছে। থাকুক। তাহাতে ভীত হইবার কিছু নাই। কাষ্ঠখণ্ড সে একবারই ছুঁড়িবার অবকাশ পাইবে। তাহার পর?

স্বজাতীয়েরা অনেকেই ব্যাপারটা দেখিয়াছে। এখন বিদ্রোহীকে শায়েস্তা করিতে না পারিলে দস্তুরের মান থাকে না। এখন আর নারীর অধিকার নহে, প্রতিদ্বন্দ্বিতা তাহার নেতৃত্বের সংগ্রামে পর্যবসিত—কারণ অতর্কিতে প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করিয়া দুঃসাহসী লোকটা পলাইয়া যায় নাই।

পুনরায় গগন-বিদীর্ণ-করা একটি গর্জন করিল দস্তুর। জান্তব গর্জন! এ গর্জনের অর্থ সকলেই জানে। এ তাহার অবিসংবাদিত নেতৃত্বের ঘোষণা। দস্তুর স্বীয় দৈহিক ক্ষমতার বিষয়ে পূর্ণ সচেতন—তবু ঐ অতর্কিত আঘাতটা তাহাকে সাবধান হইতে বলিল। সে নিচু হইয়া তুলিয়া লইল তাহার মারণাস্ত্র—প্রাক্তন দলপতির মৃত্যুতে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত তাহার সেই সূচ্যগ্র প্রস্তরখণ্ডটি।

ইতিপূর্বে যাবতীয় প্রায়মানব অর্ধবৃত্তাকারে মল্লভূমির চতুষ্পার্শ্বে দাঁড়াইয়া পড়িয়াছে। আসন্ন কালবৈশাখীর আশংকায় শ্রেণীবদ্ধ পাদপশ্রেণী যেন। পুরুষেরা সম্মুখভাগে, স্ত্রীলোকেরা দ্বিতীয় সারিতে। প্রায় পঞ্চাশহস্ত পরিমিত ঢালু পর্বতগাত্রে জ্যোৎস্নালোকিত সেই আদিম মল্লভূমি ঐ নিরাবরণ নিশাচরদের ভিড়ে রহস্যময়।

দ্বৈরথ-সমর সম্পূর্ণ অপরিচিত কিছু নহে। নারীর অধিকার লইয়া, দলের নেতৃত্ব পদ লইয়া দ্বন্দ্বযুদ্ধ ইতিপূর্বেও হইয়াছে। তবে দীর্ঘ দীর্ঘদিন সে ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে নাই; কারণ প্রায়-মানবদের তুলনায় অসুরের মত বলশালী ঐ

দস্তুর সর্দারের কোন প্রতিদ্বন্দ্বী উহাদের দলে ছিল না। আর কিছু না জানিলেও দ্বৈরথ-সমরের রীতিনীতি সহজাত সংস্কারের মত উহাদের আয়ত্তাধীন। এরূপে ক্ষেত্রে তৃতীয় পক্ষের ভূমিকা শুধু দর্শকের, যতক্ষণ না বিজিতের মৃতদেহটা প্রায়-মানবদের সমতল হইতে অরণ্যভূমের ঐ কৃপাণদন্তীদের রাজ্যে নিক্ষিপ্ত হয়।

দন্তুরটা দানব। আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করিতে পারিলে প্রতিদ্বন্দ্বীর ব্রহ্মতালু বোধ করি ওর রক্তাক্ত চিবুক স্পর্শ করিত। আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী দন্তুর দৃঢ় পদবিক্ষেপে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীর দিকে দুই পদ অগ্রসর হয়। ওর প্রতিযোগী কিন্তু আসন্ন ঝঞ্ঝার প্রতীক্ষায় নিবাত পাদপ-পত্রের মত অচঞ্চল। একবার মাত্র সে পিছনে ফিরিয়া দেখিয়া লয় অতলস্পর্শী খাদের দূরত্বটা ;—অর্থাৎ প্রয়োজনে সে করপদ পিছু হটিতে পারে। কয়েক পদ অগ্রসর হইয়াই দন্তুর মুখব্যাদান করিল—করাল দংষ্ট্রা বিকশিত করিয়া প্রতিপক্ষকে দেখাইল। ইহাও তাহার সহজাত সংস্কারের কৈঙ্কর্য, কয়েক লক্ষ বৎসর পূর্বেকার পূর্বপুরুষদিগের অন্ধ অনুকরণ। আশ্চর্য! ওর প্রতিপক্ষের কোন ভাববৈকল্য নাই—না বিকশিত করিল দন্তপাতি, না ছাড়িল হুঙ্কার। প্রস্তরমূর্তিতে খোদিত শ্বাপদের ন্যায় সে অচঞ্চল।

সহসা একটি হুঙ্কার ছাড়িয়া দন্তুর তাহার প্রতিপক্ষের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। তাহার দক্ষিণহস্ত-ধৃত মারণাস্ত্রটা চন্দ্রালোকে একটি অর্ধবৃত্ত রচনা করিল বায়ুমণ্ডলে। ওর প্রতিদ্বন্দ্বী যদি স্বস্থানে থাকিত তাহা হইলে সে আঘাতে তাহার মস্তক বিচূর্ণিত হইয়া যাইত—কিন্তু সে ছিল তিনহস্ত পরিমিত ভূমির দক্ষিণে। এবার আর দেহভার রক্ষিত হইল না—দন্তুর সশব্দে পাষাণখণ্ডে পতিত হইল ; এবং তৎক্ষণাৎ পুনরায় কী একটা ভারী বস্তু আসিয়া সজোরে আঘাত করিল ওর বামস্কন্ধে। প্রচণ্ড যন্ত্রণা! তাহা হউক। এতক্ষণে দন্তুর সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইয়াছে। বুঝিয়াছে, ওর প্রতিপক্ষের হস্তধৃত সেই একাঘ্নী ব্রহ্মাস্ত্রটা এখন ব্যয়িতশক্তি, নির্বিষ। প্রস্তরখণ্ড অথবা বৃক্ষশাখা নিক্ষেপণের যুদ্ধ-কৌশল অপরিজ্ঞাত ছিল না দস্তুরের, বস্তুত দলের কাহারও। ওরা জানিত সে জাতের ব্রহ্মাস্ত্র সবই একাঘ্নী। নিক্ষেপণের পরমুহূর্তেই তুমি নিরস্ত্র। ওর প্রতিপক্ষ দ্বিতীয় কোন প্রস্তরখণ্ড তুলিয়া লইবার পূর্বেই তাহাকে আক্রমণ করিতে হইবে। তাই কালবিলম্ব না করিয়া মত্তমাতঙ্গের মত দস্তুর দ্বিতীয়বার ঝাঁপাইয়া পড়িল তাহার প্রতিপক্ষের দিকে।

আশ্চর্য! এবারও ফলাফল হইল একই প্রকার।

জ্যোৎস্নালোকিত বনভূমি ঘন তমিস্রায় অবলুপ্ত হওয়ার মুহূর্তে—মৃত্যুর শিয়রে দাঁড়াইয়া দস্তুরের মনে সেই প্রশ্নটাই জাগিল : একাঘ্নী কোন্ মন্ত্রবলে সহস্রাঘ্নী হয়?

সে দ্বৈরথ-সমর যুগান্তকারী ঘটনা—শক্তি ও বুদ্ধির সংগ্রাম! আজিকার সময়ের মাপে বোধ করি দশ মিনিটও নহে। চূড়ান্ত বিচার হইয়া গেল। পাশব-শক্তি হার মানিবার পূর্বে যূথচ্যুতের সর্বাঙ্গে একাধিক ক্ষতচিহ্ন আঁকিয়া দিয়াছে বটে, কিন্তু উন্নততর বুদ্ধির কাছে তাহাকে পরাভব মানিতেই হইল। প্রাণ দিয়াও

দস্তুর বুঝিতে পারিল না তার প্রতিপক্ষের শক্তির মূল উৎসটা কোথায় ? কেন তাহার নিক্ষিপ্ত বজ্রটা হস্তচ্যুত হইল না ? শেষ আঘাতটা লাগিয়াছিল মস্তকের পশ্চাৎভাগে। প্রভঞ্জন-উৎপাটিত শালবৃক্ষের ন্যায় দস্তুর পাষাণচত্বরে লুটাইয়া পড়িল। এবার অগ্রসর হইয়া আসিল যূথচ্যুত। দলপতির মুষ্টি খুলিয়া সেই মারণাস্ত্রটা প্রথমেই হস্তগত করিল। তৎপরে দলপতির অচেতন্য দেহটা টানিতে টানিতে লইয়া গেল অতলস্পর্শী খাদের নিকটে। পরমুহূর্তেই সেটি অন্তর্হিত হইল। শুধু গুরুভার কোন কিছু পতনের একটি প্রতিধ্বনি ভাসিয়া আসিল কৃপাণদন্তীদের রাজ্য হইতে।

শতাধিক দর্শক তখনও নির্বাক, নিস্পন্দ। চন্দ্রালোকিত ভূমে শ্রেণীবদ্ধ-ভাবে দণ্ডায়মান উলঙ্গ দানবের দল। যূথচ্যুত স্থির হইয়া দাঁড়াইল। রক্তাক্ত দেহে তাহাকে বীভৎস দেখাইতেছে। তাহার বাম হস্তে দস্তুরের উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত প্রস্তর-খণ্ড, দক্ষিণহস্তে একটি বিচিত্রদর্শন আয়ুধ। দুই হস্ত শূন্যে উৎক্ষিপ্ত করিয়া এতক্ষণে সে একটি গর্জন করিল—অর্থাৎ তাহার নেতৃত্বের ঘোষণা।

আর কিছু না বুঝিলেও উহারা প্রত্যক্ষকে বোঝে। অমিতবিক্রম-দস্তুরের অপমৃত্যু উহাদের প্রত্যক্ষ করা সত্য—সদ্য অতীত ; যাহার স্মৃতি এখনও উহাদের মস্তিষ্কে জাজ্বল্যমান। সারিবদ্ধ প্রায়মানবের দল একে একে উপবেশন করে। দুই হস্ত মাটিতে রাখিয়া মুহূর্তে সকলে যেন চতুষ্পদ হইয়া যায়। ঐ ভূমি-স্পর্শ-মুদ্রাই তাহাদের বশ্যতা প্রকাশের ব্যঞ্জনা। করজোড় করা বা সাষ্টাঙ্গে প্রণাম উহারা তখনও শেখে নাই।

জনতার ভিতর হইতে বিদ্যুৎগতিতে ছুটিয়া আসে মেয়েটি। এ মর্মান্তিক ঘটনার যে মূল নায়িকা। দৃঢ় আলিঙ্গনে বিজয়ীকে জড়াইয়া ধরে। তাহার ক্ষতস্থান চাটিতে থাকে। বিজয়ী কয়েকটি খণ্ডমুহূর্তের জন্য তাহার আদর-সোহাগের নিকট সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে। তৎপরে তাহাকে সরাইয়া দেয়। ব্যূহমধ্যে অগ্রসর হইয়া আসে। সারিবদ্ধ শরণাগত স্বজাতীয়ের উপর দ্রুতগতি একবার দৃষ্টি বুলাইয়া লয়। অর্থাৎ নির্বাচন করে। অবশেষে লোমশের চুলের মুঠি ধরিয়া দাঁড় করাইয়া দেয়। দুর্বোধ্য ভাষায় কি যেন বলিতে যায়। পারে না। লোমশও বিহ্বল। সে বোঝে না—তাহার কী অপরাধ ! অতঃপর যূথচ্যুত লোমশের দক্ষিণ হস্তটি টানিয়া লয়—তাহার হস্তে গুঁজিয়া দেয় দলপতির উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্তব্য সেই অস্ত্রটা। যূথচ্যুত হাসে। লোমশ কিন্তু তখনও বিহ্বল। কেহই বুঝিতে পারে না এ আচরণের অন্তর্গূঢ় ব্যঞ্জনাটা। ইতিমধ্যে প্রায়মানবেরাও উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। সকলে ভাবিতেছে, বুঝিবার চেষ্টা করিতেছে।—সমস্যাটা জটিল, অত্যন্ত জটিল। দলপতি দস্তুর অপঘাতে মৃত ; যূথচ্যুত তাহার মৃত্যুর হেতু। যূথচ্যুত দ্বৈরথ-সমরে বিজয়ী। তাহা হইলে প্রায়মানবদের প্রচলিত রীতি অনুসারে যূথচ্যুতই তো বর্তমানে তাহাদের দলপতি। সেক্ষেত্রে লোমশের হস্তে দলনেতার প্রতীক চিহ্নটা গুঁজিয়া দিবার অর্থ ?

যূথচ্যুত পুনরায় একটি হুঙ্কার ছাড়িল। তাহার দক্ষিণ হস্তধৃত আয়ুধটা শূন্যে তুলিয়া ধরিল। বোধকরি সে বলিতে চাহে যে, সে উন্নততর আয়ুধের

সন্ধান পাইয়াছে, দলপতির সেই প্রাচীন প্রস্তর-খণ্ডে তাহার প্রয়োজন নাই। অথবা হয়তো সে ঐ ভাবে সকলকে সাবধান করিতে চাহিল। উদ্দেশ্য যাহাই হউক না কেন এতক্ষণে সকলেই ওর অস্ত্রটা ভাল করিয়া দেখিল। তাহার অর্থ বুঝিল না। যূথচ্যুতের দক্ষিণ করে দুই হস্ত পরিমাণ দীর্ঘ একটি কাষ্ঠখণ্ড, তাহার প্রান্তভাগে লতাগুল্মে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ একটি প্রস্তর খণ্ড।

একটি যুগান্তকারী আবিষ্কার! সর্বাঙ্গ দিয়া দন্তুর তাহার শক্তির স্বরূপ অনুভব করিয়াছিল, প্রাণ দিয়াও তাহার তত্ত্বটা বুঝে নাই। দলের অপরাপর সকলেও বুঝিল শুধু ফলাফল প্রত্যক্ষ করিয়া। অন্তর্নিহিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বটা—'ভ্রামক-তত্ত্ব', অর্থাৎ 'লিভার-আর্ম'-এর বুদ্ধিতে আঘাতটা বর্ধিত করিবার প্রক্রিয়াটা তাহারা হৃদয়ঙ্গম করিল না।

যদি ভাবিয়া থাক ঐ বাহুমূলকে 'ফালক্রামে' রূপান্তরিত করা—কৃত্রিম 'লিভার আর্ম'-এর ব্যবহারে শক্তিবৃদ্ধি আবিষ্কারের জন্যই আমি আমার নায়ক যূথচ্যুতের মূর্তি নিউ ইয়র্কের চার্চে প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিতেছি তবে বলিব—তুমি ভুল বুঝিয়াছ। সে আবিষ্কারও বড় তুচ্ছ নহে; কিন্তু সভ্যতার আদিকাল হইতে মাত্র ছয়শতটি আবিষ্কারের অন্তর্গত নাও হইতে পারে। তবে পাঠক! এজন্য তোমার লজ্জিত হওয়ার কোনও কারণ নাই। তোমা-অপেক্ষা বিচক্ষণ বিচারকও এজাতীয় ভ্রান্তির শিকার হইয়াছেন—সে নজিরও আছে। আলবার্ট আইনস্টাইন তাঁহার 'স্পেশাল থিওরি অব্ রিলেটিভিটি' উপস্থাপিত করেন ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে, 'জেনারেল থিওরি অব্ রিলেটিভিটি' দাখিল করেন ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে—তবু সুইডেনের নোবেল কমিটি সেই সর্বকালের সবশ্রেষ্ঠ দুইটি আবিষ্কারের জন্য আইনস্টাইনকে নোবেল পুরস্কার প্রদান করিতে সাহসী হন নাই। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে আইন-স্টাইনকে পুরস্কৃত করা হয় যে আবিষ্কারের জন্য তাহাতে রিভার-সাইড চার্চে তাঁহারও স্থান হওয়ার কথা নয়। দন্তুর এবং তাহার স্বজাতীয় প্রায়মানবের দল যেমন যন্ত্রটার কার্যকারিতা প্রত্যক্ষ করিয়াও 'ভ্রামক-তত্ত্বটা' বিশ্বাসযোগ্য মনে করে নাই ঠিক তেমনি ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ণ সূর্যগ্রহণ প্রত্যক্ষ করিয়াও নোবেল কমিটির ধুরন্ধর বিজ্ঞানী বিচারকদলও 'আপেক্ষিক তত্ত্ব' বিশ্বাসযোগ্য মনে করিতে পারিলেন না। সে সকল বৃত্তান্ত যথাস্থানে বলিব। আপাতত বরং শোনাই আমার নায়কের মূল আবিষ্কারটা কী জাতের—

সর্বযুগেই এমন এক-আধজন মানবসন্তান এ ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েন যিনি বর্তমানকে অতিক্রম করিয়া দুই-চারি দশক পরবর্তী যুগের চিন্তাজগতে স্বচ্ছন্দ-বিহারে সমর্থ। তাঁহারা যুগাতীত। তাঁহারা কালজয়ী। যূথচ্যুত ও তাহার সঙ্গিনী ছিল সেই জাতের দুর্লভ ব্যতিক্রম। দলের আর কেহ সে তত্ত্বটা জানিতে পারে নাই। তলাইয়া বুঝিবার মত বুদ্ধিবৃত্তিই ছিল না উহাদের, লক্ষ্য করিবার মত মানসিকতাও নহে। চোখোতিয়েন পর্বত-কন্দরের সেই মধুচক্র-কোষে উহারা দুইজন তিল তিল করিয়া গড়িয়া তুলিতেছিল এক অপার্থিব সম্পদ—যাহার সন্ধান তখনও পায় নাই এই সূর্য-প্রদক্ষিণরত পৃথিবী। লোকচক্ষুর অন্তরালে সেই আদিম গুহার অন্ধ কোটরে তাহারা রচনা করিতে চাহিয়াছিল এক মনোময়

জগৎ—সেখানে উহারা একে অপরের প্রতি একমুখী। সেটা সে-যুগে ছিল অকল্পনীয়। সেই যূথবদ্ধ যৌনজীবনের পরিমণ্ডলে প্রজনন-তত্ত্বের একটি আবশ্যিক প্রক্রিয়াতে উহারা আরোপ করিতে চাহিয়াছিল এক নূতন মূল্য। বংশ রক্ষার তাগিদে নহে, যৌন ক্ষুধার অঙ্কুশ-সংকেতে নহে—কি-জানি-কিসের তাগিদে উহারা একে অপরকে খুঁজিত। দিবসান্তে যখন পরিচয়হীন প্রাক্‌মানবের দল—পুরুষ ও প্রকৃতি সমবেত হইত সেই প্রাগৈতিহাসিক গুহার সম্মুখে তখন উহারা দুইজনে আত্মগোপন করিয়া থাকিত—যতক্ষণ না পরস্পরের সাক্ষাৎ পায়। নীরন্ধ্র অন্ধকারেও একে অপরের গাত্রগন্ধ সনাক্ত করিতে পারিত, ভাষাহীন কূজনে মনোভাব ব্যক্ত করিত। মেয়েটি বনের মধ্যে ফল কুড়াইয়া পাইলে ছেলেটির জন্য সঞ্চয় করিত, ছেলেটি নদীতীরে কোন বিচিত্রবর্ণ প্রস্তরখণ্ড পাইলে তাহা মেয়েটির হাতে আনিয়া দিত। যে যুগে দলপতি দলের প্রতিটি ব্যক্তি-সত্তাকে চিনিতে পর্যন্ত পারিত না, সে-যুগে এ জাতীয় আচরণ বিস্ময়কর বৈকি! শুধু রাতের অন্ধকারে নহে, দিবাভাগেও অরণ্যভূমে বিচরণের সময় একে অপরের সান্নিধ্য চাহিত। সেখানে তৃতীয় ব্যক্তি অপাংক্তেয়। যৌনক্ষুধার অতীত সেই এক-মুখীনতাটাই উহাদের যৌথ আবিষ্কার; তাহার সংজ্ঞা কী তাহা উহারা জানিত না, শুধু মাত্র অনুভূতিটা বুঝিতে পারে। কয়েক লক্ষ বৎসর পরে ঐ অনুভূতিটার সংজ্ঞা হইবে—প্রেম!

ঐ অনুভূতিটা সর্বপ্রথম আবিষ্কার করা জন্যই উহারা কালজয়ী দম্পতি!

এ সকল বৃত্তান্ত কিছুই জানিত না লোমশ। যূথচ্যুতের হস্তধৃত দলপতির অভিজ্ঞা-সূচক অস্ত্রটা গ্রহণ করিয়া তাই সে বিহ্বলনেত্রে চাহিয়া রহিল। পর-মুহূর্তেই তাহার লক্ষ্য হয়, দক্ষিণ হস্তে সেই অদ্ভুতদর্শন আয়ুধ এবং বামহস্তে সঙ্গিনীর হাত ধরিয়া যূথচ্যুত গুহামুখ ত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া যাইতেছে।

লোমশ এতক্ষণে বুঝিতে পারে। অতঃপর সে স্বয়ং দলপতি। ঘটনাটা সে বিস্মৃত হইয়াছে, শুধু তাহার দুটি ফলশ্রুতি উহার মনের অবচেতনে মুদ্রিত হইয়া আছে। প্রথমতঃ যূথচ্যুতকে সর্বদা পরিহার করিতে হইবে, দ্বিতীয়তঃ যূথচ্যুত তাহার উপকার করিয়াছিল।

যূথচ্যুত কী কারণে দলত্যাগ করিল তাহা সে বুঝে নাই। সে কথা তাহার ধারণার অতীত। যূথচ্যুত প্রণিধান করিতে পারিয়াছিল যৌথ জীবনে সে তাহার ঐ অপূর্ব সম্পদটিকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিবে না। দন্তুর যেমন নিজ শক্তি সম্বন্ধে সচেতন ছিল, জানিত দলের ভিতর দৈহিক ক্ষমতায় সে ব্যতিক্রম, যূথচ্যুতও তেমনি জানিত বুদ্ধিবৃত্তিতে সে একটি ব্যতিক্রম। তাহার জগতে একমাত্র সাথী হইতে পারে ঐ সঙ্গিনী। দলত্যাগ করার আরও একটি বিচিত্র হেতু ছিল। তাহা প্রায় অবিশ্বাস্য। যৌথ যৌনজীবন ত্যাগ করিয়া যেদিন হইতে উহারা পরস্পরের প্রতি একমুখীন হইল সেই দিন হইতেই তাহারা তাহাদের সকল কাণ্ডকারখানা সঙ্গোপন করিতে চাহিল। দুইজনেই পৃথকভাবে চাহিতেছিল একটু আড়াল, একটু গোপনীয়তা। যৌন অঙ্গ আবরণের যুগ আসিতে যখন কয়েক লক্ষ বৎসর বাকি তখন আমার নায়ক-নায়িকার এই মনোভাবটি বোধ করি পাঠক সরল বিশ্বাসে গ্রহণ

করিতে পারিতেছেন না। তাই তাঁহাদের অবগতির জন্য জানাইয়া রাখি—আজিকেও, এই বিংশ শতাব্দীতেও, হস্তী-হস্তিনী যূথভ্রষ্ট না হইয়া, সম্পূর্ণ নির্জন অরণ্যে স্বজাতীয়ের দৃষ্টিপথের বহির্গত না হইয়া মিলিত হয় না। নগ্নতার জন্য করিসমাজে কোন সংকোচ আছে বলিয়া তো জানি না।

তারপর প্রায় বৎসরাধিক কাল উহারা ঐ একান্ত গুহায় বসবাস করিতেছে। অবশ্য সকল সম্পর্ক ছেদ হয় নাই। দিনের আলো ফুটিলে উহারা দুইজনে গুহা-কন্দর হইতে নির্গত হয়। কখনও অরণ্যভূমের সমতলে, কখনও বা নদীতীরে স্বর্ণবালুচরে অপরাপর প্রায়মানবদের সাক্ষাৎ মেলে। তৎপরে সমস্ত দিনমান উহারা থাকে—দলের সহিতই। আকাশের অনলবর্ষী বর্তুলাকার বস্তুটা যেদিন মেঘান্তরালে অবলুপ্ত হয় সেদিন যূথচ্যুতের ছায়াটি তাহাকে ধরিতে পারে না, কিন্তু সেদিনও তাহার 'ছায়াবানুগতা' সঙ্গিনী সাথে সাথেই থাকে। সমস্ত দিন-মান দলপতি লোমশের নির্দেশ নির্বিচারে মানিয়া চলে যূথচ্যুত। শিকার মিলিলে সিংহভাগটা লোমশকেই অধিকার করিতে দেয়। শুধু একটিমাত্র বিষয়ে সে অত্যন্ত স্পর্শকাতর—সেখানে সে দলপতির প্রতিও উদ্যত-আয়ুধ—সেই ব্যতিক্রমটি তাহার সঙ্গিনী। ওর ছায়াবানুগতার প্রতি ওর নিরঙ্কুশ অধিকারে কোনও হস্তক্ষেপ ও বরদাস্ত করিবে না। ক্ষীণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী প্রায়মানব পুরুষদের বারে বারে ভুল হইয়া যায়। তাহাদের দোষ নাই—ওর সঙ্গিনী সত্যিই অপরূপা! তৎক্ষণাৎ ওর হস্তধৃত বজ্র নামিয়া আসে অমোঘ আঘাতে। মুহূর্তে মধ্যে সংযত হয় উহারা। স্মরণ হয়—কী একটা কারণে যেন যূথচ্যুতকে ঘাটাইতে নাই।

দিনান্তে নদীতীরে শেষবার জল পান করিয়া প্রায়মানবেরা যখন মধুচক্র কোষের দিকে চলিতে থাকে তখন যূথচ্যুত সঙ্গিনীর হাত ধরিয়া রওনা হয় বিপরীত দিকে—তাহাদের অন্তেবাসীর 'ভালো বাসায়'।

যূথচ্যুত ও তাহার সঙ্গিনী এ জীবনে সুখী হইয়াছে। আনন্দের মূলে উৎসটা কোথায় তাহা বুঝিতে পারে না; কিন্তু ঐ সঙ্গে অপর একটি অনুভূতির উৎপত্তিও হইয়াছে। তাহার নাম—'ঈর্ষা'! ছায়াসঙ্গিনীকে অপর কোন পুরুষ জাতীয়ের সন্নিকটবর্তী হইতে দেখিলেই যূথচ্যুতের ভাবান্তর হয়। নাসারন্ধ্র স্ফুরিত হয়, মাংসপেশী কঠিন হইয়া উঠে, মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ ধারণ করে। এ অনুভূতিটা কিন্তু ওর সঙ্গিনীর অত তীব্র হয় নাই। তাহার একাধিক কারণ থাকিতে পারে। হয়তো স্বভাবগত। অথবা হয়তো তাহার কারণ প্রায়মানবদের তুলনায় যূথচ্যুতের দেহাকৃতিতে যৌন আকর্ষণ অল্প—তাহার আকর্ষণ বুদ্ধিবৃত্তিতে, যাহার সন্ধান জানে না প্রায়মানব রমণীকুল। অপরপক্ষে ওর সঙ্গিনী ত্বমসির আকর্ষণ অমোঘ। সে সত্যই অপরূপা!

একটা কৈফিয়ৎ বাকি রহিল। আমার আখ্যায়িকার নায়িকার নাম কেন 'ত্বমসি' রাখিলাম। বোধ করি সে ব্যাখ্যা এক্ষণে নিষ্প্রয়োজন। এতাবৎকাল প্রায়মানবদের ধারণায় ছিল শুধু উত্তম ও প্রথম পুরুষ। আমার হস্তপদ, আমার অস্ত্র, আমার অংশের খাদ্য অথবা উহাদের হস্তপদ-খাদ্যাংশ। যূথচ্যুত তাহার

সঙ্গিনীর ভিতর আবিষ্কার করিল দ্বিতীয় পুরুষের ধারণাটা—বলা যায় দ্বিতীয় পুরুষ নহে, দ্বিতীয়া প্রকৃতি ; যদিও তাহার কাছে অদ্বিতীয়া। মোট কথা 'অহং' এবং 'বয়ং'-এর সেতুবন্ধ-স্বরূপা আমার এ কাহিনীর নায়িকা হইতেছে মানবেতিহাসে সর্বপ্রথমা : 'ত্বমসি'!

॥ দুই ॥

কল্য রাত্রিতে এমন একটি অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটিয়াছে যাহার ব্যাখ্যা যূথচ্যুত খুঁজিয়া পায় নাই।

রাত্রি তখন গভীর ; অর্থাৎ আকাশে অনলবর্ষী বর্তুলটা অন্তর্হিত হওয়ার অনেক পরে। বাহুবন্ধনে ত্বমসি-কে আলিঙ্গনবদ্ধ করিয়া পাষাণ শয্যায় অঘোর নিদ্রায় অভিভূত ছিল সে। সহসা একটা বিকট শব্দে তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। যূথচ্যুত পাষাণ শয্যায় উঠিয়া বসে। লক্ষ্য হয়, ত্বমসিরও নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে। সেও উৎকর্ণ। ত্বমসির শরীর ভাল নহে, তার ডম্বরু-আকার মধ্যদেশ ক্রমে ক্রমে স্ফীত হইয়া উঠিতেছে। যূথচ্যুত হস্ত সঞ্চালনে তাহাকে শয্যাত্যাগ করিতে নিষেধ করিল। প্রথমেই দক্ষিণহস্তে উঠাইয়া লইল তাহার হাতিয়ার। পুনরায় উৎকর্ণ হইয়া শব্দটা শ্রবণে প্রয়াসী হইল। নাঃ। এরূপ অদ্ভুত নিরবচ্ছিন্ন শীৎকার সে তাহার পঞ্চবিংশতি বয়ঃক্রমকালে কখনও শুনে নাই। বৃক্ষপত্রে বৃষ্টিপাতের রিমঝিম শব্দ সে চেনে, মেঘগর্জন ও বজ্রপাতের শব্দও অচেনা নহে, কৃপাণদন্তীদিগের এলাকাভুক্ত অরণ্যের যাবতীয় রাত্রিচর জীবের কণ্ঠনিঃসৃত ধ্বনির সহিত তাহার সম্যক পরিচয় আছে ; এমন কি দীর্ঘদিনের ব্যবধানে এই বিশালায়তন পর্বতকে প্রকম্পিত-করা ভূকম্পনসঞ্জনিত পৃথিবীর আর্তনাদও তাহার অজানা নহে। এ শব্দ সে সকল শব্দের সহিত তুলনীয় নহে। চতুষ্পদীর ভঙ্গিতে ধীর পদে সে গুহামুখে অগ্রসর হইয়া আসে। মধ্যগগনে বর্তুলাকার রজতসূর্যটা তখনও আছে। শব্দের উৎস সন্ধানে ঊর্ধ্বে দৃকপাত করিয়াই স্তম্ভিত হইয়া গেল যূথচ্যুত। কী একটা বিরাটাকার পক্ষী দ্রুতসঞ্চারী গতিতে পশ্চিমাকাশ হইতে মধ্যগগনের দিকে যেন ঐ রজতসূর্যটাকে গ্রাস করিতে যাইতেছে। ইতিপূর্বেই কয়েকবার চন্দ্রগ্রহণ সে লক্ষ্য করিয়াছে—খাদ্য-খাদকের সম্পর্কে অভ্যস্ত যূথচ্যুতের ধারণা ছিল রজতসূর্যকে গ্রাস করিবার জন্য এক বিদেহী আত্মা ঐ নীলাকাশে লুক্কায়িত থাকে। তাহাকে কখনও সে দেখে নাই। চন্দ্রকে আক্রমণ করার মুহূর্তটুকুতেই তাহার ধুম্রবর্ণের দেহ প্রকটিত হয়। আজ সেই বিদেহীকে দেহধারীরূপে প্রত্যক্ষ করিয়া সে স্তম্ভিত। কিন্তু না! অদ্য রজনীতে সে রজতসূর্যকে গ্রাস করিল না, তাহার বহুদূর দিয়াই ক্রমশঃ পূর্ব দিগন্তের দিকে যাত্রা করিল। সে মহাগরুড়ের পক্ষদ্বয় আন্দোলিত হইতেছে না ; পরন্তু অসংখ্য বিচিত্রবর্ণা আলোকবিন্দু জ্বলিতেছে এবং নিবিতেছে—লাল-নীল-সবুজ-হরিদ্রাবর্ণ। শীৎকার ধ্বনিতে মধ্যরাত্রির নিস্তব্ধতাকে বিদীর্ণ করিয়া ক্রমশঃ পক্ষীশাবক পূর্বগগনের দিগন্তে বিলীন হইয়া গেল।

ওটা কী পক্ষী ? বিনা পক্ষসঞ্চালনে সে কীভাবে উড্ডীয়মান হইল ? তাহার সর্বাঙ্গে ঐ বিচিত্রবর্ণা আলোকবিন্দুই বা আসিল কোথা হইতে ? নাঃ ! ওটা পক্ষিশাবক নহে। হইতে পারে না। আর কিছু। আর কি ? যূথচ্যুত তাহার স্বজাতীয়ের ভিতর লেওনার্দো-আইনস্টাইন। ইতিমধ্যে সে অনেক কিছু লক্ষ্য করিয়াছে। সে জানে দিবাভাগের ঐ অনলবর্ষী বর্তুলাকার পিণ্ডটা অথবা রাত্রের রজতসূর্য কিম্বা আকাশের সংখ্যাতীত আলোকবিন্দুর একটা বিশেষ গতিচ্ছন্দ আছে। তাহারা পূর্বগগনে আবির্ভূত হয়—মধ্যাকাশে উঠিয়া আসে এবং অবশেষে পশ্চিমাকাশে অস্ত যায়। পূর্ব-পশ্চিম সে বোঝে না, তবে তাহার আবাসস্থল হইতে দিকটা চিহ্নিত করিতে পারে। ঐ অদ্ভুত নিশাচর উড্ডীয়মান বস্তুটা সেই চিরাচরিত গতিচ্ছন্দ মানিয়া চলে নাই।

যূথচ্যুত দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করিল গুহামুখে। কিন্তু বিশ্বচরাচরে মধ্যরাত্রির নিস্তব্ধতা আর কোনও ভাবে ব্যাহত হইল না। না প্রত্যাবর্তন করিল সেই গগনচারী, না ফিরিয়া আসিল তাহার শীৎকার। যূথচ্যুত নিজ প্রস্তরশয্যায় ফিরিয়া আসিল। ঘুম আসিতে বিলম্ব হইল তবু শেষ পর্যন্ত ঘুমাইয়া পড়িল।

বোধ করি মধুচক্র-কোষ গুহাকন্দরের বাসিন্দাদের একই ভাবে নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল, হয়তো তাহারাও সদলবলে আসিয়া ঐ বিচিত্রদর্শন গগনচারীকে লক্ষ্য করিয়াছিল। তারপর নিশ্চিন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছিল। পরদিন প্রভাতে তাহাদের কোন কিছুই স্মরণে ছিল না। একটি রাত্রির ব্যবধানে সব কিছু বিস্মৃত হইয়াছিল। যূথচ্যুত কিন্তু ভোলে নাই। পরদিন ঘুম ভাঙিতেই দেখিল ত্বমাসি গুহামুখে গিয়া কি-যেন খুঁজিতেছে। যূথচ্যুতের মনে পড়িল। সেও তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল, জিজ্ঞাসুনেত্রে সঙ্গিনীর দিকে দৃকপাত করিল। ত্বমাসি ঊর্ধ্ব আকাশের দিকে দেখাইল। শীৎকার ধ্বনিটা অনুকরণের চেষ্টা করিল, পারিল না ; কিন্তু বুঝিতে কিছু অসুবিধা হইল না যূথচ্যুতের। দুই জনেই অনেকক্ষণ লক্ষ্য করিল—আকাশ ও নিম্নের বনভূমি। কিন্তু কোন পরিবর্তন লক্ষিত হইল না।

অজানা সব কিছুকে ভয় করা উহাদের জন্মগত সংস্কার। তাই যূথচ্যুত প্রথমেই সঙ্গিনীর হস্তে তুলিয়া দিল দ্বিতীয় কুঠারখানা। বলিতে ভুলিয়াছি, নির্জনাবাসে আসিয়াই যূথচ্যুত দ্বিতীয় একটি আয়ুধ নির্মাণ করিয়াছিল ; উপহার দিয়াছিল তাহার প্রেমাস্পদাকে। ত্বমাসিও অত্যন্ত বুদ্ধিমতী। অনতিবিলম্বে সে এই যন্ত্রটির প্রয়োগ-কৌশল আয়ত্ত করিয়াছে। তাহার ফলাফলটাও ইতিমধ্যে পরীক্ষিত। ঐ একান্তবাসী দম্পতিকে অলক্ষ্যে নজর রাখিতেছিল সানুদেশের এক কৃপাণদন্তী। শুধু খাদ্যের সন্ধানে নহে, প্রায়মানবদের সে জাতিশত্রুরূপে চিহ্নিত করে। মধুচক্র কোষ গুহাকন্দরের দিকে যাইতে তাহার সাহসে কুলায় না—সে স্থানের যৌথ প্রতিরোধের অভিজ্ঞতা তাহার আছে। তাই যূথচ্যুত আর ত্বমাসিই ছিল তাহার লক্ষ্যস্থল। একদিন গভীর রাত্রে সে উহাদের পর্যুদস্ত করিতে আসিয়াছিল। পারে নাই। যূথচ্যুত অত্যন্ত সজাগ। তদ্ভিন্ন এই আক্রমণের আশংকা করিয়া সে ইতিপূর্বেই গুহামুখে কিছু শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ড

এমনভাবে সাজাইয়া রাখিয়াছিল যাহাতে নিঃশব্দ সঞ্চারীর আগমন মাত্রেই শব্দে তাহার ঘুম ভাঙিয়া যায়। ঘটনাও তাহাই ঘটিয়াছিল। ব্যাঘ্রপ্রবরের প্রবেশ-মুহূর্তেই নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল যূথচ্যুতের। ব্যাঘ্র-প্রবরের যুদ্ধ-কৌশলের মূলেও ছিল কিছু ভ্রান্তি। অন্ধকারে সে দেখিতে পায়, প্রাগমানবদের অপেক্ষা ভালভাবেই দেখিতে পায়; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সে একটি জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রিতেই আক্রমণ করিতে আসে। জ্যোৎস্নাপ্লাবিত অরণ্যভূমি হইতে সংকীর্ণ গুহামুখে প্রবেশ মাত্রই সে যে কয়েকটি খণ্ডমুহূর্তের জন্য অন্ধ হইয়া যাইবে এই বৈজ্ঞানিক-তত্ত্ব ব্যাঘ্রপ্রবর প্রণিধান করে নাই। অপরপক্ষে গুহাকন্দরের নীরন্ধ্র অন্ধকার হইতে যূথচ্যুত জ্যোৎস্নালোকিত গুহামুখের পশ্চাৎপটে ব্যাঘ্র-সন্তানের 'শিল্যুয়েট' স্পষ্ট দেখিতে পাইল। মুহূর্তমধ্যে তাহার বিচিত্র হাতিয়ার ঘুরাইয়া আগন্তুকের ভ্রূমধ্যস্থলে সে প্রচণ্ড আঘাত হানিল। বাঘটা তখনও গুহার ভিতরটা দেখিতে পাইতেছে না; তবু যন্ত্রণায় একটা গর্জন করিয়া সে পাশব আক্রোশে অন্ধের মত সম্মুখভাগেই অগ্রসর হইবার উপক্রম করিল। ঠিক তখনই তাহার মস্তকে আসিয়া পড়িল দ্বিতীয় আঘাত। ঊর্মাসির হস্তধৃত কুঠারের প্রহার। অদৃশ্য প্রতিপক্ষদ্বয়ের উপর্যুপরি প্রহারে অসীম বলশালী নখী-দন্তী ব্যাঘ্র-প্রবরের শেষ পর্যন্ত রণে ভঙ্গ দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

যূথচ্যুত একহস্তে তাহার অস্ত্র এবং অপর হস্তে সঙ্গিনীকে ধরিয়া ধীরে ধীরে পর্বতকন্দর হইতে অবতরণ করিতে শুরু করিল। ঊর্মাসি অসুস্থা। কারণটা তাহারা উভয়েই জানে। তাহাদের সংসারে ভাগীদার আসিতেছে। এ সময়ে ঐ ঢালু পার্বত্যপথে বনভূমিতে নামিয়া আসা অথবা পর্বতারোহণ ঊর্মাসির পক্ষে কষ্টকর, বিপদজনকও বটে। কিন্তু উপায় নাই। যূথচ্যুত সঙ্গিনীর আহার্য নিজেই বহিয়া আনিতে পারে, কিন্তু পানীয় বহনের উপযুক্ত পাত্র তখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। তদ্ভিন্ন নির্জন গুহাকন্দরে অসহায়া গর্ভবতী নারীকে অরক্ষিত রাখিয়া যাওয়াও নিরাপদ নহে। সেই আহত ব্যাঘ্রটি যে প্রতিশোধের জন্য উন্মুখ হইয়া আছে তাহা উহারা দুইজনেই জানে। দিবারাত্র সে উহাদের অনুসরণ করে, সুযোগের অপেক্ষায় কালাতিপাত করে—এ তথ্য উভয়েই জানে, অনুভব করে। ঐ দুটি হেতু ভিন্ন—কী জানি হয়তো আরও একটি কারণ আছে। অর্থাৎ যূথচ্যুতের অনুপস্থিতিকালে যদি স্বজাতীয় কোনও পুরুষ গুহায় আসিয়া পড়ে? ঊর্মাসি একদিন তাহার দিকে যে-চোখে চাহিয়াছিল আজ যদি সে সেই-চোখে অপর কাহাকেও দেখিয়া ফেলে? 'ভালবাসিয়া ফেলে' কথাটা সে ভাবিত কিনা জানি না; কিন্তু এটুকু জানি—সেই অনুভূতিটির বিষয়ে যূথচ্যুত ছিল অত্যন্ত স্পর্শকাতর, ঈর্ষাপরায়ণ।

সন্তর্পণে ঊর্মাসিকে লইয়া যূথচ্যুত অরণ্যভূমে নামিয়া আসিল। মধুচক্রকোষ গুহার বাসিন্দাদের কোন সাড়াশব্দ নাই। সেই প্রাগৈতিহাসিক ঘন অরণ্যের অভ্যন্তরে তখনও সূর্যালোক প্রবেশ করে নাই। অরণ্যভূম শিশিরসিক্ত। বৃক্ষশাখে ঊর্ণনাভের জালিকায় মুক্তাবিন্দুর বিচিত্র আলিম্পন। অযুতনিযুত বিহঙ্গের প্রভাত বন্দনায় বনভূমি কোলাহলমুখর। প্রতি দিবসের মতই চারিদিকে সতর্ক

দৃষ্টি রাখিয়া উহারা সেই কৃপাণদন্তীদের এলাকা অতিক্রম করিয়া নদীতীরে উপনীত হইল। সেইখানেই অপেক্ষা করিতেছিল এক প্রচণ্ড বিস্ময়!

প্রায়মানবদের সকলেই স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে বৃত্তাকারে ঘেরিয়া কোন কিছু নিরীক্ষণ করিতেছে। ভিড়ের বাহির হইতে দ্রষ্টব্য বস্তুটিকে দেখা গেল না। জনতা ভেদ করিয়া বৃহ্যের ভিতর আসিতেই বস্তুটা দৃষ্টিগোচর হইল। দিগন্ত-অনুসারী সুবর্ণরেখা ভূমিতে কোথা হইতে আবির্ভূত হইয়াছে একটি অদ্ভুত বস্তু। মসৃণ, চিক্কণ, স্বচ্ছ এবং অপ্রাকৃত। প্রচণ্ড শীতে কোন কোন বৎসর য়াং-হোর উপরিভাগ বরফে রূপান্তরিত হয়—সুতরাং জল জমিলে বরফ হয় তাহা জানা আছে। ঐ বস্তুটা সেই বরফ দ্বারা নির্মিত নিশ্চয়, কারণ তাহা স্বচ্ছ। মসৃণ ও চিক্কণ না হইলে সূর্যালোক প্রতিফলিত হইত না। এবং বস্তুটি অপ্রাকৃত —কারণ অমন নির্ভুল জ্যামিতিক কোন বস্তু যূথচ্যুত কখনও দেখে নাই। একটু নজর করিতেই দেখিল, ঐ অদ্ভুত স্ফটিক-স্বচ্ছ বস্তুটার ভিতর নানা বর্ণের বাতি জ্বলিতেছে, নিবিতেছে—ঠিক গতকল্য নিশীথরাত্রে উড্ডীয়মান পক্ষীর দেহে যেভাবে লোহিত-নীল-হরিৎ-হরিদ্রা বর্ণের আলোকবিন্দু দেখিয়াছিল। ভিতরে কতকগুলি গোলাকার চক্র আবর্তিত হইতেছে। গোলাকার আকৃতিটা তাহারে অজানা নহে। গগনমার্গে একাধিক বৃত্তাকার বস্তু সে দেখিয়াছে।

প্রায় দশ মিনিট স্তব্ধ বিস্ময়ে যূথচ্যুত বস্তুটিকে পর্যবেক্ষণ করিল। তৎপরে লোমশের দিকে ফিরিয়া ইঙ্গিত করিল। অর্থাৎ—কী করণীয়?

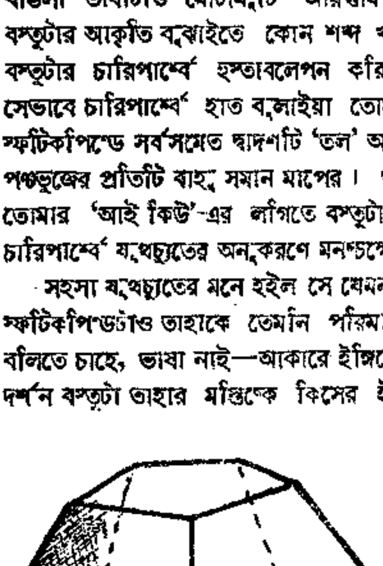
লোমশ বিহ্বল। সে কোন নির্দেশ দিতে পারিল না। তখন যূথচ্যুত নিজেই সাহস করিয়া অগ্রসর হইল। সাবধানী সে; অতি সন্তর্পণে স্পর্শ করিল বস্তুটা। নাঃ, বরফ নহে; কারণ আদৌ তাহা শীতল নহে। তবে মসৃণ বটে। সাহসে ভর করিয়া সে ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ বস্তুটাকে স্পর্শ করিল, প্রদক্ষিণ করিল। দক্ষিণে-বামে, অগ্রপশ্চাতে তার একই আকার। ওর স্পর্শে অথবা প্রদক্ষিণে বস্তুটার কোন ভাবান্তর নাই। এতক্ষণে প্রায়মানবের দল সাহস পাইয়াছে। তাহারাও আসিয়া স্ফটিক-পিণ্ডটাকে স্পর্শ করিল, প্রদক্ষিণ করিল। কেহ কেহ জিহ্বা দ্বারা লেহন করিল, কামড়াইবার চেষ্টাও করিল। এ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় একটি সত্য প্রতীয়মান হইল—বস্তুটা খাদ্য নহে। হঠাৎ কি মনে করিয়া লোমশ একটা গর্জন করিল। বোধ করি তাহার নেতৃত্বের ঘোষণা। বস্তুটা কোন প্রতিবাদ করিল না। এতক্ষণে লোমশ ও তাহার অনুবর্তীদের কৌতুহল নিঃশেষিত হইয়াছে। যাহা খাদ্যও নহে খাদকও নহে—যাহা আক্রমণ করে না অথবা আক্রান্ত হওয়ার ভয়ে সংকুচিত হয় না তাহাতে উহাদের কোন প্রয়োজন নাই। লোমশ সদর্পে ও সদলবলে স্থানত্যাগ করিল।

যূথচ্যুত কিন্তু গেল না। সে লেওনার্দো-আইনস্টাইনের পূর্বসূরী। অত সহজে তাহার কৌতূহল নিবৃত্ত হইবার নহে। বেলাভূমি নির্জন হইলে সে পুনরায় বস্তুটাকে পরীক্ষা করিতে বসিল। পুনরায় প্রদক্ষিণ করিল, পুনরায় স্পর্শ করিল—ওর আকৃতিটা বুঝিবার চেষ্টা করিল। বস্তুটা বেলাভূমিতে বিচরণ করিতেছে না বটে কিন্তু নড়িতেছে, ক্রমাগত নড়িতেছে। ফলে ওটা

সজীব—অর্থাৎ তাহার প্রাণ আছে। ওটা পাথর-পাহাড়ের সগোত্র নহে, হরিণ-প্রায়মানব-নদী-গাছের সগোত্র। সম্ভবতঃ ওটা বৃক্ষই—কারণ বৃক্ষ স্থানান্তরিত হয় না অথচ তাহার পত্রশাখার আন্দোলন প্রত্যক্ষ করা যায়। কিন্তু ওটা যদি জীব তবে ওটা পুরুষ অথবা স্ত্রী? সে যাহাই হউক বস্তুটা তাহাকে অদ্ভুতভাবে আকর্ষণ করিতেছে।

যূথচ্যুতকে দোষারোপ করিয়া কি হইবে? আত্মশ্লাঘা পাপ জানি, তবু বলিব—পাঠক, বিশ্বাস কর, ঐ প্রায়মানব যূথচ্যুত অপেক্ষা আমার,—এ কাহিনীর গ্রন্থকারের—মস্তিষ্কের পরিমাণ কিছু বেশী, 'আই-কিউ'-ও সম্ভবতঃ ন্যূন নহে, বাঙলা ভাষাটাও মোটামুটি আয়ত্তাধীন—তবু অকপটে স্বীকার করিতেছি, বস্তুটার আকৃতি বুঝাইতে কোন শব্দ খুঁজিয়া পাইতেছি না। যূথচ্যুত যেভাবে বস্তুটার চারিপার্শ্বে হস্তাবলেপন করিয়া তাহার মর্মোদ্ধারে প্রয়াসী হইয়াছিল সেভাবে চারিপার্শ্বে হাত বুলাইয়া তোমাদের বুঝাইবার চেষ্টা করিতে পারি: স্ফটিকপিণ্ডে সর্বসমেত দ্বাদশটি 'তল' আছে; প্রতিটি সমতল পঞ্চভুজ এবং প্রতিটি পঞ্চভুজের প্রতিটি বাহু সমান মাপের। পাঠক! কিছু বুঝিলে? বর্ণনা শুনিয়া তোমার 'আই কিউ'-এর লাগিতে বস্তুটার পরিমাপ সম্ভব না হইলে চিত্র—১-এর চারিপার্শ্বে যূথচ্যুতের অনুকরণে মনশ্চক্ষে হস্তাবলেপন করিয়া দেখিতে পার।

সহসা যূথচ্যুতের মনে হইল সে যেমন স্ফটিকপিণ্ডটাকে নিরীক্ষণ করিতেছে স্ফটিকপিণ্ডটাও তাহাকে তেমনি পরিমাপ করিতেছে। সে যেন তাহাকে কিছু বলিতে চাহে, ভাষা নাই—আকারে ইঙ্গিতে বর্তুলাকার চক্রের আবর্তনে ঐ অদ্ভুত দর্শন বস্তুটা তাহার মস্তিষ্কে কিসের ইসারা জাগাইতেছে। ওর মাথার ভিতর যন্ত্রণা শুরু হইল—হউক, সে যন্ত্রণায় একটা অনাস্বাদিত-পূর্ব আনন্দও আছে। যন্ত্রণার সরণী বাহিয়া ঐ বস্তুটা তাহাকে এক অজ্ঞাত রহস্যলোকে লইয়া চলিয়াছে—সেখানে সে দলপতি, সে বিশেষ, সে সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর। সেখানে কৃপাণদন্তীরা সারি সারি ভূমিস্পর্শমুদ্রায় ওর শরণার্থী! দুই বাহু ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত করিয়া যূথচ্যুত এক অহেতুকী উল্লাসে গর্জন করিয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ স্ফটিকপিণ্ডে



চিত্র—১

দ্রুতস্পন্দ কতকগুলি আলোকবর্তিকা জ্বলিল, নিভিল। আর ঠিক তখনই যেন ওর তন্ময়তা কাটিয়া গেল—ও বাস্তব জগতে প্রত্যাবর্তন করিল। কিন্তু এ বাস্তব জগৎ যেন সম্পূর্ণ নূতন! মুহূর্তে তাহার গতিপ্রকৃতির আমূল পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। জটিল শ্লথগতি ভারনম্র জীবন হইতে লঘুচ্ছন্দ সহজ জীবনে উত্তরণ!

চমকে উঠে 'দলছুট' পিছন ফেরে। তাকিয়ে দেখে 'তুমি'র দিকে। সেই মুহূর্তেই ওর মনে হল ঐ জন্তুটা এতক্ষণ ওকে দেখছিল না, ওকে পরিবর্তিত করছিল না, দেখছিল ওর পিছনে বসে থাকা 'তুমি'-কে। ও এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু ওর পিছনে 'তুমি' বসেছিল ভূমিস্পর্শমুদ্রায় চার হাতপায়ে। একটা নতুন ধরণের যন্ত্রণাবোধ হল দলছুটের। ওর মনে হল, জন্তুটা গাছের মত ক্লীবলিঙ্গের নয়, সে পুরুষজাতীয়। তাই সে 'তুমি'-কে টানছে, তাই তুমি ওর আকর্ষণে বাহ্যজ্ঞান রহিত, তাই তার শরণাগতার ভঙ্গী! তৎক্ষণাৎ দলছুট তার সঙ্গিনীর হাত ধরে একটা হ্যাঁচকা টান দিল। তুমি-র তখনও বাহ্যজ্ঞান নেই। না থাক, দলছুট দেখে ফেলেছে 'তুমি'-র বিহ্বল দৃষ্টি। এ দৃষ্টিকে সে চেনে। এ দৃষ্টিতে তুমি একমাত্র তার দিকেই তাকায়। সে দৃষ্টি প্রেমিকার দৃষ্টি।

দুরন্ত ঈর্ষায় দলছুট আঘাত করে বসে তুমিকে। 'তুমি'-র তন্ময়তা ছুটে যায়। সে কিন্তু বুঝে উঠতে পারে না এ আঘাতের মূলটা কোথায়। সে হাত-পা নেড়ে বোঝাতে চায় ঐ যন্ত্রটা তার মস্তিষ্কে কী অদ্ভুত প্রতিক্রিয়ার সঞ্চার করছিল; কিন্তু দলছুট তাকে সে সুযোগ দেয় না। হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যায় 'তুমি'-কে। ঐ পুরুষ-জাতীয় যন্ত্রটার কাছ থেকে দূরে, আরও দূরে।

কিন্তু একেবারে নিরাসক্তও হতে পারে না! অজানাকে জানবার, অচেনাকে চিনবার, অধরাকে ধরবার দুরন্ত বাসনা তার সহজাত। তাই সে বিশেষ, তাই সে 'যূথচ্যুত'—ভাষান্তরে যাকে এখন বলছি—'দলছুট'! তাই 'তুমি'-কে ঘটনাস্থল থেকে অপসারিত করে সে ফিরে আসে জন্তুটার কাছে। যে জন্তুটা নড়ে না. নাড়ায়, খায় না ঘুমায় না কিন্তু ক্ষুধানিদ্রা ঘুচিয়ে দেয়।

প্রায়মানবদের কৌতূহল ঘুচে গেছে প্রথম দিনেই। দ্বিতীয় দিনে কেউ ওটার দিকে চোখ তুলেও চাইল না—যেন পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়া ওটা একটা 'প্যার্চিং স্টোন'। ওটার সম্বন্ধে চরম জ্ঞান লাভ করা গেছে: বস্তুটা খাদ্যও নয়, খাদকও নয়। শুধু একমাত্র ব্যতিক্রম ঐ 'দলছুট'। তার শিকার করা ঘুচল, আহার করা চুকল, আদরে-সোহাগে 'তুমি'কে নিয়ে মাতামাতি করাও বন্ধ। দিনরাত্রি সে শুধু বসে থাকে ঐ অদ্ভুতদর্শন স্ফটিকপিণ্ডের সামনে। গায়ে হাত বুলায় আর অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করে ওর লাল-নীল-হলদে-সবুজ আলোর সংকেত।

দিন-সাতেকের মধ্যেই 'দলছুট' আর একটা সত্য আবিষ্কার করল। জন্তুটা অসীম শক্তিধর। জন্তুটার আয়ত্তে যে উন্নততর অস্ত্র আছে—ছোরা-দাঁতের নখ-দাঁতের তুলনায় তা অনেক-অনেক বেশী উন্নততর। ঘটনাচক্রে সত্যটা সে আবিষ্কার করে। হঠাৎ একদিন দেখে জন্তুটার ভিতর থেকে বের হয়ে এল একটা আলোক-রশ্মি—পড়ল কিছু শুকনো ডালপালার উপর। দপ্ করে জ্বলে উঠল সেটা। আগুন! আগুনকে 'দলছুট' চেনে। প্রখর গ্রীষ্মে ঐ অরণ্যভূমে দাবাগ্নির আগুন সে জ্বলে উঠতে দেখেছে। অরণ্যভূমি দাউ দাউ করে জ্বলতে

থাকে। লক্ষ কোটি জীব পুড়ে ছাই হয়ে যায়। সে দুর্দৈবকে শুধু দলছুট কেন সব প্রায়মানবই চেনে। ওরা জানে—দাবাদল জ্বলে উঠতে দেখলেই ছুটে পালাতে হবে। পার্বত্য গুহাকন্দরের গভীরতম অন্ধকূপই তখন একমাত্র শ্রয়। আগুন প্রায়মানবদের শত্রুপক্ষীয়—সাপের মত, ছোরা-দেঁতো বাঘের মত।

তাই ঐ জন্তুটার দৃষ্টিপাতে আগুন জ্বলে উঠতেই দলছুট একটা আর্তনাদ করে উঠল,—আঁ—!

যেন সে বলতে চাইল, না! না! না! এমন করে আমার শত্রুপক্ষীয় দলে তুমি নাম লিখিও না!

কিন্তু জন্তুটা শুনল না। বারে বারে দৃষ্টিক্ষেপে এখানে-ওখানে আগুন জ্বালতে শুরু করল। এতক্ষণে সম্পূর্ণ মোহভঙ্গ হয়েছে দলছুটের। জন্তুটা শত্রুপক্ষের! জন্তুটা পুরুষ! জন্তুটা ওর চেয়ে শক্তিশালী। সে তুমি-কে অধিকার করতে এসেছে। মরণান্তিক অভিমানে সে তুলে নিল কুঠারখানা। গগন-বিদীর্ণ-করা আবার একটা আর্তনাদ করল—আঁ—আ—আ—!

আর তৎক্ষণাৎ সজোরে ঘুরিয়ে মারল তার প্রস্তর-কুঠার ঐ জন্তুটার মাথায়।

আশ্চর্য! তার কোন প্রতিক্রিয়া হল না। প্রচণ্ড আঘাতে তিলমাত্রও পরিবর্তন হল না যন্ত্রটার। লাল-নীল-সবুজ আলোকবিন্দু যথানিয়মে জ্বলতে এবং নিভতে থাকে।

জান্তব আর্তনাদে চরাচর প্রকম্পিত করে 'দলছুট' ছুটতে ছুটতে ফিরে গেল তার গুহা-আবাসে। সবলে জড়িয়ে ধরল 'তুমি'কে।

দলছুট ভয় পেয়েছে!

॥ তিন ॥

প্রায়মানবদের তুলনায় অনেক-অনেক বেশী বুদ্ধিমান 'দলছুট' কিন্তু একটা জিনিস বুঝতে পারেনি। তার সঙ্গিনীর বুদ্ধির পরিমাপটা। পঁচিশ বছরের তরুণটি ওর সঙ্গিনীর 'পিয়ারী' হয়েছে বটে কিন্তু 'কুড়ি' বছরের 'তুমি'-ও সে হিসাবে তার 'মাদামে কুরি'! দাঁতাল, অর্থাৎ দন্তুর যেমন শক্তির অভিমানে তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে ঠিকমত পরিমাপ করতে পারেনি, 'দলছুট'ও তেমনি বুদ্ধিবৃত্তির আত্মাভিমানে পরিমাপ করতে পারেনি তার সঙ্গিনীর ধী-শক্তিকে। একটা জিনিস কিন্তু সে ঠিকই বুঝেছিল। ঐ স্ফটিক-পিণ্ডটা ওকে অতিক্রম করে ওর সঙ্গিনীর প্রতিই লক্ষ্য স্থির করেছিল। তার পর্যবেক্ষণে ভুল হয়নি, হয়েছিল সিদ্ধান্তে আসার সময়। যন্ত্রটা তুমি-র নারীত্বের প্রতি আকৃষ্ট হয়নি, হয়েছিল তার বুদ্ধিমত্তায়। লোমশকে ছেড়ে, প্রায়মানবদের ছেড়ে সে যেমন ভাবে বেছে নিয়েছিল 'দলছুট'কে, ঠিক তেমনি ভাবেই তুমি-র আবির্ভাবমাত্র সে তার আলোকবিন্দুর সংকেতে বুঝে নিয়েছিল 'দলছুট' নয়, তুমি-ই এ পৃথিবীর ভবিষ্যৎ।

এ তথ্যটা যদি সে সেদিন বুঝত তাহলে আমার এ কাহিনী অমন করুণ

পরিণতির পথে যেত না। কিন্তু দলছুট তো শুধু বুদ্ধিমান নয়, সে প্রেমিকও—এবং এক বিশেষ জাতের প্রেমিক—পৃথিবীর প্রথম ঈর্ষা-অন্ধ প্রেমিক!

তাই মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যাওয়ায় দলছুট তার পাশে তুমি-কে খুঁজে না পেয়ে প্রথমটা বুঝতে পারেনি ব্যাপারটা কী হতে পারে। ভেবেছিল প্রকৃতির আহ্বানে বাঝি 'তুমি' গুহামুখের দিকে গিয়েছে, এখনই ফিরবে। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও যখন সে ফিরল না তখন তার সন্দেহ ঘনীভূত হল। তবে কি এই নিশীথরাত্রে 'তুমি' সেই পুরুষ-জন্তুটার কাছে অভিসারে গেছে?

'তুমি' কিন্তু ওকে আদৌ পুরুষ-জন্তু বলে বুঝতে পারেনি। তার মস্তিষ্কেও হয়েছিল অনুরূপ আলোড়ন। ঈর্ষাকাতর 'দলছুট' কোনক্রমেই তাকে ঐ স্ফটিকপিণ্ডটার কাছে যেতে দিত না—কিন্তু 'তুমি' সারা দিনরাত তার অমোঘ আকর্ষণ অনুভব করত। দুদিন—চারদিন—সাতদিন অপেক্ষা করার পর আর সে নিজেকে স্থির রাখতে পারেনি। অশক্ত শরীরে বিপদ মাথায় করেই সে গভীর রাত্রে রওনা হয়েছিল অরণ্যভূমের ও-প্রান্তে সেই সোনাবালুচরে। কুঠারখানা নিতে ভোলেনি। ক্লান্ত দেহে 'দলছুট' অঘোরে ঘুমোচ্ছে দেখে সে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে গুহার বাইরে বেরিয়ে আসে। কাঠকুঠোগুলো আবার সাজিয়ে দেয়। ডানহাতে কুঠারটা ধরে নিচের নিস্তব্ধ বনভূমির দিকে তাকিয়ে দেখে।

আকাশে চাঁদ নেই। এক আকাশ তারা। 'তুমি' একবার ঊর্ধ্ব আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখল। অসংখ্য আলোকবিন্দু। সে কোন নক্ষত্রকে চেনে না। ওর সেদিনের সেই অভিসার-রাত্রেও হয়তো আকাশে ছিল পরিচিত তারকা-গোষ্ঠী। লুব্ধক হয়তো লুব্ধ দৃষ্টিতে ওর নিরাবরণ সৌন্দর্য লক্ষ্য করছিল, ছিল ব্রহ্মহৃদয়, অভিজিৎ—কালপুরুষের কাঁধের উপর দিয়ে উঁকি মেরে সেই নগ্নিকা নারীকে দেখছিল আর্দ্রা। সে তাদের কাউকে চেনে না। পাঠক! এই প্রসঙ্গে একটা কথা জনান্তিকে বলে নিই, কিছু মনে করো না। যত বড় জ্যোতির্বিজ্ঞানীই হও না কেন, নায়িকা-'তুমি' নয়, পাঠক-তুমিও সেরাত্রে উপস্থিত থাকলে ঐ নক্ষত্রদের সনাক্ত করতে পারতে না! পাঁচ লক্ষ বছর পূর্বে সপ্তর্ষির ধ্যানে বসার ভঙ্গিটা ছিল অন্য ধাঁচের, কালপুরুষের আকৃতি অন্য রকম, কে জানে বৃশ্চিকের লেজটা হয়তো সেদিন ছিল সোজা এবং ধ্রুব নক্ষত্রও তখন ছিল অ-ধ্রুব! সে এক অচেনা মহাকাশের অজানা নক্ষত্র সমাবেশ।

নিঃশব্দসঞ্চারী শ্বাপদের মত অকুতোভয়ে 'তুমি' এগিয়ে চলল নদীর দিকে।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরেও যখন 'তুমি' ফিরে এল না তখন 'দলছুট' উঠল। গুহামুখে কাঠগুলো সাজানোর কায়দা দেখে তার সন্দেহ ঘনীভূত হল—'তুমি' অল্প সময়ের জন্য বাইরে যায়নি। যাবার সময় সঙ্গীর নিরাপত্তার কথা ভেবে কাঠগুলো সযত্নে সাজিয়ে রেখে গেছে।

যা ভেবেছিল তাই! নদীর কিনারায় এসে দেখল স্ফটিকপিণ্ডের সামনে হাঁটু মুড়ে বসে আছে 'তুমি'—তার দুই হাত দুপাশে মাটি স্পর্শ করেছে। তার বাহ্যজ্ঞান নেই, চোখে মুগ্ধ দৃষ্টি। প্রেমাস্পদার দৃষ্টি। আর জন্তুটা? সে ঐ নারীমূর্তির সম্মুখে নিজের বিক্রম দেখাচ্ছে! লাল-নীল-হলুদ-সবুজ আলোর

ফুলঝুরি কাটছে। অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করে শুকনো কাঠকুঠোয় আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে।

দলছুট যেন উন্মাদ হয়ে গেল মুহূর্তে। ঝাঁপিয়ে পড়ল 'তুমির' উপর। প্রচণ্ড প্রহারে সেই আসন্নপ্রসবাকে জর্জরিত করে তুলল। 'তুমি' কোন প্রতিবাদ করল না। সে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করল ওর পরুষ প্রহারে। 'দলছুট' শেষমেশ ওর চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে নিয়ে চলল তাদের একান্ত গুহায়।

সেখানে থাকল না কিন্তু। গুহামুখে 'তুমি'কে আছড়ে ফেলে সে উল্কার বেগে ছুটে বেরিয়ে গেল। এবার সে প্রতিশোধ নেবে। 'তুমির' শাস্তিবিধান সে করেছে; তার প্রতিদ্বন্দ্বীকেও সে ছেড়ে কথা বলবে না।

পরদিন সমস্ত দিনমান প্রতীক্ষায় কাটল। 'দলছুট' ফিরে এল না। সমস্ত দিন ও সারারাত নির্জন গুহায় অভুক্ত মেয়েটি গুহামুখে একটি পরিচিত মূর্তির আবির্ভাবের প্রত্যাশায় বসে রইল। সমস্ত রাত শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যভূমে যত রকম শব্দ ওঠে ওর মনে হয় এইবার সে ফিরে আসছে। কিন্তু না। 'দলছুট' ফিরে এল না। তৃতীয় দিন অপরাহ্ণে দুর্বল দেহে 'তুমি' একাই বার হল নিরুদ্দিষ্টের সন্ধানে। প্রতি পদক্ষেপে যেন সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হচ্ছে। স্ফীতোদরা অভুক্ত 'তুমি পাহাড় থেকে নেবে এল চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে। যেন 'দলছুট' তার ঈর্ষার আঘাতে 'তুমি'কে বিবর্তনের বিপরীত পথে ঠেলে দিয়েছে, হোমো-ইরেক্টাস থেকে চতুষ্পদায়।

নিষ্প্রভাত রাত্রি হয় না। যন্ত্রণাদায়ক পদযাত্রাও এক সময়ে শেষ হল। অরণ্যভূম অতিক্রম করে 'তুমি' এসে উপনীত হল য়াং-হো স্রোতস্বিনীর ধারে চিহ্নিত স্বর্ণবালুকার প্রান্তে। প্রথমেই আকণ্ঠ জলপান করল। তারপর টলতে টলতে এসে দাঁড়ালো সেই স্ফটিকপিণ্ডের সামনে। সেখানেই সন্ধান পেল তার প্রেমাস্পদের। দুই হাত ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত করে আর্তনাদ করে উঠল 'তুমি'। সংজ্ঞা হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল বালুকা-বেলায়।

না, দলছুটকে সে দেখতে পায়নি। স্ফটিক-স্তম্ভের সম্মুখে, একটা পাথরের উপর চাপ-চাপ রক্তের একটা মৃত্যুচিহ্ন। পড়ে আছে দলছুটের কালজয়ী ব্রহ্মাস্ত্রটা: আর রক্তের একটা ধারাচিহ্ন চলে গেছে বালুকাভূমি থেকে ঐ কৃপাণদন্তীদের রাজ্যে—অরণ্যভূমের দিকে।

দুইয়ে দুইয়ে চার হয় তা বোঝে না 'তুমি', কিন্তু রক্তাক্ষরে লেখা ঐ শিলা-লিপির অর্থ সে বুঝে ফেলল। মাৎসর্যবিষে মাতাল হয়ে গিয়েছিল 'দলছুট'! যে সতর্কতা জীবন-সংগ্রামে মৃত্যুর বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় হাতিয়ার সেটা অবলুপ্ত হয়েছিল দলছুটের। আর সেই খণ্ড-মুহূর্তে ওর অসতর্কতার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছে সেই আহত কৃপাণদন্তী—বিশ্ববিজয়ের দ্বৈরথ-সমরে হোমোইরেক্টাসের এক বাজি হার হয়েছে। কৃপাণদন্তী রক্তের আখরে সেই শিলালিপিতে ইতিহাসে স্বাক্ষর রেখে চলে গেছে তার নিজরাজ্যে।

কতক্ষণ সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে ছিল জানে না। নিষ্প্রভাত যেমন রাত্রি হয় না, নিঃসন্ধ্যা দিনও হয় না তেমনি। তিল তিল করে ঘনিয়া আসে দিবাবসানের

সন্ধ্যা। অবশেষে উঠে বসল 'তুমি'। বুঝল, যা ঘটেছে তার প্রতিকার নেই। মৃত্যু যে অমোঘ, এ বোধ তার আছে। যে গেছে সে আর ফিরবে না। মৃত্যু যাকে ছিনিয়ে নেয় তার প্রস্থান-পথ ঘড়া ঘড়া অশ্রু ঢেলে পিচ্ছিল করতে পার, কিন্তু তার গতিপথ একমুখী; তাকে ফেরানো যায় না। জীবনের দায় তার চেয়েও বড়; দাবীও।

রক্তবিন্দুর ধারা-চিহ্ন রেখা ধরে নিরুদ্দিষ্টের দেহাবশেষ সন্ধান করল না 'তুমি'; বরং অরণ্যভূমের প্রান্তে গিয়ে মাটি খুঁড়ে বার করল কন্দমূল জাতীয় কোন আহার্য। কামড়ে কামড়ে খেল যতটা পারে। চরাচর নিস্তব্ধ। প্রায়-মানবেরা গভীর অরণ্যের ও-প্রান্তে চলে গেছে বোধ হয়। দূরে আকাশে উড়ছে কতকগুলো বিরাটাকার পাখী। শকুন নয়, টেরানোডন, শকুনের পূর্বপুরুষ। চক্রাকারে পাক খাচ্ছে অরণ্যভূমের এক-অংশের আকাশে। তার অর্থও বুঝতে পারে 'তুমি'। ও দেখতে পাচ্ছে না, ঐ গগনচারী চক্রাবর্তনকারী পক্ষীকুল দেখতে পাচ্ছে তার প্রেমাস্পদকে। কৃপাণদন্তীর নখাঘাতে ছিন্নভিন্ন তার মৃতদেহটার যৎকিঞ্চিৎ অবশেষ।

আহারান্তে পুনরায় জলপান করল তুমি। পরিস্থিতিটা বুঝে নেবার চেষ্টা করল। 'জীন'-এর নির্দেশে সে জানে তার জীবনে একটি মহাসন্ধিক্ষণের দ্বার-দেশে সে দাঁড়িয়ে আছে। এসময়ে কোন একজনের সাহায্য তাকে নিতেই হবে। দলছুট ছিল ওর সঙ্গী। এখন কি তাকে বাধ্য হয়ে ঐ প্রায়মানবদের মধ্যেই ফিরে যেতে হবে? শুধু সন্তানের মুখ চেয়েই নয়, ও বুঝতে পারে ঐ অরণ্যচারী কৃপাণদন্তী অচিরেই ফিরে আসবে অসহায়া নারীর একান্ত-আবাসে—শুধু খাদ্যের সন্ধানে নয়, তার বিজয়োৎসবের শেষ গৌরব-মুকুটটা ছিনিয়ে নিতেও।

হঠাৎ 'তুমি'-র নজর পড়ল ঐ স্ফটিক পিণ্ডটার দিকে। আশ্চর্য! তার কোন ভাবান্তর নেই। আলোকবিন্দুর সংকেত নিরবচ্ছিন্ন ধারায় বসানো-তুবড়ির ফুলঝুরি এঁকে চলেছে, অসংখ্য চক্রাকার যন্ত্র পাক খাচ্ছে ক্রমাগত। পায়ে পায়ে এগিয়ে আসে 'তুমি'। দাঁড়ায় বস্তুটার সামনে। তৎক্ষণাৎ একটা বাতি জ্বলে ওঠে যন্ত্রের ভিতর। তীব্র বিদ্যুৎছটা নির্গত হয় ঐ একচক্ষু দানবটার অক্ষি-তারকা থেকে। 'তুমি' অবাক বিস্ময়ে দেখে সেই রশ্মিচ্ছটা সামনের একটা শুকনো গাছের ডালে পড়া মাত্র দপ্ করে সেটা জ্বলে ওঠে। বিদ্যুৎ স্পৃষ্টার মত এক পা পিছিয়ে যায় 'তুমি'। আগুনের প্রতি সহজাত আতঙ্কের তাড়নায়। আগুনকে সে ভয় পায়। আগুনের কাছ থেকে দূরে থাকার নির্দেশ সঞ্চিত আছে তার মস্তিষ্কের কোষে। লক্ষ লক্ষ বৎসরের বিবর্তনের ফলশ্রুতি।

কিন্তু! 'তুমি'র মনে হল স্ফটিক-স্তম্ভটা কিছু যেন বলছে। যেন ওকে এগিয়ে যেতে বলছে ঐ অগ্নিকুণ্ডের দিকে। হ্যাঁ তাই। কিন্তু কেন? তা জানে না, তবু নির্দেশমত 'তুমি' তিল তিল করে এগিয়ে গেল অগ্নিকুণ্ডটার কাছে। অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করে দেখল। না! নিরাপদ দূরত্বে বসে অগ্নিকুণ্ডটাকে নিরীক্ষণ করার মধ্যে ভয়ের কিছু নেই। সাহস বাড়ল। 'দলছুট' যেমন অতি সন্তর্পণে স্ফটিক-পিণ্ডটার গায়ে হাত বুলিয়েছিল, ঠিক তেমনিভাবে 'তুমি' তার

নখলাঞ্ছিত একটি হাত বাড়িয়ে দিল জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ডটার দিকে। যে প্রান্তে আগুন সেদিকে নয়, তার বিপরীত দিকে। না গরম নয়। পারছে, কাঠের এ প্রান্তটা সে মুঠো করে ধরতে পারছে। ধীরে ধীরে অগ্নিকুণ্ডের ভিতর থেকে প্রজ্বলিত কাষ্ঠখণ্ডটা বের করে আনল। আশ্চর্য! অপরিসীম আশ্চর্য! 'তুমি' একটা জ্বলন্ত কাঠকে মাথার উপরে তুলে ধরেছে। তার ও-প্রান্তে মৃত্যু, এ-প্রান্ত তার করায়ত্ত। তার অর্থ? সে কি মৃত্যু-আয়ুধ পেল নাকি? বিশ্ব-বিজয়িনীর মুকুট!

'তুমি' সেই জ্বলন্ত কাঠখানাকে বয়ে নিয়ে এলো। কিছু শুকনো ডালপালায় গুঁজে দিয়ে দেখতে চাইল প্রতিক্রিয়াটা। কী অদ্ভুত! এক অঙ্গ থেকে আর এক অঙ্গে অগ্নিতরঙ্গ অব্যাহিত হল। 'তুমি' আনন্দে চীৎকার করে উঠল। জ্বলন্ত মশাল হাতে সে এগিয়ে এল স্ফটিক স্তম্ভটার কাছে। মনে হল সেটা হাসছে। তার পাদমূলে জ্বলন্ত মশালটা সে নামিয়ে রাখে। ঐ অজ্ঞাত দেবতাকে—হ্যাঁ দেবতাই, 'তুমি'র মস্তিষ্কে এতক্ষণে দেবতার ধারণা জাগছে। দেবতা কী? যাকে ধরা-ছোঁয়া যায় না, যে তোমার ভাল করে, যে তোমাকে পথের সন্ধান দেয়—ঐ দেবতাকে কী করে কৃতজ্ঞতা জানাবে ভেবে পায় না 'তুমি'। অভ্যাসবশে সে চতুষ্পদার ভঙ্গিতে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে। দু-হাতে মাটি স্পর্শ করে। তবু যেন তৃপ্তি হয় না। এভাবে তো দলপতিকেও সম্মান জানাতে হয়। ঐ দেবতা যে দলপতির অনেক-অনেক ঊর্ধ্বে। তাঁকে এভাবে সম্মান জানিয়ে যেন তৃপ্তি হল না ওর। শুধু হাত-পা মাটিতে ঠেকানোই যেন যথেষ্ট নয়। 'তুমি' সেই স্বর্ণবালু-বেলায় তার সর্বাঙ্গ স্পর্শ করাতে চাইল মেদিনীতে।

প্রাগৈতিহাসিক অরণ্যের প্রান্তে পৃথিবীর ইতিহাসে সেই বোধকরি প্রথম 'সাষ্টাঙ্গ প্রণাম'।

পরমুহূর্তেই সে বিদ্যুৎচমকে উঠে বসে। ষষ্ঠ-ইন্দ্রিয়ের তাড়নায়। চোখ-কান ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের অবদান ছিল কিনা জানি না—ওর মনে হল মৃত্যু এসে দাঁড়িয়েছে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে—ঠিক ওর পিছনেই। বিদ্যুৎবেগে সে তুলে নিল তার নবলব্ধ হাতিয়ার। উঠে দাঁড়ালো মুহূর্তে। ঠিকই বুঝেছে সে। মৃত্যুদূত সত্যই এসে দাঁড়িয়েছিল অলক্ষ্যে। আকাশে একটা হলুদরঙের রামধনু রচনা করে সেই মৃত্যুদূত ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর উপর।

এবারও খণ্ড-মুহূর্তের জন্য বিলম্ব হয়ে গিয়েছিল কৃপাণদন্তীর। তুমি বিদ্যুৎবেগে একপাশে সরে যায় এবং প্রাণধারণের সহজাত সংস্কারের তাড়নায় জ্বলন্ত কাঠখানা দিয়ে সজোরে আঘাত করে ওর মাথায়। একটা আর্তনাদ! কৃপাণদন্তী দ্বিতীয়বার আক্রমণ করেনি। অগ্নিপ্রহারে সে বজ্রাহত। একটি আঘাত সহ্য করেই সে দ্বৈরথ সমরে ভঙ্গ দিল। বিশ্ববিজয়ের জয়তিলক আর কোনদিন উঠবে না তার ভ্রূমধ্যে। পৃথিবী নামক গ্রহে রাজাধিরাজের শূন্য সিংহাসনের অধিকারী কে হবে তা পূর্ব-মুহূর্তেই নির্ধারিত হয়ে গেছে।

কৃপাণদন্তী নয়—ঋজু প্রায়মানব!

ব্যাপারটা বুঝে নিতে একটু সময় লাগল। কার্য-কারণ সম্পর্ক! তারপর ওর সেই হাজার সি. সি. মস্তিষ্কে ঘটনার ব্যঞ্জনাটা পরিস্ফুট হল। যে আগুনকে সমস্ত জীবজগৎ ভয় করে,সেটা এই মুহূর্তে 'তুমি'র আয়ত্তাধীন! আর দুনিয়াকে 'তুমি' ভয় করে না। 'তুমি' বিশ্ববিজয়িনী।

কিন্তু এই যুগান্তকারী আবিষ্কারের কথা তুমি কাকে শেখাবে? কেমন করে সে স্বজাতীয়দের বোঝাবে যে, অগ্নিহোত্রী 'তুমি' আজ বিশ্ববিজয়িনী! ওরা তো এ তত্ত্ব বুঝবে না। আগুন হাতে সে ওদের দিকে অগ্রসর হলেই ওরা মনে করবে ও হচ্ছে শত্রুপক্ষীয়। দূর থেকে পাথর ছুঁড়ে ওকে হত্যা করবে। আগুন ওদের শত্রু—আগুনের সঙ্গে যে মিতালী করে সেও শত্রু। এই অরণ্য ওদের খাদ্যের নিত্য যোগান দেয়; কিন্তু যেদিন দাবাগ্নি হাতে অরণ্যভূমি লেলিহান শিখায় ভৈরবী সাজে সেদিন সব প্রায়মানব তাকে শত্রুরূপ কল্পনা করে।

'তুমি' এ সমস্যার কোন সমাধান খুঁজে পায় না। তার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করতে পারার মত মানসিকতা ওর চেনা-জানা দুনিয়ায় ছিল শুধু এক-জনেরই, অগ্নির আশীর্বাদ সে পাবে না, অগ্নির অভিশাপ মাথায় নিয়ে সে চলে গেছে নেপথ্যে। ঈর্ষার অগ্নি! তাহলে? কেমন করে, কাকে 'তুমি' শোনাবে তার যুগান্তকারী আবিষ্কারের কথা? সদ্যলব্ধ অমৃতকুম্ভ সে দিয়ে যাবে কোন উত্তর-সাধকের হাতে?

সহসা 'তুমি'র স্মরণে জাগ্রত হল স্ফটিক-দেবতার মূর্তি! হ্যাঁ, পারলে তিনিই নির্দেশ দিতে পারবেন। যে সমস্যার কূলকিনারা তার জানা নেই তা ঐ দেবতার কাছে সহজ সরল। জ্বলন্ত মশাল হাতে আসন্নপ্রসবা অগ্রসর হয়ে আসে তার দেবতার সন্নিকটে। 'তুমি' আকাশের দিকে মশাল তুলে ধরে। পীবরবক্ষের উপর রাখে বাম হস্ত। নির্বাক প্রতীক্ষা করে।

তার নীরব প্রশ্নের জবাব চায়। নির্দেশ চায়।

বিশ্ব চরাচর স্তব্ধ। কোথাও কোন শব্দ নাই, কোথাও কোন স্পন্দন নাই। স্ফটিকস্তম্ভের ভিতর দ্রুত-আবর্তিত চক্রগুলি ক্রমে ক্রমে স্তিমিত হয়ে আসছে। বাতাস নাই, গাছের একটি পাতাও কাঁপছে না। যেন সেই অস্তসূর্যউদ্ভাসিত রক্তিম সান্ধ্য মুহূর্তে প্রপঞ্চময় এই বিশ্ব-চরাচর কিসের প্রতীক্ষায় রুদ্ধ নিঃশ্বাসে প্রহর গুনছে। সৌরমণ্ডলের এই তৃতীয় গ্রহে মহা-ইতিহাসের যুগসন্ধিক্ষণে ঐ অগ্নিহোত্রী নিরাবরণা মহাসন্ন্যাসিনীর নীরব প্রশ্নের জবাবে স্ফটিক-দেবতা কী প্রত্যুত্তর করেন তাই শুনবার জন্য বিশ্বপ্রকৃতি রুদ্ধশ্বাসে মহামৌন।

না! স্ফটিক-দেবতা নিরুত্তর। নিশ্চল, স্থির—দেবতা যেন পাষাণে পরিণত। চিন্ময়ী যেন মৃন্ময়ীতে রূপান্তরিতা! যেন তাঁর ব্রত উৎযাপন সমাপ্ত। যেন তাঁর আর কোন কিছু করণীয় নাই। সান্ধ্য-আকাশে যেমন এক এক করে ফুটে উঠল মহাকাশের কৌতুকবিন্দু ঠিক তেমনি করে একে একে নিভে গেল স্ফটিক-দেবতার অযুত-নিযুত আলোকবিন্দু—লাল-নীল-সবুজ-হলুদ। ঘূর্ণমান রথচক্রগুলি স্তব্ধ হল। উৎযাপিত-ব্রত স্ফটিক-স্তম্ভ পাষাণে রূপান্তরিত!

অপরিসীম নিরাশার আর্তনাদ করে উঠতে চাইল 'তুমি'। এতবড় প্রাপ্তি

এভাবে ব্যর্থ হয়ে যাবে বুঝতে পেরে সে কান্নায় ভেঙে পড়তে চাইল। অগ্নিমন্ত্রে বৃথাই সে দীক্ষা নিয়েছে! উত্তরসাধক ভিন্ন এ মন্ত্র যে ব্যর্থ! দুরন্ত অভিমানে সে জ্বলন্ত মশাল সমেত দক্ষিণবাহু উত্তোলন করে। ঐ য়াং-হো নদীর গৈরিক জলে সে বিসর্জন দেবে তার মৃন্ময়ী অগ্নি-প্রতিমা।

ঠিক তখনই!

ঠিক সেই মুহূর্তেই জাগল স্পন্দন।

না! বহির্বিশ্বে সে স্পন্দনছন্দের কোন অনুরণন জাগেনি। প্রকৃতি তখনও ধ্যানমগ্না। বাতাস প্রবাহিত হয়নি অরণ্যশাখায়। তবু স্পন্দনটা অনুভব করেছে 'তুমি'। সে স্পন্দন জেগেছে ঐ নায়িকা জননীর অন্তরেন্দ্রিয়ে।

প্রাণের স্পন্দন! ওর জঠরস্থ উত্তরসাধক!

এক হাতে জ্বলন্ত মশাল, অপর হাতে স্ফীত উদরকে চেপে ধরে আসন্ন-প্রসবা জননী বসে পড়ে সেই প্রাগৈতিহাসিক অরণ্যের প্রান্তে, বালুকা-বেলায়!

অগ্নিমন্ত্র তার ব্যর্থ হয়নি। অনাগত উত্তরসাধক সাড়া দিয়েছে।

কান্নায় ভেঙে পড়ে সেই আদিম জননী।

এ কান্না ব্যর্থতার নয়, আনন্দের।

প্রসব-যন্ত্রণার বেদনার আনন্দ।

॥ দ্বিতীয় পর্ব ॥

স্থান : চন্দ্রলোক

কাল : 2001 খ্রীষ্টাব্দ

পাত্র : ডুডেকাহেড্রন

এবার নিয়ে বার-আষ্টেক মহাকাশচারণ তো হল, তবু যাত্রা-মুহূর্তে প্রতিবারের মত এবারও একটা মানসিক উত্তেজনা অনুভব করছিলেন ডঃ বিনায়ক শ্রীনিবাসন, নিখিল-ভারত মহাকাশচারণ সংস্থার ডিরেক্টার। বাতানুকূল-করা লাউঞ্জের একান্তে একটি সোফায় বসে কী একটা রিপোর্ট পড়ছিলেন তিনি। রাত তখন দুটো বেজে দশ, ভারতীয় স্ট্যাণ্ডার্ড টাইম। যাত্রা-মুহূর্তের বিশ মিনিট বাকি। এই যাত্রার কথা তিনি আজ সকালেও জানতেন না। দুপুরে এক বিশেষ সংবাদবহের মারফতে সংবাদটা শোনেন, কালবিলম্ব না করে তৎক্ষণাৎ রওনা হয়েছেন। রাত আটটায় প্রধান মন্ত্রী এবং আরক্ষা মন্ত্রীর সঙ্গে আধঘণ্টা-খানেক এক গোপন সাক্ষাৎকারে মিলিত হয়েছেন এবং তৎক্ষণাৎ কিছুটা জেট প্লেনে কিছুটা হেলিকপ্টারে পালাম বিমানঘাঁটি হয়ে এখানে এসে পেঁচৈছেন। প্রধান মন্ত্রীর বিশেষ নির্দেশে এদিকে যথা-নিয়মে তাঁর যাত্রার আয়োজন করা হয়েছে। মহাকাশযান তার একক যাত্রীকে নিয়ে যাত্রা করবার জন্য প্রহর গুনছে। রাত ঠিক আড়াইটায় 'টেক-অফ্' টাইম।

ব্যোমপোতাশ্রয়ের একজন অফিসার এগিয়ে আসছেন দেখে শ্রীনিবাসন তাঁর কাগজটা ব্রিফকেসে তুলে রেখে জিজ্ঞাসুনেত্রে তাকালেন।

মাপ করবেন ডঃ শ্রীনিবাসন, কয়েকজন সংবাদ-সংস্থার প্রতিনিধি আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান।

শ্রীনিবাসন একটু অস্বস্তি বোধ করেন। সমস্ত ব্যাপারটাই অত্যন্ত গোপন। তাঁর এই চন্দ্রলোক-যাত্রার কথা সংবাদপত্রের লোকেরা জানল কোথা থেকে ? সে প্রশ্ন করার আগেই দেখলেন কাচের দরজা ঠেলে চার-পাঁচজন সুবেশ ভদ্রলোক ও দুটি মহিলা এগিয়ে আসছেন তাঁর দিকে। তিন-চার কোণা থেকে পর পর কয়েকটা ক্যামেরার আলোকবিচ্ছুরণে চোখটা ধাঁধিয়ে গেল। দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেতেই দেখেন তিনি সাংবাদিকদের চক্রব্যূহে আবদ্ধ। একাধিক নোটবই ও মাইক্রোফোন তাঁকে ঘিরে আছে।

: কি ব্যাপার ? আপনারা কোথা থেকে আবির্ভূত হলেন ?

অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিনিধি একটি সুবেশ মহিলা ওঁর মুখের দিকে শব্দগ্রাহক যন্ত্রটা বাড়িয়ে ধরে বললেন, মাপ করবেন ডঃ শ্রীনিবাসন, বিংশ শতাব্দীর সঙ্গে আপনারা 'ঈথার'কে বিদায় দিয়েছেন ; কিন্তু 'ঈথার' আছে ! সর্বব্যাপী এবং সর্বগ ঈথার-তরঙ্গ। এই একবিংশ শতাব্দীতে তার অভিধা 'নিউস্-রিপোর্টার' !

শ্রীনিবাসন খুশি হলেন মেয়েটির চটুল রসিকতায়। হেসে বললেন, তাই তো মনে হচ্ছে ! ডক্টর আহ্মেদকে বলতে হবে আইনস্টাইনের থিয়োরিটাকে 'মডিফাই' করতে।

কিন্তু চটুল রসিকতা আদান-প্রদান মানসে এই শেষরাত্রে ওরা সমবেত হয়নি ব্যোমপোতাশ্রয়ে। রয়টারের প্রতিনিধি নিখুঁত স্যুটধারী যুবকটি বলে ওঠে, ডক্টর, যাত্রা-মুহূর্তে আপনি কি পৃথিবীর উদ্দেশে কোন বাণী দিয়ে যাবেন না ?

শ্রীনিবাসন বললেন, যাব। তোমরা সুখে থেকো, সেকেন্ডে একত্রিশ কিলোমিটার বেগে দরবেশী নাচ নাচতে থাকো।

একটা হাস্যরোল উঠল। সময় অল্প। সবাই জানে। তাই দ্বিতীয় একজন বলে বসে, কিন্তু আপনি তো আজ সন্ধ্যারাত্রে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। সেখানে নিশ্চয়ই—

তাকে মাঝপথে থামিয়ে শ্রীনিবাসন বলে ওঠেন, হ্যালো ডেভিড, তুমিও এসে জুটেছ! বৃথাই মাঝরাতে দৌড়াদৌড়ি করেছ। আমার কোন কিছু বক্তব্য নেই।

সাংবাদিক ডেভিড ওঁর পূর্ব-পরিচিত। সেই পূর্ব-পরিচয়ের সূত্র ধরে ডেভিড জানতে চায়, অন্তত একটা কথা স্বীকার করুন, অথবা অস্বীকার করুন—চাঁদে কি সত্যই কোন 'এপিডেমিক' হয়েছে? আজ বারোদিন সেখানে কেন—

এবারও ওকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে শ্রীনিবাসন বলেন, সরি! নো কমেণ্ট।

: চন্দ্রলোকে যাবার 'পাসপোর্ট' ভিসা' আবার কবে থেকে পাওয়া যাবে?

: পাসপোর্ট ভিসা ইস্যু করার দপ্তর তা বলতে পারবে। আমি নই।

ঠিক তখনই এগিয়ে এল সেই অফিসার ভদ্রলোক। বললে, ডক্টর! আপনি এবার আসুন। যাত্রার সময় হয়েছে।

নিখিল ভারত বেসরকারী টি. ভি. সংস্থার প্রতিনিধি বলে ওঠে, একটা কথা স্যার। আপনারা পাসপোর্ট ভিসা বন্ধ করেছেন বটে, কিন্তু ওরা করেনি—

'ওরা' যে 'কারা' লোকটি সে-কথা বলেনি। সেটা সকলেরই জানা। শ্রীনিবাসন তাঁর অ্যাটাচি কেস নিয়ে উঠে দাঁড়ান। বলেন, তাই নাকি? জানি না তো!

আবার হাস্যধ্বনি।

ভিড় দ্বিধাবিভক্ত হয়ে ওঁর যাত্রাপথ করে দিল। উনি হাতটা তুললেন। অনেকেই একসঙ্গে বলে ওঠে : বঁ ভয়েজ!

জলযাত্রা থেকে আকাশযাত্রায় 'বঁ ভয়েজ' আবিষ্কৃত ছিল গত শতাব্দীতে। আকাশযাত্রা যখন ব্যোমযাত্রায় রূপান্তরিত হল তখনও 'বঁ ভয়েজ'-এর কোন রূপান্তর ঘটেনি।

তা ঘটেনি। তবে অনেক কিছুরই আমূল পরিবর্তন হয়ে গেছে এই একবিংশ শতাব্দীর ঊষা-মুহূর্তে—এই পৃথিবী নামক গ্রহে। গত শতাব্দীর শেষ-দশকের একটা চুম্বকসার প্রথমেই বোধ হয় শুনিয়ে রাখা ভাল, তাহলে বিনা ব্যাখ্যাতে আমরাও বুঝে নিতে পারব 'ওরা' মানে কারা।

উনিশশ' পঁচাত্তর যেমন ছিল আন্তর্জাতিক নারী-বর্ষ, সেইমত উনিশশ' পঁচাশি-চিহ্নিত হয়েছিল 'আন্তর্জাতিক মানব-বর্ষ' রূপে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর চল্লিশ বছর পার হয়েছে। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধকে যে আপাতত এড়িয়ে যাওয়া গেছে, এমন একটা ধারণা বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী তিনটি রাষ্ট্রই তা পোষণ করছে। বলা বাহুল্য হবে হয়তো, রাষ্ট্রত্রয়—আমেরিকা, সোভিয়েত রুনিয়ান এবং লালচীন। অনেক রাজনৈতিক-দার্শনিকের মতে তৃতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের সম্ভাবনাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারার অন্যতম কারণটি হচ্ছে এই—ইতো-

মধ্যে উনিশটি রাষ্ট্র পারমাণবিক বোমার রহস্য জেনে ফেলেছে, তার ভিতর বারোটি রাষ্ট্র হাইড্রোজেন-বোমার তত্ত্ব জানে। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধলে গোটা পৃথিবীটাই ধ্বংস হয়ে যাবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে দু-পক্ষই গ্যাস বোমার ব্যবহার জানত, কিন্তু কেউই তা ব্যবহার করেনি—সেই নজির দেখিয়ে নোবেল লরিয়েট বিজ্ঞানী আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রফেসর ইক্‌বাল আহ্‌মেদকে একবার একজন সাংবাদিক নাকি প্রশ্ন করেছিল, তাহলে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে পারমাণবিক-বোমা ব্যবহার না করেও তো পৃথিবী মহাযুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে পারে? জবাবে দার্শনিক-প্রকৃতির বৈজ্ঞানিক নাকি বলেছিলেন—"তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে অ্যাটম-বোমার ব্যবহার হবে কি হবে না জানি না, তবু এটুকু বলতে পারি চতুর্থ বিশ্বযুদ্ধের আয়ুধ হচ্ছে শুধুমাত্র তীর ও ধনুক।"

পঁচাশি সালে মস্কো-তে যে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান-সম্মেলন হল সেখান থেকেই বলা যায় পৃথিবী নতুন পথে মোড় ফিরল। নেতৃস্থানীয় রাষ্ট্রের বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানীরা কয়েকটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন। প্রথম কথা, আকাশজয়ের যে প্রতিযোগিতা ষাটের দশক থেকে চলছিল আমেরিকা এবং রাশিয়ার ভিতর, ওঁরা বুঝলেন সেটা শুধু শক্তির অপব্যয়। কারণ সর্বসম্মতিক্রমে বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, সৌরজগতে পৃথিবী ছাড়া কোথাও কোন বুদ্ধিমান জীব নেই। নক্ষত্রলোকে থাকলেও থাকতে পারে ; কিন্তু তাদের দ্বারা এই পৃথিবীর জীবনযাত্রা প্রভাবিত হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। তাছাড়া চাঁদে বা মঙ্গলে গিয়ে মানুষের পক্ষে ব্যাপক ভাবে উপনিবেশ স্থাপনও অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। দ্বিতীয়ত পৃথিবীর সামনে দুটি সমস্যা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়েছে। একটি পৃথিবীর জনসংখ্যা সংক্রান্ত, খাদ্যাভাব, স্থানাভাব ইত্যাদি ; দ্বিতীয়টি পৃথিবীর শক্তি-উৎসের দ্রুত অবলুপ্তি।

উনিশশ' পঁচাশিতে পৃথিবীর লোকসংখ্যা হয়েছিল সাড়ে পাঁচশ কোটি। তার এক-তৃতীয়াংশ নাকি শুধু মহাচীনেই। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের মত সম্পন্ন দেশেও র‍্যাশন-প্রথা চালু হয়েছে। খাদ্যের কালোবাজার রুখতে আন্তর্জাতিক খাদ্য-সংস্থা তদারকি করছে। লালচীন ছাড়া পৃথিবীর সব কয়টি উন্নত রাষ্ট্রই বাধ্যতামূলক জন্মনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নিয়েছে। অপরপক্ষে পৃথিবীতে শক্তির উৎস যা ছিল—জ্বালানি কাঠ, কয়লা, পেট্রোলিয়াম ইত্যাদি অত্যন্ত দ্রুতহারে ক্ষয়িত হচ্ছিল। 'দ্রুতহারে' বলতে কী বোঝায় তা কিছুটা অনুধাবন করা যাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের জন্য আহূত বিশ্ববিজ্ঞানীদের সভার চেয়ারম্যান ভারতীয় বৈজ্ঞানিক ডক্টর হোমি ভাবার ভাষণ থেকে। ডক্টর ভাবা বলেছেন, "পৃথিবী কী হারে শক্তির ব্যবহার করছে তা বোঝাবার জন্য ধরা যাক তিন হাজার তিনশ' কোটি টন কয়লা জ্বালিয়ে যে শক্তি পাওয়া যায় তাকে আমরা বলছি 'ক-পরিমাণ' শক্তি। খ্রীষ্টজন্মের পর সাড়ে আঠারোশ' বছর ধরে বিশ্বমানব যে হারে শক্তি ব্যবহার করেছে তা হচ্ছে—প্রতি শতাব্দীতে অর্ধ-পরিমাণ 'ক'। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ সেটা বেড়ে হয়েছে প্রতি শতাব্দীতে পুরোপুরি 'ক'। বর্তমানে প্রতি

শতাব্দীতে আমরা '১০ক' পরিমাণ শক্তি ব্যবহার করছি। ভাষান্তরে বলা যায়—গত দু হাজার বছরে মানুষ যে পরিমাণ শক্তি ব্যবহার করেছে প্রায় তার আধা-আধি পরিমাণ ব্যবহার করেছে গত একশ বছরে।"

তাই সেই পঁচাশি শালের মহাসম্মেলনে আমেরিকা ও রাশিয়া এক যৌথ বিবৃতিতে নূতন কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। প্রতিযোগিতা এখনও চলছে তবে ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র নিয়েছে জন-সমস্যা, খাদ্য-সমস্যা ও স্থান-সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব। প্লাস্টিক খাদ্য, সামুদ্রিক উদ্ভিদ থেকে নির্মিত খাদ্য তারা বানিয়ে চলেছে; সমুদ্রের নিচে, সাহারার বুকে উপনিবেশ স্থাপনের আয়োজন হয়েছে। অপরপক্ষে সোভিয়েত রাশিয়া সৌরশক্তি এবং পারমাণবিক-শক্তি থেকে, জোয়ার-ভাটা এবং পৃথিবীর আভ্যন্তরিক উত্তাপ থেকে শক্তি আহরণের নূতন নূতন পদ্ধতি বার করে চলেছে।

বিশ্ববিজ্ঞান কংগ্রেসে অপেক্ষাকৃত দুটি অনুন্নত রাষ্ট্রের অনুরোধ অবশ্য ও'রা উপেক্ষা করেননি। মহাকাশ জয়ের প্রতিযোগিতা থেকে আমেরিকা ও রাশিয়া যখন স্বেচ্ছায় সরে দাঁড়ালো, তখন ঐ দুটি রাষ্ট্র ও বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজটা চালিয়ে যাবার বাসনা জানায়। এতে ও'রা আপত্তি করেননি। ফলে মহাকাশ জয়ের প্রতিযোগিতা সেই আশির দশক থেকেই ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কৌতুককর সংবাদটুকু হচ্ছে এই যে, কেউ কেউ বলেন, ঐ দুই নবীন প্রতিযোগীর পিছনেও নাকি আছেন দুটি প্রাচীন প্রতিযোগী। ভারতবর্ষকে যাবতীয় যন্ত্রপাতি এবং যাকে বলে 'টেকনিক্যাল নো-হাউ' দিয়ে তাই সাহায্য করেছেন মস্কো, আর করাচী মান-মন্দিরে এনে বসানো হচ্ছে ক্যালিফোর্নিয়ার পালোমার পর্বত-শিখর থেকে দুইশত ইঞ্চি ব্যাস-বিশিষ্ট লেন্সের সেই বিখ্যাত প্রতিফলন-দূরবীনটি। মঙ্গল গ্রহের আধখানা পাকিস্তানের দখলে, আধখানা ভারতের। চাঁদের উত্তর গোলার্ধ ভারতবর্ষের তত্ত্বাবধানে, দক্ষিণার্ধ পাকিস্তানের।

তাই ওরা' যে কারা তা বুঝতে কোনও অসুবিধা হয়নি ডঃ শ্রীনিবাসনের।

: আর এক মিনিট পরেই যাত্রা শুরু হবে।

মাইকে এ ঘোষণা শুনে ডঃ শ্রীনিবাসন তাঁর আসনের সঙ্গে নিজেকে বেঁধে ফেললেন। সহসা ও'র মনে হল একটা প্রচণ্ড শক্তি ও'র আসনের নিচে পুঞ্জীভূত হয়েছে—একটি পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণের কেন্দ্রস্থলে বসে আছেন তিনি।

: আর আধ মিনিট!

প্রাচীন প্রথার 'পাঁচ-চার-তিন-দুই-এক-নাউ' ঘোষণার রেওয়াজ অনেকদিন হল উঠে গেছে। ওতে নাকি যাত্রীর স্নায়ুতন্ত্রীতে অহেতুক চাপসৃষ্টি করা হয়।

ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ! আর পনের সেকেণ্ড। এই সময়ে ফুসফুসে যথেষ্ট বাতাস ভরে নিলে আপনারা আরও স্বস্তিবোধ করবেন।

ডঃ শ্রীনিবাসনের হাসি পায়। ব্যোমযানে তিনি একক যাত্রী। তবু রীতিরক্ষার কী বিচিত্র প্রয়াস! ডঃ শ্রীনিবাসন ঘাড় ঘুরিয়ে বলতে গেলেন 'ধন্যবাদ'; কিন্তু বলা হল না। ঠিকসেই মুহূর্তেই যাত্রা শুরু করল ব্যোমযান—স্পেশাল ফ্লাইট

নং এক—ভারত থেকে মহাকাশ-স্টেশন—'পান্থপাদপ'।

পৃথিবী থেকে চাঁদে অভিযানের এই দীর্ঘ চার লক্ষ কিলোমিটার যাত্রাপথে ঐ একটিই মহাকাশ-স্টেশন—ভারত ও পাকিস্থানের যৌথ-দায়িত্বে সে নভোচারী। দুর্ভাগ্যবশতঃ তার দুটি নাম—'পান্থপাদপ' এবং 'মোনাজাত' কারণটা লেখা বাহুল্য।

ডঃ শ্রীনিবাসনের মনে হল, কে-যেন তাঁর মাজা ধরে প্রবল আকর্ষণে পৃথিবীর দিকে টানছে। সীটের গদির ভিতর তিনি যেন প্রোথিত হয়ে যাচ্ছেন। তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ওঁর জানা, তবু প্রতিবারের আকাশযাত্রার মত এবারও তাঁর মনে হল পৃথিবী যেন বলতে চাইছে : যেতে নাহি দিব।

মনে পড়ল পৃথিবীর কথা। স্ত্রীর কথা। পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সেও বৈজ্ঞানিকের নিঃসন্তানা চল্লিশ বৎসর বয়স্কা জীবনসঙ্গিনীর কথা। এই খণ্ড-মুহূর্তে তাঁর যে-কথা মনে পড়ল তা নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক। বিশ্ববিজ্ঞানের নির্দেশে এই যে তিনি সহধর্মিণীকে সন্তানবতী হতে দেননি এটা কি ভাল করেছেন?

কেবিন থেকে ভেসে এল বার্তা : এবার আমাদের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হচ্ছে।

শ্রীনিবাসন স্ত্রীর কথা ছেড়ে তাঁর যাত্রার প্রসঙ্গে ফিরে এলেন। মনে পড়ে গেল স্পেশাল ফ্লাইট নং ১-এর দুটি পর্যায়। যেন এক মহগরুড় একটি পক্ষীশাবক নিয়ে যাত্রা করেছে। মহাগরুড় পৃথিবীর আকর্ষণকে অতিক্রম করে মাত্র দুইশত মাইল উপরে উঠবে। তারপর পক্ষীশাবক সেই মহগরুড়ের পিঠে আঘাত করে উড়ে যাবে মহাশূন্যে মহাকাশ স্টেশন পান্থপাদপের উদ্দেশে। মহাগরুড় পনের হাজার কি. মি. ব্যাপী একটি বৃত্তচাপ রচনা করে গিয়ে পড়বে ভারত মহাসাগরে। কয়েক ঘণ্টা পরেই তাকে উদ্ধার করে আনা হবে, সারানো হবে এবং তাকে পারমাণবিক শক্তিতে তেজোময় করে তোলা হবে ভবিষ্যতের জন্য। মহাগরুড় এভাবে ক্রমাগত পক্ষীশাবককে মহাকাশে প্রেরণ করতে থাকবে, নিজে সে কোনদিনও সেখানে পৌছাবে না। মহগরুড় যেন চিনির বলদ!

মহাকাশে উপর-নিচ বলে কিছু নেই। তবু পৃথিবীর অভিজ্ঞতা এখনও ওঁর মজ্জায়। ডঃ শ্রীনিবাসনের মনে হল মেজেটা যেন একটা খাড়া দেওয়াল আর থ্রি-টায়ার ট্রেনের কামরায় বাংকের মত তাতে সীটগুলো গাঁথা। এ অবস্থায় হাঁটাচলা অসম্ভব। কিন্তু কী আশ্চর্য—সেই খাড়া দেওয়াল বেয়ে টিকটিকির মত এগিয়ে এল একটি মেয়ে—'স্পেস্-হস্টেস্' অর্থাৎ ব্যোম-সঙ্গিনী। তার পায়ের জুতোয় আছে কাঁটা, প্রতিটি পদক্ষেপে সে ঐ খাড়া দেওয়ালের সঙ্গে সেঁটে যাচ্ছে। এভাবে হাঁটতে সে অভ্যস্ত। বছর কুড়ি বাইশ বয়স হবে তার। পরনে ব্যোম-সঙ্গিনীর রীতি অনুযায়ী লাল-সাদা পোশাক। মিষ্টি দেখতে। বললে, ডক্টর, আপনাকে কিছু পানীয় এনে দেব? চা অথবা কফি?

শ্রীনিবাসন মৃদু হেসে বললেন, না, ধন্যবাদ।

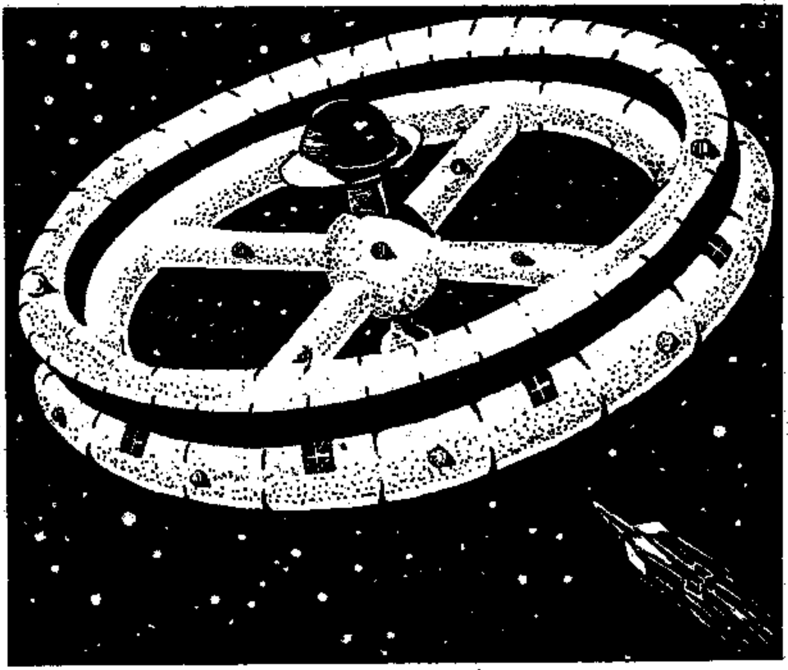
এতবার আকাশযাত্রা করেও ভ্রমণের এই পর্যায়ে তিনি আজও কোন কিছু পান করেন না। নিজেকে কেমন যেন খোকা খোকা মনে হয়। পান করা অর্থ তো সেই প্লাস্টিকের টিউব মুখে দিয়ে চোষা।

মেয়েটি কিন্তু চলে গেল না। ইতস্তত করতে থাকে। শ্রীনিবাসন নিজে থেকেই বলেন, আর কিছু বলবে ?

: হ্যাঁ, যদি আপনি কিছু মনে না করেন।

: মনে করব কেন ? বল না, কি বলতে চাও ?

: আমার নাম মিস মণীষা বসু। আমার স্বামী এখন কেপলার বেস-এ পোস্টেড। আজ প্রায় সাতদিন আমি তার কোন খবর পাইনি।



চিত্র ২—মহাকাশ-স্টেশন "পান্থপাদপ"

: ভারী দুঃখের কথা। সে বোধহয় জরুরী কাজে অন্য কোথাও গেছে। কী নাম তার ?

: ডঃ ইন্দ্রজিৎ সিং। জিওলজিস্ট, মানে 'মুনোলজিস্ট'। না, ডক্টর, জরুরী কাজে অন্য কোথাও গেলে সে প্রতিবারেই আমাকে ফোনে জানিয়ে যায়। তাই ভাবছিলাম···মানে, সত্যিই কি ওখানে কোনও এপিডেমিক শুরু হয়েছে ?

সরাসরি প্রশ্নটা এড়িয়ে শ্রীনিবাসন জবাবটা জেনেও বলেন একটা কথা। তোমার স্বামী ডক্টর সিং অথচ তুমি মিস বসু আছ কেমন করে ?

: আমাদের 'ট্রায়াল ম্যারেজ' চলছে। আমি উপাধি বদলাইনি এখনও। মাপ করবেন, আমি আপনাকে বিব্রত করতে চাই না, কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই ঐ কেপলার বেস-এ যাবেন···

: আমার মনে থাকবে মিস বস্‌। সেখানে যদি যাই ডক্টর সিং-এর খোঁজ করব। এবং ফেরার পথে তোমাকে খবরটাও জানাব।

: ধন্যবাদ। অসংখ্য ধন্যবাদ ডক্টর শ্রীনিবাসন।

আরও আধ ঘণ্টা পরে ঘোষণা হল: দশ মিনিটের মধ্যেই আমরা পান্থ-পাদপের সঙ্গে যোগাযোগ করব। আপনারা পেটির বাঁধন শক্ত করুন এবং সামনের লালবাতি সবুজ না হওয়া পর্যন্ত আসন ত্যাগ করবেন না।

শ্রীনিবাসন সে আদেশ প্রতিপালন করলেন। কয়েক মিনিট পরেই জানলা দিয়ে মহাকাশ স্টেশনকে আবছা দেখা গেল। মহারাজ ত্রিশঙ্কুর মত ব্যোমমার্গে নিঃসঙ্গ-সঞ্চারী যেন একটি সুদর্শনচক্র, যার ব্যাস ষাট মিটার। সূর্যকরোজ্জ্বল রথচক্রটি যেন ক্রমশঃ অগ্রসর হয়ে আসছে। পান্থপাদপের আকৃতি যেন একটি সিনেমার স্পুল। পাশাপাশি একজোড়া চাকাকে যেন একটি কেন্দ্রীয় 'অ্যাক্সেল' যুক্ত করে রেখেছে (চিত্র—২)। আরও কিছুটা এগিয়ে আসার পর বোঝা গেল, রথচক্রটা প্রতি পঁচিশ সেকেণ্ডে এক পাক করে ঘুরছে, যদিও কেন্দ্রস্থ সিলিণ্ডার বা চোঙাটা আদৌ ঘুরছে না। বস্তুত সেটা বিপরীত দিকে ঘুরছে বলে মনে হচ্ছে। স্টেশনের ঠিক পিছন পিছন চলেছে একটি গোলাকৃতি চন্দ্রযান। যদিও পান্থপাদপ ঘুরছে এবং চলছে, তবু তুলনামূলকভাবে বলতে পারি সেটি হচ্ছে আসলে একটি 'এয়ারোড্রোম' এবং ঐ চন্দ্রযান হচ্ছে পোতাশ্রয়ে রক্ষিত যেন একটি এয়ারোপ্লেন। ডঃ শ্রীনিবাসনকে এবার ঐ মহাকাশ-স্টেশন পান্থপাদপে 'ল্যাণ্ড' করতে হবে এবং পরবর্তী 'ফ্লাইট'-এ চন্দ্রযানে চেপে চন্দ্রলোকের দিকে যাত্রা করতে হবে। পান্থপাদপ গড়ে প্রায় সাড়ে তিনশ কি মি দূরত্বে অনন্তকাল পৃথিবীকে ক্রমাগত চক্রাবর্তন করে চলবে। ঐ সাড়ে তিনশ কি মি দূরত্বটা অপরিবর্তিত থাকছে বলেই তাকে স্থির এয়ারোড্রোমের সঙ্গে তুলনা করছি।

পান্থপাদপ যে মিনিটে একবার পাক মারছে তার কারণটাও সহজে অনুমেয়। পৃথিবী ছাড়িয়ে যত দূরে যাওয়া যাবে ততই পৃথিবীর টান বা অভিকর্ষ কমে আসবে। পৃথিবী থেকে সাড়ে তিনশ কি মি দূরে ঐ যে ষাট মিটার ব্যাস-বিশিষ্ট মহাকাশ-স্টেশন প্রতি পঁচিশ সেকেণ্ডে এক পাক ঘুরছে তাতে সে তার গর্ভস্থ প্রতিটি বস্তু ও ব্যক্তিকে ঘূর্ণনের জন্য একটি কৃত্রিম অভিকর্ষ দান করছে, অর্থাৎ তাকে চাঁদের অনুরূপ অভিকর্ষ কৃত্রিম উপায়ে পাইয়ে দিচ্ছে। বলা যায়, তাকে একটু সইয়ে নিচ্ছে।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই মহাকাশযানটি ঐ পান্থপাদপ-স্টেশনে এসে ঠেকল —ঠিক ঐ কেন্দ্রস্থ চোঙার মত ব্যারেলের পায়ে। যেহেতু সেটা ঘুরছে না, তাই শ্রীনিবাসন সহজেই তাঁর মহাকাশযান থেকে তাতে প্রবেশ করলেন—সহজেই নয় অবশ্য, কারণ এখন তাঁর ওজন অনেক কমে গেছে। দেওয়ালে লাগানো হাতল ধরে ধরে—কুয়োর ভিতর থেকে রিঙ বেয়ে যেভাবে মানুষ ওপরে ওঠে—সেইভাবে ক্রমশঃ ঐ স্টেশনের কেন্দ্রীয় কক্ষে প্রবেশ করলেন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন একজন অফিসার। বললেন, স্বাগত ডক্টর শ্রীনিবাসন, আপনার প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করছি। আমি এখানকার সিকিউরিটি অফিসার এ ভি. গণেশন।

শ্রীনিবাসন বাঁ হাতে একটা হাতলকে দৃঢ়ভাবে ধরে ডান হাতটা বাড়িয়ে দিলেন করমর্দনের জন্য। পিছন থেকে একটি নারীকণ্ঠে কে যেন বলল, নমস্তে ডক্‌টর-সাব্‌।

শ্রীনিবাসন ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলেন। আকাশ-সঙ্গিনী অনায়াসভঙ্গিতে দু-হাতে জোড় করে ওঁকে বিদায় সম্ভাষণ জানাচ্ছে। উনি কিন্তু দুটি হাত একত্র করতে সাহস পেলেন না। বললেন, নমস্তে। ক্যাপ্টেন রয়কে আমার অভিনন্দন জানাবে। আশা করি ফেরার পথে তোমার সঙ্গে দেখা হবে।

অত্যন্ত সাবধানে—প্রায় বছরখানেক তিনি আকাশচারণ করেননি, ওজন হারানোর অভিজ্ঞতাটা ফিরে আসতে সময় লাগবে—শ্রীনিবাসন সিকিউরিটি অফিসারের পিছন পিছন হাতল ধরে ধরে এগিয়ে চললেন। 'এয়ার-লক' দরজা ওঁর পিছনে বন্ধ হয়ে গেল—মহাকাশযান স্টেশন মুক্ত হল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কেন্দ্রীয় চোঙাটা অতি ধীরে ধীরে ঘুরতে শুরু করল। প্রথমে অতি ধীরে, ক্রমশঃ জোরে—সেই পঁচিশ সেকেণ্ডে এক পাক। অদৃশ্য অভিকর্ষের আঙুল এসে যেন চেপে ধরল ওঁকে। কেন্দ্রীয় চোঙা থেকে হাতল ধরে ধরে বাইরের চক্রের দিকে যতই অগ্রসর হতে থাকেন ততই যেন ওঁর ওজন বাড়ছে—হাঁটাচলা সহজতর হয়ে আসছে।

কেন্দ্রীয় চোঙা থেকে বহিঃচক্রে যাবার পাশাপাশি দুটি দ্বার। একটির মাথায় হিন্দীতে লেখা "ভারতীয় অংশের প্রবেশ দ্বার—স্বাগতম!" সাইনবোর্ডের নিচে রাশিয়ান, ইংরাজি, চীনা, ফ্রেঞ্চ ও জার্মান ভাষায় একই ঘোষণা। তার নিচে "আপনার পাসপোর্ট, ভিসা, স্বাস্থ্য-রিপোর্ট ইত্যাদি তৈরী রাখুন।" পাশের দরজার মাথাতেও অনুরূপ নির্দেশ, তবে সবচেয়ে বড় হরফে ঘোষণাটা করা হয়েছে উর্দুতে। সেটা পাকিস্তানী অংশের প্রবেশদ্বার।

যে-কোন দ্বার দিয়েই প্রবেশ কর, উপনীত হবে একই লাউঞ্জে, একই আসবাগারে। সিকিউরিটি-অফিসার গণেশনের পিছন পিছন শ্রীনিবাসন এসে উপনীত হলেন লাউঞ্জে। জানলার ধারে একটি টেবিলে গিয়ে বসলেন দুজনে। এ দিকটা সূর্যের বিপরীতে, তাই আলোর ঝলকানি নেই। জানলা দিয়ে পৃথিবীকে দেখা যাচ্ছে।

গণেশন বললে, আপনার চন্দ্রযান ছাড়তে এখনও কুড়ি মিনিট। একটু কফি বা চা···

: হোক। শুধু কফি। ব্ল্যাক কফি, চিনি ছাড়া।

পরিবেশক কেউ নেই। গণেশন এগিয়ে গেল কফি-পরিবেশক যন্ত্রটার দিকে। শ্রীনিবাসন জানলা দিয়ে পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে দেখলেন। সাড়ে তিনশ কিলোমিটার দূরত্ব থেকে পৃথিবীকে অদ্ভুত লাগছিল। প্রশান্ত মহাসাগরটা দেখা যাচ্ছে—উপর দিকটা মেঘে ঢাকা, অস্ট্রেলিয়ার উপকূলভাগ সনাক্ত করা যাচ্ছে। দৃশ্যমান পৃথিবীর বুকে সন্ধ্যা নেমে আসছে, কারণ মহাকাশ-স্টেশন পাশ্বপাদপ তার চক্রাবর্তন-পথে পৃথিবীর রাত্রি অঞ্চলের দিকে এগিয়ে চলেছে ক্রমশঃ। আধ ঘণ্টা পরেই উনি এ স্টেশন ছেড়ে চলে যাবেন, না গেলে দেখতে

পেতেন পৃথিবীতে ক্রমশঃ কীভাবে রাত্রির অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। তখন হয়তো আমেরিকার বিভিন্ন শহরে আলোক বিন্দুর দেওয়ালী দেখা যেত।

হঠাৎ কে যেন ও'র কাঁধে আলতো করে আঙুল ছোঁওয়ালো। চমকে মুখ ঘোরালেন শ্রীনিবাসন। মুহূর্তে চিনতে পারলেন আগন্তুককে—প্রফেসর ইব্রাহিম চৌধুরীকে। করাচী বিজ্ঞান-আকাডেমির-বিখ্যাত অধ্যাপকটিকে।

: হ্যালো!—সৌজন্য প্রকাশ করতেই হল, যদিও ওর আবির্ভাবে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করছিলেন শ্রীনিবাসন।

: ইটস্ এ স্মল য়ুনিভার্স! কী বলুন? পৃথিবী নয়, এ ব্রহ্মাণ্ডটাও কত ছোট!…তারপর আপনি কোথায় চলেছেন? চাঁদে?

আমতা আমতা করে শ্রীনিবাসন বললেন হ্যাঁ, আধ ঘণ্টার মধ্যেই।

ঠিক তখনই ফিরে এল গণেশন। শ্রীনিবাসন প্রফেসর চৌধুরীকে বলেন, এর সঙ্গে আলাপ আছে? এ হচ্ছে…

: বিলক্ষণ! মিস্টার গণেশনকে চেনে না কোন্ পাকিস্তানী? আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ যাঁর নোটবুকে লেখা থাকছে তাঁকে অন্তত মুখ চিনে রাখব না!

গণেশন বাগিয়ে একটা জবাব দিতে যাচ্ছিল, তার আগেই চৌধুরী বলে, প্লীজ মিস্টার গণেশন! ওটা থাক। চাঁদের টুকরো ছেলে চাঁদে যাচ্ছে, সেটা এভাবে সেলিব্রেটেড হতে পারে না। ওঠ তোমরা। চল 'বারে' গিয়ে বসি।

ইব্রাহিম প্রাণবন্ত, উচ্ছল। প্রৌঢ় শ্রীনিবাসনকে প্রায় টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে বসালো আসবাগারে। তিন পাত্র স্কচ-হুইস্কি নিয়ে এল তার প্লাস্টিক-কার্ড পাঞ্চ করিয়ে। এখানে মদও পাওয়া যায় যান্ত্রিক পদ্ধতিতে—পয়সা-কড়ি দিতে হয় না। প্লাস্টিক-কার্ড পাঞ্চ করাতে হয়। মাহিনা পাওয়ার সময় হিসাব মত তার সব খরচ কেটে নেওয়া হবে পার্সোনাল কার্ডের পাঞ্চ-মার্ক দেখে।

স্বাস্থ্যপানের ভঙ্গিতে পানপাত্রটা তুলে ধরে ইব্রাহিম বললে, তারপর ডঃ শ্রীনিবাসন, আপনাদের চন্দ্রলোকের খবর কি? মহামারীটা কি সত্যই ব্যাপক আকার ধারণ করেছে? আমি আপনাদের 'কেপ্লোর' বেস-এ যেতে চেয়েছিলাম, অনুমতি পাইনি!

শ্রীনিবাসন মনে মনে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। যেখানে বাঘের ভয় সেখানে সন্ধ্যা হয়! স্বজাতীয় সাংবাদিকদের কৌতূহল সহজেই নিবৃত্ত করেছিলেন; কিন্তু সেভাবে কি ইব্রাহিমকে ঠেকানো যাবে? এক চুমুক পান করে বললেন, কেপ্লার-বেস্-এ এখন আপনার না যাওয়াই মঙ্গল। এপিডেমিকটা অবশ্য এমন কিছু মারাত্মক নয়, তবু সাবধানের মার নেই।

: তাই বুঝি! তা অসুখের লক্ষণটা কি জাতীয়? মহাজাগতিক কোন কিছু? আমাদের চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের সাহায্য আপনারা নিচ্ছেন না কেন?

: আমি দুঃখিত প্রফেসর চৌধুরী। এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করার কোন অধিকার আমার নেই। আপনার সহৃদয় সাহায্যের প্রস্তাবের জন্য ধন্যবাদ। না, ওটা আমরা নিজেরাই সামলে নিতে পারব। বস্তুতঃ সেই জন্যেই আমাকে যেতে হচ্ছে।

অট্টহাস্য করে ওঠে ইব্রাহিম, এ কথা আমাকে বিশ্বাস করতে বলছেন? মহামারীই যদি প্রকৃত কারণ হত, তাহলে ডঃ শ্রীনিবাসনকে নিশ্চয় ভারত চাঁদে পাঠাত না। আপনি বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ এবং নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্ট; কিন্তু ডাক্তারীর আপনি কতটুকু জানেন?

শ্রীনিবাসন হেসে বললেন, আমি জ্যোতির্বিদ নই—'জ্যাক অব-অল-ট্রেডস' —যার অর্থ, বিজ্ঞানের প্রতিটি বিভাগে আমি সমানভাবে চূড়ান্তরূপে অজ্ঞ। সব বিষয়েই আমার জ্ঞান ঐ 'অ, আ, ক, খ' পর্যন্ত।

ইব্রাহিম একটা চুরুট ধরালো। বললে, তাহলেই হবে, তাহলেই হবে। আমি ঐজাতীয় 'অ, আ, ক, খ'-র একটা ধাঁধার সমাধান করে উঠতে পারছি না। আপনি আমাকে একটু সাহায্য করতে পারেন?

: চেষ্টা করে দেখতে পারি। সমস্যাটা কি?

: আপনার উচ্চারিত শব্দ-চতুষ্টয়ের মধ্যে দুটি অক্ষরের ভিতর একটি বাড়তি অক্ষর অনধিকার প্রবেশ করছে। তার অর্থ কী হতে পারে?

: বুঝলাম না। আর একটু পরিষ্কার করে বলুন?

: 'ক-চৌ-অ' শব্দটার অর্থ কী?

গণেশন হঠাৎ বিষম খেল। শ্রীনিবাসন মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, না প্রফেসর, আমার বিদ্যায় কুলাচ্ছে না। এমন শব্দ আমি ইতিপূর্বে কখনও শুনিনি। আপনি কোথায় শুনলেন?

প্রফেসর চৌধুরী জবাব দেবার আগেই গণেশন তার মণিবন্ধের দিকে এক নজর দেখে নিয়ে বললে, ডক্টর! এবার আপনাকে উঠতে হয়। আপনার চন্দ্রযান এবার ছাড়বে। আর মাত্র পাঁচ মিনিট বাকি।

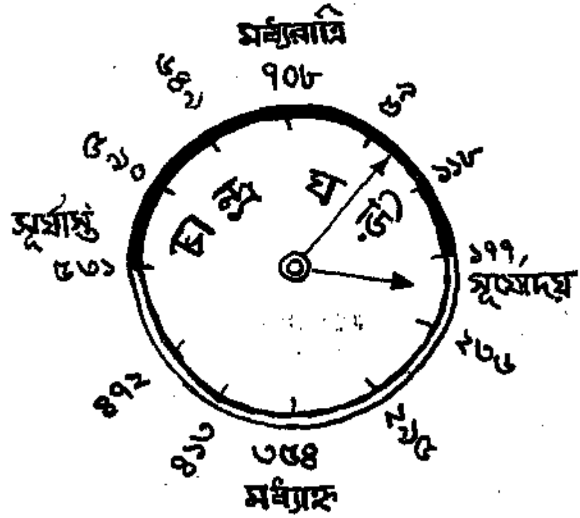
আসলে যে এখনও পনের মিনিট সময় আছে তা জানা ছিল শ্রীনিবাসনের; কিন্তু ঐ সন্ধানী ইব্রাহিমের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার এ সুযোগ পেয়ে তৎক্ষণাৎ লাফিয়ে উঠলেন শ্রীনিবাসন। উল্টে পড়েই যাচ্ছিলেন—কারণ বসে থাকা অবস্থায় ওঁর খেয়াল ছিল না উনি পৃথিবীতে নেই—ওঁর ওজন এখন অনেক কমে গেছে। সিকিউরিটি অফিসার খপ করে ধরে ফেলল ওঁকে।

: লেডিজ অ্যান্ড জেন্টেলমেন! একটি ঘোষণা আছে। আমরা এই মুহূর্তে ঠিক 'zero-gee' অতিক্রম করছি। পৃথিবী থেকে আমাদের বর্তমান দূরত্ব ৩,৫০,০০০ কি. মি., চাঁদের দূরত্ব ৫০,০০০ কিলোমিটার। আমাদের গতিবেগ এখন ঘণ্টায় ষাট হাজার কিলোমিটার। আমাদের ঘড়িতে এখন ভারতীয় সময় —বুধবার রাত্রি ৩টা ১২ মিনিট; স্ট্যান্ডার্ড মুন টাইম—অর্থাৎ আমাদের কেন্দ্রীয় বেস কোপারনিকাস সিডেরিয়াল টাইম ২০৫ ঘণ্টা ৬ মিনিট।

চন্দ্রযান 'অশ্বিনী'তে দশজন যাত্রী বসার ব্যবস্থা আছে। বর্তমানে তাতে একটি মাত্র যাত্রী—তিনজন চালকের কথা বাদ দিলে। সেই একক যাত্রী ডঃ শ্রীনিবাসন ইতিমধ্যে ঘণ্টা-আষ্টেক ঘুমিয়ে নিয়েছেন। আরামদায়ক গদিতে অর্ধশয়ান হয়ে শুয়েছিলেন তিনি। ঘোষকের ঐ নির্দেশটি শুনে নিজ মণিবন্ধের

ঘড়িটি খুলে ফেললেন। অ্যাটাচি কেস থেকে চন্দ্রঘড়ি বার করে সময়টা মিলিয়ে নিয়ে মণিবন্ধে পরলেন। ঘড়িটার আকার চিত্র—৩-এর অনুকরণে। তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে চোখ বুজলেন।

ডঃ শ্রীনিবাসন একবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক—তিনি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোতে পারেন। আমাদের কিন্তু একটু বিচার-বিশ্লেষণ করে ব্যাপারটা বুঝে নিতে হবে, না হলে গল্পের পরবর্তী অংশটা বুঝতে অসুবিধা হবে।



চিত্র—৩

প্রথম কথা: মহাকাশ-স্টেশন পান্থপাদপ থেকে চাঁদে পাড়ি দেবার জন্য তিনটি চন্দ্রযান ঐ পোতাশ্রয়ে রাখা আছে। তাদের নাম 'অশ্বিনী', 'ভরণী' এবং 'কৃত্তিকা'। এ থেকে অনুমান করা যায়, আরও দু-ডজন চন্দ্রযান নির্মিত হলেও তাদের নামকরণ করা কোনও সমস্যা নয়।

দ্বিতীয়ত: ঐ 'zero-gee' ব্যাপারটা কী? চাঁদের তুলনায় পৃথিবীর 'ভর' বা 'ম্যাস্' প্রায় আশিগুণ বেশী। ফলে পৃথিবীর আভকর্ষ বা টান চাঁদের তুলনায় প্রায় ছয়গুণ বেশী। ডঃ শ্রীনিবাসনের ওজন চুরাশী কে. জি.। চাঁদে পৌঁছে তাঁর ওজন হবে প্রায় চৌদ্দ কে. জি.। কিন্তু তার মানে এ নয় যে, তাঁর ওজন চুরাশী কে. জি. থেকে ধীরে ধীরে কমতে কমতে চৌদ্দ কে. জি -তে গিয়ে থামবে। আসলে ওজন কমতে কমতে শূন্য হবে এবং তারপর বাড়তে বাড়তে চৌদ্দ কে. জি. হবে। অর্থাৎ 'হ-য-ব-র-ল'-র সেই বুড়োর ভাষায় মহাকাশচারী শ্রীনিবাসনও বলতে পারতেন "আমার ওজন তো কত উঠল নামল, আবার উঠল, এখন আমার ওজন চৌদ্দ!"

চিত্র—৪-এ ওজন বাড়া-কমার ছন্দটা হয়তো কিছুটা বোঝা যাবে।

তৃতীয় কথা : 'স্ট্যাণ্ডার্ড' মুন-টাইমটা আবার কী? সংজ্ঞাটা সহজেই বোঝা যাচ্ছে—গ্রীনউইচ টাইম, ইণ্ডিয়ান স্ট্যাণ্ডার্ড টাইমের মত ওটা 'মুন টাইম'; কিন্তু ঘড়িটা অমন অদ্ভুত কেন? কি করে তার সময় বোঝা যায়? সে কথা বোঝাতে চাঁদের ঐ দরবেশী-নাচের ছন্দটাকে বুঝে নিতে হবে। পৃথিবীর চারিদিকে এক পাক ঘুরে আসতে চাঁদের সময় লাগে ২৭·৩২ পার্থিব দিন। আর নিজের অক্ষদণ্ডের চতুর্দিকে একপাক মারতে—অর্থাৎ এক পূর্ণিমা থেকে পরবর্তী পূর্ণিমায় ফিরে আসতে সময় লাগে ২৯·৫৩ পার্থিব-দিন। ফলে চন্দ্রের কোন একটি নির্দিষ্ট স্থানে সকাল থেকে সন্ধ্যার ব্যাপ্তি ১৪·৭৫ পার্থিব-দিন। ভাষান্তরে চন্দ্রের কোন এক স্থানে সূর্যোদয় থেকে সূর্যোদয়ের মধ্যে সময়কাল—অর্থাৎ চান্দ্রদিনের ব্যাপ্তি ২৯·৫৩ দিন=৭০৮ ঘণ্টা। চাঁদের ভারতীয় উপনিবেশের হেড-কোয়ার্টার্স, বা চান্দ্র-রাজধানী হচ্ছে কোপারনিকাস বলয় (crater); সেখানকার সময়ই হচ্ছে, ভারতীয় জ্যোতির্বিদদের মতে 'মুন-টাইম'—চান্দ্রসময়। কোপারনিকাসে যখন মধ্যরাত্রি তখন থেকে সময়ের মাপ শুরু হয়, তখন সেখানে 'শূন্য' ঘণ্টা। ফলে সূর্যোদয়ের সময় ১৭৭ ঘণ্টায়, মধ্যাহ্ন ৩৫৪ ঘণ্টায়, এবং সূর্যাস্ত ৫৩১ ঘণ্টায়। সূর্য পরের বার মধ্যরাত্রে ফিরে এলে সময় হবে ৭০৮ ঘণ্টা=শূন্য ঘণ্টা। ফলে সময় ঘোষণা শুনে বোঝা গেল কোপারনিকাসে সূর্যোদয় হয়েছে আটাশ ঘণ্টা পূর্বে।

: ডক্টর, অশ্বিনীতে বারোটি ফিলম্ আছে, পর্যায়ক্রমে তা যাত্রীদের দেখানো হয়। আপনি দেখবেন?

চোখ খুলে শ্রীনিবাসন দেখেন আকাশ-সঙ্গিনী এসে দাঁড়িয়েছে অদূরে। ঘড়ি দেখে বললেন, চাঁদে পৌঁছাতে এখনও ঘণ্টা-তিনেক, বেশ, সিনেমাই দেখা যাক।

মেয়েটি একটি তালিকা বাড়িয়ে ধরে বলে, কোনটা দেখবেন বলুন?

তালিকার দিকে দৃক্‌পাতমাত্র না করে শ্রীনিবাসন বললেন, গত পাঁচ বছর আমি সিনেমা দেখিনি। নির্বাচনটা তুমিই কর—

: তাহলে এইটা দেখুন। মার্কিন ছবি; গত বছর অস্কার পেয়েছে—'জর্জি ইন দ্য হুইর্ল পুল অব জি এম'।

শ্রীনিবাসন বলেন, জি. এম-টা কি? গ্রীনউইচ মেরিডিয়ান?

: নো স্যার, জি এম. মানে 'গ্রুপ-ম্যারেজ'।

: গ্রুপ-ম্যারেজ! সেটা কী-জাতীয় জন্তু? স্তন্যপায়ী?

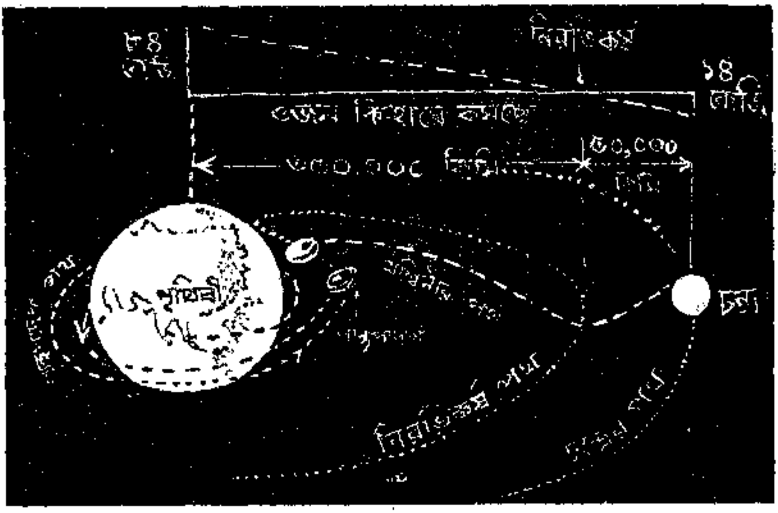
আকাশসঙ্গিনী হাসল। গালে টোল পড়ল তার। মহামান্য যাত্রী রসিকতা করায় তারও সাহস বেড়েছে। বললে, আপনি কি জ্যোতির্বিজ্ঞানের বাইরে আর কোন কিছুর খবর রাখেন না স্যার? আমেরিকায় গ্রুপ-ম্যারেজ তো গত শতাব্দীতেই আইনসিদ্ধ হয়েছে।

: তা তো বুঝলাম, কিন্তু জিনিসটা কী?

: আমি কেন বলব স্যার, ছবিতে দেখুন—

কয়েক মিনিট পরেই সামনের স্ক্রীনে ছবি শুরু হয়ে গেল। শ্রীনিবাসন ধীরে ধীরে ভুলে গেলেন তিনি ব্যোমমার্গের এক নিঃসঙ্গ পথিক। কাহিনীর

আবর্তে পাক খেতে শুরু করলেন। চিত্র-কাহিনীর নায়ক জর্জি একজন প্রাণ-চঞ্চল যুবক, সেলস্-রিপ্রেসেন্টেটিভ। মার্কিন-মুলুকে শুধু নয়, গোটা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে তার ক্রমাগত গতায়াত। কোন একটি শহরে, ধরা যাক টোকিও কিম্বা বুয়োনেস-এয়ার্সে সে হয়তো ফিরে আসে ন'মাস-ছ'মাসের ব্যবধানে। পথই তার ঘর, ভ্রমণই তার জীবন। আহার-নিদ্রা, জীবন-ধারণের যাবতীয় উপকরণ তার পথপ্রান্তের দু-ধারে সাজানো; পয়সা দিয়ে কিনতে হয় না—পার্সোনাল-কার্ড পাঞ্চ করিয়ে সব কিছুই হামেহাল পায়। কিন্তু! পারিবারিক জীবনের সুখ-শান্তি? শিশুদের সঙ্গ? দাম্পত্যজীবন? পথই যার ঘর সেই সঞ্চরণশীল জর্জি তো একা নয়,—এমন লক্ষ-লক্ষ টম-ডিক্-হ্যারী ডায়না-মেরী-লিজাও যে অমন ক্রমাগত স্থান থেকে স্থানান্তরে ভেসে বেড়াচ্ছে, মহাশূন্যে ভাসমান বস্তুকণার মত! সমাজ তার সমাধান বাৎলেছে ঐ গ্রুপ-ম্যারেজ। একটা ক্লাব। সমবায় সংস্থা। তার শাখা প্রশাখা সারা বিশ্বে ছড়ানো। জর্জি



চিত্র—৪

কাজের চাপে যখন যেখানে যায় সান্ধ্য-অবকাশ যাপন করতে হাজিরা দেয় ওদের ক্লাবে। সেখানে অসংখ্য ক্লাব-সভ্যাদের মধ্যে মনোমত সাময়িক স্ত্রী বেছে নেয়। যে দু'দিন থাকে সেই সাময়িক স্ত্রী ওর সেবাযত্ন করে, স্নায়ুতন্ত্রীকে শিথিল করে দেয়, চাহিদা মেটায়—বিনিময়ে কুড়িয়ে নেয় আদর সোহাগ, তার দৈহিক ও মানসিক তৃপ্তি। ওদের দাম্পত্যজীবনে নিত্য মধুচন্দ্রিমা। ওদের সাময়িক অ্যাপার্টমেন্টের যা কিছু—আসবাব-পর্দা-টি. ভি-কিচেন গ্যাজেট—সবই ক্লাবের সম্পত্তি, হোটেলঘরের মত। সন্তানাদি সচরাচর নেই; যারা চায় তারা সাময়িক খোকা-খুকুও পায়। তাদের পিতৃপরিচয় ঐ ক্লাব-মুলুক। বস্তুত 'জনসংখ্যা

নিয়ন্ত্রণ সংস্থা' পরিসংখ্যান খতিয়ে প্রতিটি ক্লাবকে একটা বাৎসরিক-পারমিট দেয় —সন্তানের জন্য। ক্লাবের মহিলাসভ্যাদের মধ্যে যাঁরা জননী হতে ইচ্ছুক তাঁদের মধ্যে লটারী হয়। ভাগ্যবতীর দেহের অভ্যন্তরে 'নিষিক্ত-বীজ' বা 'ফার্টিলাইজড্-এগ' বপন করা হয়। যথাসময়ে সন্তান,—ক্লাবের সন্তান, ভূমিষ্ঠ হয়। ঐজাতীয় নিষিক্ত-বীজ যাঁরা বিক্রয় করেন তাঁদের কাছে খোঁজ নিলে ক্যাটালগ পাবেন। ভবিষ্যৎ সন্তানের চুলের রঙ, চোখের তারার বর্ণ, পুত্র অথবা কন্যা, খেলোয়াড় অথবা লেখক, 'আই- কিউ'-এর আনুমানিক পরিমাপ পর্যন্ত ক্যাটালগে ঘোষিত। দাম তার মান অনুসারে।

জীব-বিজ্ঞানে যে এ-জাতীয় আবিষ্কার অনেকদিন আগেই হয়েছে এ তথ্যটা জানা ছিল ডক্টর শ্রীনিবাসনের, কিন্তু তার বাস্তব প্রয়োগ-পদ্ধতির সম্বন্ধে ঠিক ধারণা ছিল না। কাহিনীর প্রথমাংশে কিছুটা কৌতুকের প্রাবল্য—'হ্যারিত-ল্যারিত-জারিত এবং সমিতা-জমিতা-তমিতার সে-এক হিডিয়াস হেস্কাগেন'। কিন্তু কৌতুকই এ চলচ্চিত্রের মূল উপজীব্য নয়। পরিচালক ক্রমশঃ কাহিনীর লক্ষ্য স্থির করলেন একজোড়া নারী-পুরুষের মধ্যে। জর্জি এবং কেটি। ওরা বিদ্রোহ করে বসল। গত শতাব্দীর একটা বাতিল হয়ে যাওয়া মূল্যবোধকে তারা যেন ফিরিয়ে আনতে চাইছে। সব কিছু পেয়েও ওরা অশান্ত—ওরা চাইছে নিজেদের ঘর, নিজেদের সংসার, নিজেদের সন্তান—তা যদি কানা-খোঁড়া হয়, সো-ভি-আচ্ছা! তারই প্রেরণায় ওরা ক্লাবের নিয়ম ভাঙলো, দেশের আইনকে অগ্রাহ্য করল। সমাজ এ অনাচার সহ্য করবে কেন? ঘাতপ্রতিঘাত যখন চরমে উঠেছে তখন ওরা দুজন ছদ্মনামে চন্দ্রলোকে পালাতে গিয়ে ধরা পড়ল। কারাবাস হল দুজনেরই—স্থায়ী ঘর দুজনেই পেল, তবে পৃথক পৃথক! এ সমস্যার কোন সমাধান পরিচালক দাখিল করেননি। তিনি শুধু একটা প্রশ্নবোধক চিহ্নের আকারে শেষ করেছেন তাঁর কাহিনী :

: অতঃ কিম্? কুয়ো ভাদিস্?

ছবিটা শেষ হল। শ্রীনিবাসন ঐ সূত্র ধরে ভাবতে থাকেন—ওরা দুজন চাঁদে পালিয়ে যেতে চেয়েছিল কেন? চন্দ্রলোকেও তো পৃথিবীর ধ্যানধারণা বিদ্যমান, কিন্তু আর কোথায় যেতে পারত ওরা? ঠিকই বলেছিলেন প্রফেসর ইব্রাহিম—এ ব্রহ্মাণ্ড কী ছোট!

ব্রহ্মাণ্ড সত্যই অত্যন্ত সংকীর্ণ—অমন একটা সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে। বিশ্বের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বিশ ত্রিশ বছর পূর্বে ফতোয়া জারী করেছেন—সৌরমণ্ডলে আর কোথাও কোন জীব নেই। এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে? তা জানি না। তবে থাকা অসম্ভব নয়—বরং বলব থাকাই সম্ভব। কিন্তু আমাদের কাছে—সূর্যমণ্ডলের এই তৃতীয় গ্রহের বাসিন্দাদের কাছে তাদের তা না থাকারই সামিল। সৌর-মণ্ডলের দশটি— আজ্ঞে হ্যাঁ, দশটি; প্লুটোর চেয়ে দূরবর্তী গ্রহ 'এক্স'-কে দূরবীনে ধরা গেছে ১৯৮৭ সালে, তার নাম হয়েছে 'প্রসারপীনা'—গ্রহের মধ্যে পৃথিবী যেমন অন্যতম তেমনি সূর্যও একটা গ্যালাক্টিক সিস্টেমের বা নক্ষত্র-জগতের জনৈক সভ্যমাত্র। জনবিরল অঞ্চলে দিগন্তব্যাপী তেপান্তরের মাঠ পাড়ি

দিয়ে যেমন দেখতে পাই ঘেঁষাঘেঁষি কয়েক ঘর লোকের বসতিওয়ালা একটি গ্রাম, তেমনি এই মহাশূন্যে অমন ব্রহ্মডাঙ্গার মাঠের এ-প্রান্তে ও-প্রান্তে আছে নক্ষত্রজগতের বসতি। আমাদের এই নক্ষত্রজগতে—যার অন্যতম সভ্য হচ্ছে সূর্য—তাতে নক্ষত্রের সংখ্যা প্রায় দশ হাজার কোটি। সংখ্যাটার বিশালত্বের ধারণা করাই কঠিন। একটা কথা বললে হয়তো কিছুটা মালুম হবে—যদি বুদ্ধদেব তাঁর কোন প্রত্যক্ষ শিষ্যকে বলতেন : 'বাপু হে! শুধুমাত্র আমাদের এই গ্যালাকটিক সিস্টেমের নক্ষত্রগুলি গুনে শেষ করলেই তোমার নির্বাণ-লাভ হবে' এবং সেই শিষ্য যদি প্রতি সেকেণ্ডে একটি করে তারা গুনতেন তাহলে এতদিনে, বিংশ শতাব্দীর শেষাশেষি তাঁর নির্বাণ-লাভ হত। এই দশ-হাজার কোটি নক্ষত্রের মধ্যে সবচেয়ে কাছে আছে প্রক্সিমা-সেণ্টরী। 'কাছে' মানে কত কাছে? দূরত্বটা প্রায় চার আলোকবর্ষ। মহাকাশে দূরত্ব মাপবার মাপকাঠি হচ্ছে 'আলোকবর্ষ।' আলো প্রতি সেকেণ্ডে ৩,০০,০০০ কিলোমিটার যায়; ঐ হিসাবে এক বছরে সে যতটা যায় তাই হচ্ছে এক আলোকবর্ষ। সেটাও ধারণার অতীত; তাই প্রসঙ্গত বলি সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে সময় লাগে আট মিনিট; আর বিংশ শতাব্দীর ধারণায় দূরতম গ্রহ প্লুটোয় পৌঁছাতে সময় লাগে প্রায় ঘণ্টা ছয়েক। এবার বোধ হয় ঐ নিকটতম প্রতিবেশী প্রক্সিমা সেণ্টরির দূরত্বটা কিছুটা আন্দাজ করা যাচ্ছে। তবু তিনি তো নিকটতম প্রতিবেশী, তাহলে আমাদের গ্যালাকটিক সিস্টেমে দূরতম নক্ষত্রটি কত দূরে?

বিজ্ঞান বলছে, আমাদের এই গ্যালাকটিক সিস্টেম বা নক্ষত্রজগতের খানদানী বদনখানি যেন এক জোড়া মুখে-মুখে লাগানো উবুড়করা ডিনার প্লেটে আবদ্ধ 'ঘটাকাশ'! চিত্র—৫ থেকে হয়তো তার আকৃতি-প্রকৃতির একটা ধারণা কিছুটা করা যাবে। সূর্য তাঁর ছানাপোনা নাতি-নাতনী নিয়ে তার কোন অঞ্চলে বর্তমানে আছেন তারও একটা ধারণা হচ্ছে। নক্ষত্রজগতের কেন্দ্রস্থল থেকে প্রায় ৩০,০০০ আলোকবর্ষ দূরত্বে।



চিত্র—৫

পৃথিবী থেকে ঐ নক্ষত্রজগতের কেন্দ্রস্থলের দিকে তাকালে একটা নক্ষত্রের ঘন-বসতি অঞ্চলে তাহলে আমাদের নজরে পড়া উচিত। বস্তুত তাই দেখি আমরা, সেটাকে বলি ছায়া-পথ। নক্ষত্রজগতের কেন্দ্রটা ধনুরাশির দিকে।

এই এক লক্ষ আলোকবর্ষ ব্যাসের নক্ষত্রজগতকে যদি একটা একক হিসাবে ধরি, তবে বলতে হবে এমন কোটি কোটি গ্যালাক্‌টিক সিস্টেম ছড়ানো আছে মহা-ব্যোমে। সেক্ষেত্রে আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী নক্ষত্রজগত আছে অ্যান্ড্রোমেডা মণ্ডলে। সেই নিকটতম প্রতিবেশী-নীহারিকার দূরত্ব প্রায় বিশ লক্ষ আলোক-বর্ষ। ইতিপূর্বে আমাদের গ্যালাক্‌টিক সিস্টেমকে আমাদের গ্রামের সঙ্গে তুলনা করেছি—সে হিসাবে সূর্য সে-গ্রামের একটি বাড়ি—এ্যান্ড্রোমেডার নীহারিকা সেই তুলনার সূত্র ধরে আমাদের নিকটতম গ্রাম। প্রসঙ্গান্তরে যাবার আগে বলি, এমন চৌদ্দটি (মতান্তরে ১৭টি) গ্রাম গ্যালাক্‌টিক সিস্টেম, নীহারিকা বা নক্ষত্রজগত) নিয়ে আমাদের ব্লক। বাকি তেরটি গ্রামের দূরত্বটা আপনারাই আন্দাজ করুন। আর বলি, জ্যোতির্বিজ্ঞানী এমন কোটি কোটি ব্লকের সন্ধান পেয়েছেন মহাকাশের নিঃসীমায়।

সুতরাং সম্ভাবনার কথা বিবেচনা করে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বলছেন, বাইরের কথা ছেড়ে দিলেও গ্যালাক্‌টিক সিস্টেমের ঐ দশ হাজার কোটি নক্ষত্রের মধ্যে নিশ্চয় আছে অগুনতি গ্রহ উপগ্রহ, যা ছোট বলে আমাদের দূরবীনে ধরা পড়ছে না। পৃথিবী-গ্রহ যে-কয়টি বিরল গুণের অধিকারিণী হয়ে 'মা' হয়েছে—বাতাসে অক্সিজেন, জল, উত্তাপ ইত্যাদির পরিমিতি জ্ঞানে—তেমন গুণবতী কন্যা নিশ্চয় আছে অন্য কোনও নক্ষত্রের কোন গ্রহে। সেক্ষেত্রে জীবন বলতে আমরা যা বুঝি, তাই বা সেখানে বিকশিত হবে না কেন? অধিকাংশ বিজ্ঞানীর মতে জীব নিশ্চয় আছে সে সব গ্রহে—কী রূপে তা জানি না, কিন্তু আছে। তবে তাদের দূরত্ব এত বেশী যে, আমরা হয়তো কোনদিনই তা জানতে পারব না।

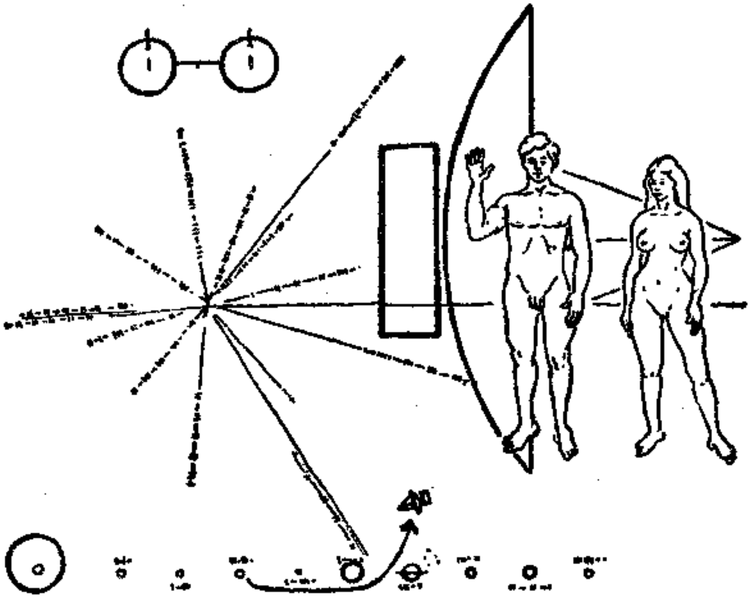
এই প্রসঙ্গে আরও একটি কৌতুককর খবর বলি। পৃথিবী নামক গ্রহের বুদ্ধি-জীবীরা সেই অজানা-গ্রহের অচেনা-জীবের সঙ্গে মিতালী করতে চাইল। স্থির হল, একটি বেতার বার্তা পাঠানো হবে। কিন্তু কোন্ দিকে? কোন্ ঠিকানায়? বিজ্ঞানীরা বললেন, সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ হবে—যেদিকে ভিড় সেদিকেই ওটা পাঠানো। সবচেয়ে ভিড় ঐ গ্যালাক্‌টিক সিস্টেমের কেন্দ্রস্থলে—ছায়াপথের ঐ ধনুরাশি এলাকায়। ধনুরাশির কাছাকাছি 'মেসিয়ার-১৩' নামে একটা নক্ষত্রগুচ্ছ আছে—তিন লক্ষ নক্ষত্রের সমাহার, যেন লাখ-তিনেক মধুমক্ষিকার একটা মৌ-চাক। ওখানে সর্বসমেত অন্তত লাখ বিশ-পঁচিশ গ্রহ থাকা সম্ভব। তার মধ্যে যদি দু-একটিতেও কোন উন্নত জীব বাস করে তবে তারা আমাদের প্রেরিত 'রেডিওগ্রাম'-বার্তা পাবে।

বিংশ শতাব্দীর সাতের দশকে তাই ঐ 'মেসিয়ার-১৩'-এর উদ্দেশ্যে পাঠানো হল 'রেডিওগ্রাম' বার্তা। প্রতি সেকেণ্ডে ৩,০০,০০০ কিলোমিটার বেগে সে প্রায় ২৫,০০০ বছর পরে ঐ অঞ্চলে পৌঁছাবে।

কুশলবার্তায় আমরা অনেক কিছু জানিয়েছি। বলেছি প্রেমপত্রের প্রেরক হচ্ছে সূর্যমণ্ডলের তৃতীয় গ্রহ, যে-গ্রহে ঐ প্রেরক জাতীর জীবের সংখ্যা এখন চারশ কোটি। এঁকে দিয়েছি প্রেরকের এক সাঙ্কেতিক দেহাকৃতি। আরও অনেক কিছু বলেছি। জানানো হয়েছে, 'জেনেটিক কোড' বা প্রজননের মূল

তত্ত্ব, বোঝানো হয়েছে, এ-গ্রহের কয়েকটি প্রধান মৌল পদার্থের স্বরূপ—কার্বন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন এবং ফসফরাস।

প্রেরক পৃথিবী আছে শবরীর প্রতীক্ষায়। আশা করছে, প্রায় ২৫,০০০ বছর পরে 'রেডিওগ্রাম'টি পেঁছাবে প্রাপকের হাতে—যদি অবশ্য তার হাত থাকে, না থাকলে তার বুদ্ধির দোরগোড়ায়! প্রাপক যদি তাড়াতাড়ি জবাব পাঠায় —চিঠিতে বলা হয়েছে, বেতার-তরঙ্গেই আমরা জবাব আশা করছি—তাহলে



চিত্র—৬

আন্দাজ ৫০,০০০ বছর পরে সে পত্রের জবাব এসে আঘাত করবে এ পৃথিবীর শক্তিশালী বেতার-গ্রাহক যন্ত্রে। আমাদের বংশধরেরা ততদিন ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করবে? টিকে থাকবে। জানি না, তবে ভাবতে ভাল লাগে—থাকবে। বলতে ইচ্ছে করে, 'কে তুমি পড়িছ বসি···কৌতূহলভরে,—আজি হতে—' আজ্ঞে না, শতবর্ষ নয়, অর্ধলক্ষ বৎসর পরে!

অজানা প্রেমিকার উদ্দেশ্যে শুধু প্রেমপত্র নয়, সোনার গহনাও উপহার পাঠিয়েছে পৃথিবী। ১৯৭২ সালের ৩রা মার্চ। আমেরিকার মহাজাগতিক সংস্থা NASA মহাকাশের দিকে পাঠিয়েছে 'পাইওনিয়ার-টেন'—প্রায় আড়াইশ' কিলো-গ্রাম ওজনের এক রকেট। তার গায়ে সোনার ফলকে আঁকা আছে কিছু ছবি এবং সাংকেতিক চিহ্ন। ছবিটি চিত্র—৬-এর অনুরূপ।

পৃথিবী আশা করে, গ্রহান্তরের বুদ্ধিমান জীব ঐ সাংকেতিক চিত্রের অর্থ বুঝবে। চিত্রে একটি নিরাবরণ পুরুষ ও নারীর আলেখ্য। তাদের পিছনে

পাইওনিয়ার-টেনকে স্কেলে আঁকা হয়েছে, যাতে বুঝতে অসুবিধা না হয় পার্থিব নারী-পুরুষের আকৃতি কত বড়। স্কেলে ফেলে মেপে দেখলে ওরা বুঝবে পুরুষটি ১৭৫ সে. মি. এবং নারীটি ১৬৮ সে মি দীর্ঘ। এপাশে চৌদ্দটি রেখায় আঁকা ঝিকিমিকি তারাটি কী? আমাদের পরিচিত মহাকাশের সীমান্তে অবস্থিত ওরা চৌদ্দটি পালসার-এর প্রতিনিধিত্ব করছে। এগুলি অতিকায় দানব-তারকার চেয়েও ভারী—নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে বেতারতরঙ্গ বিকীর্ণ করে। মানব-ধমনী বা 'পালস'-এর মত দপ দপ করে বলেই ওদের নাম 'পালসার'। পঞ্চদশ দীর্ঘ রেখাটি ঐ পালসারদের পরিপ্রেক্ষিতে সূর্যমণ্ডলের অবস্থিতি সূচিত করছে। পৃথিবী থেকে রওনা হয়ে বৃহস্পতি-শনির ফাঁক দিয়ে সে কোন্ পথে যাচ্ছে তাও এঁকে দেখানো হয়েছে।

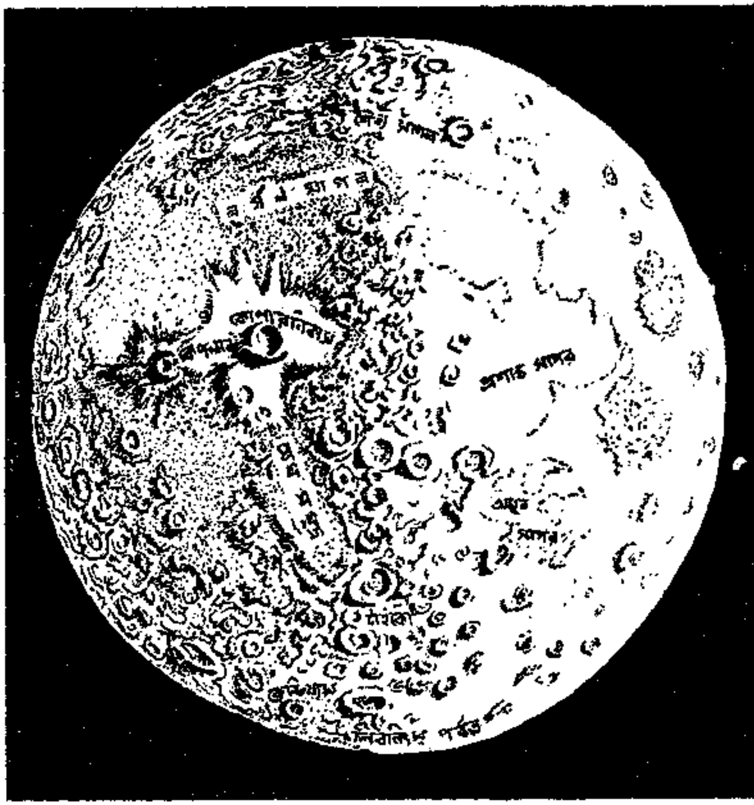
বাঁ-দিকে উপরে চশমার মত দেখতে ঐ চিহ্নটি হচ্ছে একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর দুটি শক্তিরূপের ব্যবধানের প্রতীক (the energy difference between two states of an hydrogen atom)। শক্তিরূপের পরিবর্তনের সময় হাইড্রোজেন পরমাণু যে বেতার-তরঙ্গের স্পন্দন তোলে তার সময়ের ব্যবধান অতি সুনির্দিষ্ট—বস্তুত পার্থিব বিজ্ঞানীদের কাছে সময়ের অপরিবর্তনশীল মাপকাঠি। হাইড্রোজেন পরমাণুর ঐ বেতার-তরঙ্গের ঢেউ-এর মাপ ২১ সেন্টিমিটার। সময় এবং দৈর্ঘ্যের ঐ মাপকাঠি অবলম্বন করেই সম্পূর্ণ-সাঙ্কেতিক চিত্রটি স্কেলে আঁকা। প্রতিটি পালসারের শেষপ্রান্তে যে সাঙ্কেতিক চিহ্ন আছে তাতে ঐ মাপকাঠি দিয়েই বোঝানো হয়েছে পালসারগুলির স্পন্দন-ছন্দ। বোঝানো হয়েছে যে গাণিতিক ভাষায় তার নাম দ্বৈত-সূত্র বা 'b nary system'। মেয়েটির পাশে যে দ্বৈতসূত্রের চিহ্ন আছে তার অর্থ 'আট'—অর্থাৎ মেয়েটির দৈর্ঘ্য ২১×৮=১৬৮ সেঃ মিঃ। এতদিনে (১৯৮৫) সেটা সৌরমণ্ডলের শেষ সীমান্তে, প্লুটোর সূর্যপ্রদক্ষিণ পক্ষে কাছাকাছি পৌঁচেছে। তার বেতার-সঙ্কেত এখনও শোনা যাচ্ছে।

এ সব তথ্য জানা ছিল ডক্টর শ্রীনিবাসনের। তাই তাঁর মনে হল—জর্জ আর কেটির পালাবার কোন পথ ছিল না। এই যে অত্যুন্নত সমাজ-ব্যবস্থা, এখানে আর সেই হারিয়ে-যাওয়া মূল্যবোধকে ফিরিয়ে আনা অসম্ভব। মাতৃ-তান্ত্রিক কিম্বা পিতৃতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার সেই অবলুপ্ত মূল্যবোধকে ফিরিয়ে আনা যাবে না—যার নাম একদিন ছিল 'ঐকান্তিক প্রেম'। এ সমাজে এখন থাকবে শুধু উত্তম পুরুষ আর প্রথম পুরুষ; দ্বিতীয় পুরুষ—অদ্বিতীয়া 'ত্বমসি' এখানে ডোডো-পাখীর সমগোত্রীয়া। জর্জ দলছুটের মত বৃথাই তার সাঙ্গনীর হাত ধরে পালাতে চেয়েছিল। পালাবে কোথায়? ওদের সেই অন্ত্যে-বাসীর গুহাটা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে এই ছোট্ট দুনিয়া থেকে।

সম্বিৎ ফিরে পেলেন একটি ঘোষণায়: অ্যাটেনশন প্লীজ! এবার আমরা চন্দ্রলোকে অবতরণ করছি। যব তক্ এ হাওয়াই জাহাজ বিলকুল খাড়া না-হোয় আপকো কোমরবন্দ্ না খুলে—

কোপারনিকাস জ্যোতির্বিজ্ঞান-মন্দিরের কনফারেন্স-রুমে সতর্ক প্রহরায় একটি গোপন মন্ত্রণা-সভা আহূত হয়েছে। চন্দ্রযান অশ্বিনীর অবতরণের সময় জানা ছিল। সেই অনুসারে চন্দ্রলোকের যাবতীয় নেতৃস্থানীয় বিজ্ঞানীকে আমন্ত্রণ করা হয়েছে। চন্দ্রলোকের গভর্ণর মাননীয় কে. এল. গান্ধী যখন ডক্টর শ্রীনিবাসনকে নিয়ে সভাকক্ষে প্রবেশ করলেন তখন সকলেই আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ায়। ঘরে জনা-পঁচিশ বিজ্ঞানী—সর্বোচ্চ পর্যায়ের। আজ এক সপ্তাহকাল পৃথিবীর জনা বিশেক বিশিষ্ট ব্যক্তি ছাড়া—বলা বাহুল্য তাঁরা সকলেই ভারতীয়—এই পঁচিশজনও 'কে. চো অ' সমস্যার কথা জানেন।

গভর্ণর আগন্তুককে নিয়ে ডায়াসে উঠে বসতেই সকলে নিজ নিজ আসনে বসলেন।



চিত্র—৭

গভর্ণরই সভাপতি। তিনি মাইকে ঘোষণা করলেন, বন্ধুগণ, আমরা কেন এখানে সমবেত হয়েছি তা আপনারা জানেন। বিষয়টি অত্যন্ত জরুরী, অত্যন্ত গোপন, তাই আমি কোন রকম সামাজিকতার মধ্যে না গিয়ে সরাসরি কাজে

নামতে চাইছি। আমরা ১৭০ ঘণ্টা আগে 'কেপ্‌লার-বেস'-এ যে অদ্ভুত বস্তুটি আবিষ্কার করেছি তার সম্বন্ধে প্রাথমিক সংবাদ আমি ইতিমধ্যেই ডক্টর শ্রীনিবাসনকে জানিয়েছি। আমি বিজ্ঞানী নই, তাই আমি কোপারনিকাস বিজ্ঞানমন্দিরের অধ্যক্ষ ডক্টর পট্টনায়ককে সমস্ত তথ্য পুনরায় বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে পরিবেশন করতে বলব। তার আগে ডক্টর শ্রীনিবাসন আপনাদের কিছু বলতে চান। ডক্টর শ্রীনিবাসন !

শ্রীনিবাসন বললেন, বন্ধুগণ, আমার দুটি মাত্র কথা বলার আছে। যাত্রার পূর্বে আমি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলাম। তাঁর ইচ্ছাক্রমে আমি জানাচ্ছি যে, প্রধানমন্ত্রী আপনাদের নিরলস সাধনায় আনন্দিত। আমাকে তিনি তাঁর তরফে আপনাদের অভিনন্দন জানাতে বলেছেন। আপনাদের বেতার-বার্তা পেয়ে যাত্রার পূর্বে আমি বিশ্ববিশ্রুত নোবেল-লরিয়েট বৈজ্ঞানিক প্রফেসর আহ্‌মেদের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেছিলাম। তিনি আপনাদের প্রাথমিক রিপোর্ট পেয়ে বলেছেন, এ একটি যুগান্তকারী আবিষ্কার—সম্ভবত এ থেকে প্রমাণ হবে—এই বিশ্বে মানুষ ছাড়াও উন্নত-বুদ্ধির জীব আছে। প্রফেসর ইকবাল আহ্‌মেদের বয়স সাতানব্বই, অশক্ত না হলে হয়তো আমার পরিবর্তে তিনি স্বয়ং তদন্ত করতে আসতেন। সে যাই হোক, এবার আপনারা বলুন—আপনারা কী জেনেছেন ?

এবার উঠে দাঁড়ালেন ডক্টর পট্টনায়ক, কোপারনিকাস বিজ্ঞান-মন্দিরের অধ্যক্ষ, প্রখ্যাত নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্ট। তিনি উঠে দাঁড়াতেই ঘরের আলো নিভে গেল। সম্মুখস্থ পর্দায় ভেসে উঠল চন্দ্রলোকের একটি মানচিত্র (চিত্র—৭)।

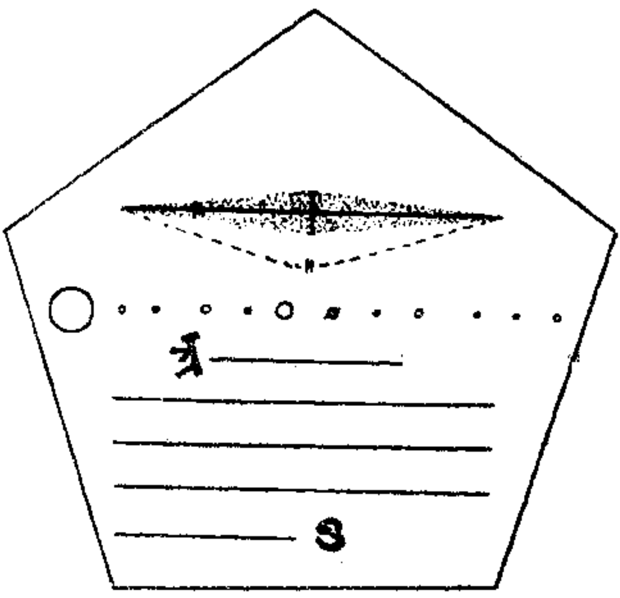
উনি বলতে থাকেন, কোপারনিকাস থেকে কেপ্‌লারের দূরত্ব মাত্র ২৫০ কিলোমিটার। ম্যাপে দেখুন, ওটি প্রায় পাকিস্তান-সীমান্তে। আমরা আজ এক বছর ধরে ঐ অঞ্চলে একটা চৌম্বক-জরীপের কাজ করছিলাম। গত মাসে সে কাজ শেষ হয়েছে। তার ফলাফলটা এবার দেখুন।

স্ক্রীনে এবার ফুটে উঠল ঐ অঞ্চলের চৌম্বক-ক্ষেত্রের একটি ম্যাপ। দেখতে অনেকটা পার্থিব 'কন্টুর' ম্যাপের মত। চৌম্বক রেখাগুলি প্রায় সমদূরত্বে এবং সমান্তরালভাবে পূর্ব থেকে পশ্চিমে বিস্তৃত। শুধু ঐ কেপলারবেস-এর কাছাকাছি এসে রেখাগুলি এক বিচিত্র নক্‌শায় পরিণত। চেরা কাঠের গায়ে যেমন গাঁটের কাছে ঘূর্ণি দেখা যায়, সেই মত রেখাগুলি বেস-কে কেন্দ্র করে কয়েকটি সমকেন্দ্রিক বৃত্ত রচনা করেছে। ঐ ম্যাপের এক প্রান্তে লেখা আছে : 'কেপ্‌লার চৌম্বক অসঙ্গতি' (কে-চৌ-অ)।

ডঃ পট্টনায়ক বলতে থাকেন, আমাদের প্রথমে ধারণা হয়, চন্দ্র-ভূগর্ভে ঐখানে নিশ্চয় কোন প্রাকৃতিক চুম্বক আছে। কিন্তু ইতিপূর্বে-সমাপ্ত মুনোলজিক্যাল সার্ভেতে দেখা গেছে, ঐখানে চুম্বকধর্মী কোন ধাতুর স্তর নেই। কোন নিকেল বা লোহময় উল্কাখণ্ড এত বড় চৌম্বক-ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে পারে না। ফলে, আমরা চুম্বক-ক্ষেত্রের ঠিক কেন্দ্রস্থলে ড্রিল করতে শুরু করি। প্রথম পাঁচ মিটারে উল্লেখযোগ্য কিছুই পাওয়া গেল না—যদিও বুঝলাম আমরা চুম্বকের ক্রমশঃ নিকটবর্তী হচ্ছি। ঠিক ছয় মিটারে আমাদের 'বোরিং-নিড্‌ল' শক্ত কোন

কিছুতে ঠেকে গেল। অত্যন্ত শক্ত কিছু—তা ভেদ করা গেল না। ফলে আমরা একটি গর্ত খুঁড়তে শুরু করলাম। প্রায় দুই পার্থিব সপ্তাহের পরিশ্রমে আমরা বস্তুটাকে উদ্ধার করলাম। একটি অদ্ভুত নিটোল 'ডুডেকাহেড্রন'। এবার তার আলোকচিত্র দেখুন। (পাঠক চিত্র—১ দেখতে পারেন)।

বস্তুটা ধাতব না প্লাস্টিক, কৃত্রিম না অকৃত্রিম তা আমরা এখনও বুঝতে পারিনি। মসীকৃষ্ণ অস্বচ্ছ কোন কঠিন পদার্থ। হীরকখণ্ডের অপেক্ষা কাঠিন্য বেশি ; কারণ কার্বোরেন্ডাম-ড্রিল দিয়ে ওটা ফুটো করা যায়নি। কনসেন্ট্রেটেড নাইট্রিক অ্যাসিডে ওর কোন প্রতিক্রিয়া নেই। এক্স-রে, নিউট্রন রশ্মি ওকে ভেদ করতে পারেনি। হয়তো 'লেসার-বীম' দিয়ে ওটাকে দু-টুকরো করা যায় ; কিন্তু আমরা সে-অস্ত্র ব্যবহার করিনি। কারণ তাহলে ওটাকে ধ্বংস করতে হয়। যার অর্থই বুঝলাম না, সেটাকে সর্বাগ্রে ধ্বংস করি কি করে ?



চিত্র—৮

বস্তুটাতে দ্বাদশটি তল—সবই সমান মাপের, প্রতিটি তল পঞ্চভুজ। আর আশ্চর্যের কথা ঐ সম-পঞ্চবাহুর প্রতিটি বাহুর দৈর্ঘ্য এক মিটার ! ওর একাদশটি তল সম্পূর্ণ এক রকম—চিক্কণ, মসৃণ, কৃষ্ণবর্ণের। শুধু একদিকের একটি তলে কতকগুলি সাঙ্কেতিক চিহ্ন আছে। তার ছবি এবার দেখুন (চিত্র—৮)। এই রহস্যের পাঠোদ্ধার আমরা করতে পারিনি। অস্বীকার করে লাভ নেই—বস্তুটার বিষয়ে আমাদের বৈজ্ঞানিক মহল দ্বিধা-বিভক্ত। আমাদের সিনিয়ার জিওলজিস্ট ডক্টর সিং-এর মতে বস্তুটা Pleistocene যুগের ; বয়স অন্ততঃ পাঁচ

লক্ষ বৎসর ; এটা গ্রহান্তরের কোন জীব ওখানে পুঁতে রেখে গেছে। ডঃ সিং এ সভায় উপস্থিত ; তিনি তাঁর মতামত এখনই জানাবেন। আমি আমার এবং আমার দলের কয়েকজন বৈজ্ঞানিকের মতামত প্রথমেই রাখছি—

আমাদের বিশ্বাস—কার্বন-টেস্ট করালেই বোঝা যাবে, বস্তুটার বয়স পাঁচ লক্ষ বছর নয়, পাঁচ সপ্তাহের কাছাকাছি। 'কেপ্‌লার-বেস' সীমান্তের খুব কাছে। আমাদের অসতর্কতার সুযোগ নিয়ে কে বা কারা ওটা পুঁতে রেখে গেছে—উদ্দেশ্য বিশ্ববিজ্ঞানের কাছে আমাদের উপহাসাস্পদ করা। যারা ওটা পুঁতেছে তারা ঘটনাচক্রে এমন একটা মিশ্র ধাতু আবিষ্কার করেছে যা হীরক-খণ্ডের চেয়েও কঠিন, তাই এই কঠিন রসিকতা। তারা জানতো, আমরা ঐ অঞ্চলে চৌম্বক-জরীপ অনতিবিলম্বেই করব—তাই ঐ চৌম্বক-শক্তি রাখা হয়েছে ওর গর্ভে। বস্তুটা ফাঁপা, ওর ভিতরে রাখা আছে ব্যাটারি-চালিত এক ইলেকট্রোম্যাগ্‌নেট ; ঐ সাংকেতিক চিহ্নগুলো স্রেফ হিজিবিজি।

আমাদের যুক্তির সূত্র, প্রথমত কেপ্‌লার-বেস এর অবস্থান, আগেই বলেছি সেটা ওদের সীমান্তের কাছাকাছি। দ্বিতীয়ত, ওদের নিরন্তর কৌতূহল। তৃতীয় এবং প্রধান সূত্র হচ্ছে ঐ ভুড়েকাহেড্রনের মাপ। প্রতিটি বাহু নিখুঁত এক মিটার—৩৯·৩৭০৬৮ ইঞ্চি। গ্রহান্তরের বুদ্ধিমান জীবের পক্ষে কোন সূত্রেই আন্দাজ করা সম্ভবপর নয় যে, বুদ্ধিমান মানুষ দৈর্ঘ্যের যে মাপটাকে য়ুনিট হিসাবে ব্যবহার করবে তা ৩৯·৩৭০৬৮ ইঞ্চি লম্বা হবে। আমার ধারণা, এখানেই 'ওরা' প্রকাণ্ড একটা ভুল করেছে। প্রতিটি বাহু যদি নিখুঁত এক মিটার লম্বা না হত তাহলে আমি হয়তো ডঃ সিং-এর মতটা বিচার্য বলে মনে করতাম।

বক্তা আসন গ্রহণ করলে সভাপতির অনুরোধে ডক্টর সিং উঠে দাঁড়ালেন। তিনি বললেন, আমি ডঃ পট্টনায়কের সঙ্গে একমত নই। যদিও আমি কার্বন টেস্ট করতে পারিনি তবু আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি—ঐ বস্তুটা যখন নির্মিত হয়েছিল তখনও মানুষ নামক স্তন্যপায়ী জীব পৃথিবীতে বিবর্তিত হয়নি। আমি ওটাকে চার থেকে ছয় লক্ষ বৎসরের পুরাতন বলে মনে করি। দ্বিতীয়ত 'ওরা' অমন একটি মিশ্র ধাতু আবিষ্কার করেছে বলেও আমি মনে করি না। যারা ঐ বস্তুর মূল উপাদান তৈরী করেছে তারা এই একবিংশতি শতাব্দীর মানুষের চেয়ে বেশী বুদ্ধিমান। তৃতীয় কথা—ঐ এক মিটার দৈর্ঘ্যের প্রসঙ্গে সহযোগী ডঃ পট্টনায়ক বলেছেন—দৈর্ঘ্যের মাপ যে ৩৯·৩৭০৬৮ ইঞ্চি হবে তা গ্রহান্তরের মানুষ কী ভাবে জানবে ? এর জবাব অত্যন্ত সহজ। ঠিক যেভাবে আমরা, মানুষেরা ঐ এক মিটার দৈর্ঘ্যটা পেয়েছি, সেইভাবেই। আমার বিশ্বাস গ্রহান্তরের জীব পৃথিবী নামক গ্রহে উপস্থিত হয়েছিল পাঁচ লক্ষ বছর আগে। পার্থিব কোন জীবকে দেখতে পেয়েছিল। আশা করেছিল, জীব-বিবর্তনের পথে একদিন সেই জীব—হোমো-ইরেক্‌টাস্‌ অথবা '১৪৭০-মানব'—গ্রহান্তরের জীবের সন্ধানে বার হবে। তার সব চেয়ে কাছের উপগ্রহ চাঁদ ; প্রথমেই সেখানে যাবে। অন্তত চাঁদে উপস্থিত না হলে সেই পার্থিব জীবকে গ্রহান্তরের জীবের সন্ধান দেওয়া নিরর্থক। তাই সে ঐ কেপ্‌লার-ক্রেটারে একটি চুম্বক-খণ্ডের বস্তু প্রোথিত

করে দিয়ে গেছে ; জানাতে—আমরাও আছি ! প্রশ্ন হচ্ছে, সেক্ষেত্রে তারা কী মাপের জিনিস বানাবে ? কেমন করে বুঝিয়ে দেবে যে, ওটা প্রাকৃতিক কোন কিছু নয় ? ওরা দৈর্ঘ্যের একক হিসাবে বেছে নিল ঠিক যেভাবে মানুষ বেছে নিয়েছে দৈর্ঘ্যের একক পৃথিবীর মাপ থেকে । এক মিটার কী ? উত্তর-মেরু থেকে কোন দ্রাঘিমা রেখা বরাবর দক্ষিণমেরুর দূরত্বের এক কোটি ভাগের এক ভাগ। আজ থেকে তিনশ' বছর আগে বস্তুত ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে যেভাবে বৈজ্ঞানিক ডেলামবিয়ার আর মিচেন এক মিটার দৈর্ঘ্য স্থির করেছিলেন এই গ্রহান্তরের বুদ্ধিমান জীবেরাও সেই পৃথিবীর মাপ থেকেই পেলেন দৈর্ঘ্যের মাপটি । আমার ধারণা, বস্তুটা গ্রহান্তরের জীবেরই অবদান । সাংকেতিক চিহ্নের অর্থ কী, তা আমি বুঝিনি—তবে ওগুলো মোটেই হিজিবিজি নয় ।

ডঃ শ্রীনিবাসন প্রাথমিক সংবাদ সংগ্রহ করে তখনই বস্তুটা দেখবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করলেন । ব্যবস্থা করাই ছিল । সূর্যোদয় হয়েছে প'য়ত্রিশ ঘণ্টা আগে—দিব্যি সকাল । ও'রা তিনজনে একটি গাড়ি নিয়ে অনতিবিলম্বেই বার হয়ে পড়লেন কেপলার-বেস্-এর উদ্দেশ্যে ।

কোপারনিকাস একটি গোলাকৃতি বলয় (crater), পার্থিব আগ্নেয়গিরির মুখ-গহ্বরের মত দেখতে । প্রকাণ্ড বড়—বলয়ের ব্যাস আশি কিলোমিটার । চন্দ্রতলের গভীরে, মাটির নীচে তৈরী করা হয়েছে গোটা উপনিবেশটা । মহ-জাগতিক রশ্মি এবং অতর্কিত উল্কা-বর্ষণের হাত থেকে বাঁচতে । সমস্ত শহরটাই বাতানুকূল করা । উত্তাপ ও অক্সিজেন-এর ব্যবস্থার জন্য । সেই ভূগর্ভের কেন্দ্র থেকে তিন-তিনটি এয়ার-লক পার হয়ে গাড়ি বেরিয়ে এল মুক্তাকাশের তলায় । গাড়ির চতুর্দিক বন্ধ । ভিতরে উত্তাপ ও বাতাসের ব্যবস্থা আছে ! বহুবার দেখেছেন, তবু চান্দ্র-প্রাকৃতিক দৃশ্যে আবার মুগ্ধ হয়ে গেলেন শ্রীনিবাসন ।

চাঁদের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অন্য জাতের । সেখানে সুন্দর যেন ভীষণার সঙ্গে হাত মিলিয়েছে—কেমন যেন গা-ছমছম-সৌন্দর্য । চাঁদে আবহাওয়া নেই —তাই ছায়া সেখানে ক্ষুরধার । আলো-ছায়ার খেলাটা অদ্ভুত । চাঁদে কখনও বৃষ্টিপাত হয়নি—তাই পৃথিবীতে উদ্ভিদের অস্তিত্বের কথা ছেড়ে দিলেও— পাহাড়-পর্বতও যেন মোলায়েম ; চাঁদে তা নয় । কোটিকল্পের ধারাপতন সেখানে কোন কিছুকেই মোলায়েম করে তোলেনি । ধারাপতন না হলেও উল্কাপতন হয়েছে—তাই ক্রমাগত গর্ত—যাকে বলি বলয়, ক্রেটার । বাতাস নেই, ফলে শব্দও নেই । আলো আছে—অত্যন্ত তীব্র ; অপরপক্ষে অন্ধকার নেই । 'কে বলে অন্ধকারের রূপ নাই'—বলবার মত নিকষকালো নীরন্ধ্র অন্ধকার চাঁদে নেই । কারণ সূর্য না থাকলেও আকাশে পৃথিবী আছে । পৃথিব্যালোকে চাঁদের রাত্রি আলোকিত । ঊষার আলো বা গোধূলি নেই, রামধনু নেই, অরোরা বোরিয়েলিস্ নেই, নদী নেই, সমুদ্র নেই, ফুল নেই, পাখীর কুজন নেই । রোদ উঠলে প্রচণ্ড গরম । কোপারনিকাস বা কেপলারে মধ্যদিনের উত্তাপ ১০০° সেণ্টিগ্রেড, পৃথিবীতে এ উত্তাপে জল টগ্‌বগিয়ে ফুটত । আবার মধ্যরাত্রে নেমে যায় মাইনাস ১৮০° সেণ্টিগ্রেডে, পৃথিবীতে যাকে বলি তরলিত-বাতাসের উত্তাপ ।

চাঁদের যে অংশটা আমরা পৃথিবী থেকে দেখতে পাই তা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র অথবা মহাচীনের চেয়ে বড় নয়।

তবে হ্যাঁ, পাহাড় আছে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাহাড়। কখনও তা মোচার মত সূচাগ্র—ফ্রিজেডিয়রে বরফ জমলে যেমন নিম্নমুখী 'আইসিকল্‌স্' ঝুলতে থাকে তেমনি ঊর্ধ্বমুখী মোচাকৃতি পর্বত। সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ আছে দক্ষিণ মেরুর কাছাকাছি 'লাইবনিৎস' পর্বতমালায়। উচ্চতা আমাদের এভারেস্টকেও লজ্জা দেবে—প্রায় ১০,৭০০ মিটার। চাঁদের আয়তন অনুসারে ঐ উচ্চতা আরও বেশী বলে মনে হয়। চাঁদের ব্যাসার্ধের অনুপাতে ঐ পাহাড়ের উচ্চতা হিসাব করে বলতে পারি—পৃথিবীতে ঐ অনুপাতে উঁচু পাহাড় থাকলে তা হত খাড়া ৩২ কিলোমিটার উঁচু!

গাড়ি চলেছে ঘণ্টায় আশি কিলোমিটার বেগে। সোজা পশ্চিমে। ঘণ্টা-তিনেক লাগবে কেপলারে পৌঁছাতে। গাড়ি যে-পথে চলেছে তাকে রাস্তা বলতে পারি না—খানাখন্দে ভর্তি। তবু ঝাঁকানি লাগছে না কারও। কারণ গাড়ি চন্দ্রপৃষ্ঠকে স্পর্শ করছে না আদৌ। আকাশযান নয়, তবে চাকাও নেই। গাড়িটা প্রস্তুত বিংশ শতাব্দীর শেষ-পাদের এক বিস্ময়—জেট প্রপেল্‌ড হোভারক্রাফ্‌ট।

পথ চলতে চলতেই পূর্ব-দিগন্তে সূর্য অস্ত গেল। শেষরাত্রি শুরু হল। উপরে অগুন্তি তারা। পৃথিবীর কোন প্রান্ত থেকে এত তারা দেখা যায় না। চন্দ্রালোকের নির্মেঘ আবহাওয়াহীন আকাশে তারার ভিড় যেন বেশী। চাঁদের আকাশ নীল নয়, নিকষ-কালো। সূর্য নেই, কিন্তু আকাশে পৃথিবী আছে—অপূর্ব সুন্দর! নীলচে সবুজ পৃথিব্যালোকে চন্দ্রভূভাগ প্রোজ্জ্বল—কালি-পুজোর রাত্রে ঘরে ঘরে লাল-নীল সবুজ বাতির-মোমবাতি জ্বাললে যেমন দেখতে হয় আর কি। আরও একটি জাগতিক সৌন্দর্য চোখ এড়াবার নয়—পূর্ব-দিগন্তের অত্যুচ্চ পাহাড়ের চূড়ায় পড়েছে রৌদ্রের প্রথম স্পর্শ। পূর্ব আকাশেও আগুনের যেন এক লেলিহান শিখা। সে অগ্নিশিখা পৃথিবী থেকে দেখা যায় না। পূর্ণ সূর্যগ্রাসে তার কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। তার নাম সূর্যের 'করোণা' বা অগ্নিবলয়। শ্রীনিবাসন একদৃষ্টে সেই দিকে চেয়ে দেখছিলেন। হঠাৎ ওঁর নজরে পড়ল পথের ধারে একটি তাঁবু। তার পাশে একটি সাইনবোর্ডে তিন-চারটি পার্থিব ভাষায় লেখা : এমার্জেন্সি ডিপো নং ৩ [১০ কে. জি. জল ; ২০ প্যাকেট খাবার ; ৩টি অক্সিজেন সিলিণ্ডার ; ১টি টুলবক্স, টাইপ-বি। ১টি স্পেস্-স্যুট রিপেয়ার কিট—কোন কিছু ব্যবহার করলে কেন্দ্রে সংবাদ দেবেন]।

ডক্টর শ্রীনিবাসন সম্বিৎ ফিরে পেলেন ডক্টর ইন্দ্রজিৎ সিং-এর প্রশ্নে, ঐ জুডেকাহেড্রনটা অমন একটা 'এমারজেন্সি ডিপো' নয় তো? এমন তো হতে পারে যে, ওর গর্ভে রাখা আছে কিছু রসদ। ফেরার পথে ব্যবহারের জন্য। হয়তো পাঁচ লক্ষ বছর ধরে ওটা সেই পথিকের প্রতীক্ষায় আছে—যে পথিক আর কোনদিন ফিরে আসেনি?

পট্টনায়ক বললেন, ওটা যদি 'ওদের' মারাত্মক রসিকতা না হয় তাহলে সেটাও হতে পারে। সেইজন্যেই হয়তো ঐ চৌম্বক-ক্ষেত্রের আয়োজন—যাতে ফেরার

পথে ওটা খুঁজে পাওয়া যায়।

ইন্দ্রজিৎ বললেন, কিন্তু সে-হিসাবে জুডেকাহেজ্রনের মাপটা খুব ছোট। ও'রা আকারে কত বড় ছিলেন তা তো জানি না আমরা। অবশ্য যদি ও'দের উচ্চতা হত মাত্র ছয় ইঞ্চি তাহলে ওটা ও'দের আকৃতির তুলনায় পিরামিড!

এতক্ষণে শ্রীনিবাসন বলেন, তা হওয়া অসম্ভব। যে-বুদ্ধির পরিচয় তাঁরা দিয়েছেন—যদি আদৌ তাঁরাই দিয়ে থাকেন, তবে তাঁদের মস্তিষ্কের একটা ন্যূনতম মাপ থাকা চাই তো?

আবার নীরবতা ঘনিয়ে আসে। যে চিন্তা ও'র আহার-নিদ্রা কেড়ে নিতে বসেছে সেই চিন্তাতেই ডুবে গেলেন আবার। পাঁচ লক্ষ বছর! এ কী সম্ভব? পাঁচ লক্ষ বছর আগে চাঁদে তারা এল কোথা থেকে? চাঁদেরই জীব? অসম্ভব! এই বায়ুহীন বন্ধ্যা ভূমিতে কোন জীব কখনও জন্মলাভ করলেও যে-যুগে ক্রমাগত উল্কাপাতে বসন্ত-গুটিকার মত ক্রেটারগুলি গড়ে ওঠে, সে-যুগে সে জীব ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে বাধ্য।

পৃথিবী? তাও মানতে পারা কঠিন। গ্রহান্তরের কোন বুদ্ধিমান জীব—যারা মহাকাশ পাড়ি দেবার মত বুদ্ধি ধরে—তারা নিশ্চয় পৃথিবীতে তাদের অস্তিত্বের শাশ্বত স্বাক্ষর রেখে যেত। এতদিনে তা আমরা খুঁজে পেতাম। এ কিছু জুরাসিক বা প্লাইওসিন যুগের কথা হচ্ছে না—মাত্র পাঁচ লক্ষ বছর আগেকার কথা। যারা বলে—ঐ পিরামিড তাঁরাই গড়ে দিয়ে গেছেন, গিলগামেস তাঁদেরই দেখা পেয়েছিলেন, তাঁরাই উপনিষদের আদিত্যবর্ণ পুরুষ—তারা ভুলে যায়, সে-ক্ষেত্রে সেই গ্রহান্তরের দেবতারা এভাবে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করতেন না কিছুতেই—তাঁদের স্বাক্ষর শাশ্বত প্রমাণে রেখে যেতেন পৃথিবীর বুকে, অতি অনায়াসে।

সুতরাং চাঁদ নয়, পৃথিবী নয়। সৌরমণ্ডলের অন্য কোন গ্রহ-উপগ্রহে যে জীব নেই এ সত্য ত্রিশ বছর আগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পৃথিবীর চেয়ে যে গ্রহ দুটি সূর্যের আরও কাছাকাছি আছে তারা অত্যন্ত উত্তপ্ত, যারা দূরে আছে তারা মাত্রাতিরিক্ত শীতল।

একমাত্র সমাধান হতে পারে নক্ষত্রলোকে। সেক্ষেত্রে আমরা বেতারযন্ত্রে কি তাঁদের কোন সাড়া পেতাম না? তৎক্ষণাৎ ও'র মনে পড়ল—পৃথিবীর একাধিক বেতারযন্ত্রে আজ দু-তিন বছর ধরে একটা অদ্ভুত স্পন্দন অনুভূত হচ্ছে। বৈজ্ঞানিকরা তার মূল উৎসটা কোথায় তা ধরতে পারেননি। বেতার-সঙ্কেতের বক্তব্য কী, তাও বোঝা যায়নি। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এমনই এক জাতের বেতার-সঙ্কেত পাওয়া গিয়েছিল—নিয়মিত খণ্ড-মুহূর্তের পর পর। প্রথমটা অনেকে ভেবেছিলেন, সে বেতার-তরঙ্গ আসছে কোনও নক্ষত্রলোকের বুদ্ধিজীবী জীবের কাছ থেকে। সত্তরের দশকে প্রমাণিত হয়, সে-স্পন্দন আসছে মহাকাশের পরিচিত শেষ সীমান্তবর্তী 'পালসার' থেকে। সে বেতার-তরঙ্গ জীবজগতের নয়, নিতান্ত প্রাকৃতিক। তাই এবার ঐ জাতের অদ্ভুত বেতার-সঙ্কেতের অর্থ না বোঝা গেলেও কেউই সেটাকে গ্রহান্তরের বাসিন্দার বলে অনুমান করছেন না।

তফাৎ এই—'পালসার' থেকে যে মহাজাগতিক বেতার-স্পন্দন ভেসে এসেছিল তা একই ঢঙের, সমান খণ্ডমুহূর্তের ব্যবধানে একই ছন্দের সংকেত। এবার বেতার-তরঙ্গের ঢেউয়ের ইঙ্গিতছন্দ যেন 'একবর্ণা' নয়, তা যেন 'বহুধা' হয়েছে; তাতেই মনে হয়, সেটা যেন ভাষা। কী ভাষা বোঝা যায় না, কিন্তু বোঝা না গেলেও—সেটা যে অর্থবহ হবে এমন ধারণা করা যায়। হয়তো অনেকেরই তাই ধারণা, পাছে স্বীকার করে বোকা বনতে হয়, তাই সেকথা বলেন না। বস্তুত এই মত প্রকাশ করে ইতিমধ্যেই অধ্যাপক আহ্মেদ বিশ্বের কাছে উপহাসাস্পদ হয়েছেন।

: ডক্টর, আমরা কেপলার বেস্-এ পৌঁচেছি। গভীর খাদে নামবে এবার গাড়ি—৪০° ঢালু পথ। সীট-বেল্ট এঁটে নিন।—ঘোষণা করল চালক।

সামনেই কেপলার ক্রেটারের বলয়মুখ; তার পরেই খাড়া খাদ। গাড়িটা খাদ বেয়ে নিচের দিকে নামতে থাকে। শ্রীনিবাসনের নজর হল সামনের দিকে, অন্ধকারের মধ্যে একটা জোরালো বাতি জ্বলছে। ক্রেটারের ভিতরে পৃথিব্যালোক প্রবেশ করছে অপেক্ষাকৃত কম। গাড়িটা ঐ জোরালো বাতির নিকটস্থ হ'লে দেখা গেল একটা সঞ্চরণশীল বিজ্ঞানাগার বা ক্যারাভান-ল্যাবরেটারি দাঁড়িয়ে আছে আট চাকার উপর। তাতে আছেন কয়েকজন বিজ্ঞানী ও পাহারাদার। পাশেই কালো প্লাস্টিক শীটে আপাদমস্তক-মোড়া কোন কিছু; যেন কোন দেশনায়কের মূর্তি ত্রিপল ঢাকা দেওয়া আছে, উন্মোচন অনুষ্ঠানের অপেক্ষায়।

ওঁরা তিনজন স্পেস-স্যুট পরে নিলেন। গাড়ির বাইরে বাতাস নেই, কৃত্রিম অক্সিজেন-এর প্রয়োজন, শীতও প্রচণ্ড বেশী, শূন্য ডিগ্রির অনেক নিচে। ডঃ শ্রীনিবাসন পৃথিবী থেকে রওনা হবার পর এই প্রথম 'স্পেস-স্যুট' বা মহাশূন্য-পোশাক পরে নিলেন। হেলমেটটা মাথায় গলিয়ে দিয়ে নিজেই এয়ার-লক এঁটে নিলেন। প্রথম চন্দ্রাভিযানের সময় এই পোশাক পরা যত হাঙ্গামার ছিল এখন মোটেই তা নয়।

হেলমেটটা মাথায় পরার পরেই শ্রীনিবাসন তাঁর হেডফোনে শুনতে পেলেন ডক্টর সিং-এর প্রশ্ন: প্রেসার ঠিক আছে ডক্টর শ্রীনিবাসন? শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে না?

না। কোনও অসুবিধা হচ্ছে না।

ডঃ সিং ওঁর পোশাকের বহিস্থ মাপযন্ত্রে বিভিন্ন সংকেত একবার পরীক্ষা করে দেখে নিলেন। তারপর বললেন, ঠিক আছে। চলুন এবার নামা যাক।

গাড়িতে পর পর দুটি কাঁচের দরজা। এয়ার-লক করা। ওঁরা তিনজনে ব্যাতানুকূল করা গাড়ি থেকে ধাপে ধাপে মুক্ত আকাশে বেরিয়ে এলেন। শ্রীনিবাসনের পদক্ষেপ দেখে মনে হচ্ছিল তাঁর পাকস্থলীতে বুঝি বেশ কয়েক পেগ সরেস কোন তরল পদার্থ আছে। টলতে টলতে শৈশবের হাঁটি-হাঁটি পা-পা ছন্দে তিনি এগিয়ে চললেন।

চাঁদের জীবনযাত্রায় এই এক মজা। কোন বস্তুর 'ওজন' এবং 'ভর' অর্থাৎ 'ওয়েট' এবং 'ম্যাস্' যে সমার্থক নয়, তা ঠিকমত বুঝে নিতে হলে তোমাকে চাঁদে যেতে হবে। পৃথিবীতে আঁক কষে কিছুতেই ওটা মালুম হবে না।

চাঁদে গেলেই বুঝবে তোমার 'ভর'টা অপরিবর্তনীয়, 'ওজন'টার হ্রাসবৃদ্ধি হতে পারে। কেমন করে বুঝবে? চাঁদে যদি লাফ মার অনায়াসে বিশ-পঁচিশ ফুট উপরে উঠে যাবে, যেহেতু তোমার ওজন কম। পড়বার সময় দড়াম করে আছাড় খাবে না, স্লো-মুভিং চলচ্চিত্রের মত ধীরে ধীরে নেমে আসবে। সোজা পথে যদি ছুটতে পার, দেখবে শরীরটা কী ভীষণ হাল্কা হয়ে গেছে। মনে হবে অজন্তার সপ্তদশ গুহায় আঁকা দেবদূতের মত আকাশে ভেসে চলেছ বুঝি। পরিষ্কার বুঝতে পারবে—তোমার ওজন অনেক-অনেকখানি কমে গেছে। কিন্তু তোমার 'ভর' বা 'ম্যাস' যে অপরিবর্তিত আছে সেটা সমঝাবে কি করে? অতি সহজে। সোজা পথে ছুটতে ছুটতে একবার ডাইনে কিম্বা বাঁয়ে মোড় নিয়ে দেখ না। অথবা হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ার চেষ্টা করেও দেখতে পার। তখনই অস্থিতে অস্থিতে মালুম হবে—তোমার পঞ্চাশ কে জি. বপুর 'ভর' অপরিবর্তিত আছে। তোমার 'ইনার্সিয়া' বা জাড্য পৃথিবীতে যা ছিল তাই আছে, ওজন কমে যাওয়া সত্ত্বেও। পৃথিবী থেকে সদ্য যারা চন্দ্রালোকে আসে তাদের ও-কথা খেয়াল থাকে না। ক্রমাগত ধাক্কা মারে, আছাড় খায়। তাই চন্দ্রালোকের স্থায়ী বাসিন্দারা চাণক্য-শ্লোকটাকে একটু পালটে নিয়ে প্রবচনটাকে করেছে 'শতহস্তেন পার্থিবানাম্…'।

প্লাস্টিক কাপড়ে ওটাকে ঢেকে রাখা হয়েছিল যাতে আকাশচারী কোন বৈমানিক অর্থাৎ 'ওরা' যেন সেটা দেখে না ফেলে। ওঁরা তিনজনে সেটার কাছাকাছি এসে দাঁড়াবার পর আবরণটা উন্মোচিত হল। অবাক বিস্ময়ে ডক্টর শ্রীনিবাসন দেখতে থাকেন বস্তুটাকে। অদ্ভুত মসৃণ কৃষ্ণকায় একটা জ্যামিতিক বস্তু। ওটা কি সত্যিই পাঁচ লক্ষ বৎসর সূর্যের মুখ দেখেনি? পূর্ব দিগন্তে সূর্যের 'করোনা' শিখা আরও প্রকট হয়ে উঠেছে। সূর্যোদয় আসন্ন। ঘড়ির দিকে নজর পড়ল ওঁর। ২১৬ ঘণ্টা। একটু চমকে ওঠেন উনি। এ কি? ঘড়িতে ১৭৭ ঘণ্টা সূচিত হলেই তো সূর্যোদয় হওয়া উচিত ছিল। পরমুহূর্তেই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাটা ওঁর খেয়াল হয়। কোপারনিকাস থেকে উনি অনেকটা পশ্চিমে সরে এসেছেন। প্রায় ২০° ডিগ্রি পশ্চিমে। ফলে এখানকার স্থানীয় সময় আরও ৩৯ ঘণ্টা পিছিয়ে। ওঁর ঘড়ি মুন-টাইম দিচ্ছে। কোপারনিকাস টাইম। নাঃ, সূর্য ভুল করেনি কিছু। সূর্য ঠিক সময়েই হাজিরা দিয়েছে কেপলার বেস-এ।

সূর্য থেকে এবার আবার দৃষ্টি ফিরে গেল দ্বাদশতল-বিশিষ্ট কৃষ্ণকায় বস্তুটার উপর। ধীরে ধীরে প্রদক্ষিণ করলেন ওটাকে। তারপর অতি সন্তর্পণে স্পর্শ করলেন। যেন তিনি জড়বুদ্ধির একজন প্রায়মানব। উত্তাপ বোঝা গেল না, ওঁর হাত দস্তানায় ঢাকা—কাঠিন্য অনুভূত হল। ইতিমধ্যে সূর্যোদয় হয়েছে। এর আগে যা আলোকচিত্র নেওয়া হয়েছে তা কৃত্রিম আলোয়। ডঃ শ্রীনিবাসন তাঁর ক্যামেরায় সূর্যালোকে দশ-বারোটি ফটো নিলেন বিভিন্ন কোণ থেকে। বিশেষ করে যে তলে ঐ অদ্ভুত ইঙ্গিতপূর্ণ রেখাগুলি খোদিত।

পর্যবেক্ষণ শেষ করে ওঁরা গাড়ির দিকে ফিরে আসছিলেন। এখন প্রখর

সূর্যালোক পড়ছে ঐ কালো বস্তুটার উপর। শ্রীনিবাসনের মনে পড়ল কালো রঙ উত্তাপ শোষণ করে। পার্থিব অবস্থায় ঐ কালো বস্তুটায় হাত দিলে এই সূর্যোদয়-মুহূর্তেও তাঁর হাতে ফোস্কা পড়ত।

হঠাৎ প্রচণ্ড এক যন্ত্রণা-বোধে দাঁড়িয়ে পড়েন ডঃ শ্রীনিবাসন।

পরমুহূর্তেই বুঝতে পারেন যন্ত্রণার উৎসটা ওঁর কর্ণমূলে। ওঁর হেলমেট-এর হেডফোনে সহসা একটা তীব্র তীক্ষ্ণ ইলেকট্রনিক শীৎকার শুনেছেন উনি। তাতেই মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠেছে। প্রতিবর্তী প্রেরণায় অর্থাৎ রিফ্লেক্স-অ্যাকসনের তাড়নায় তিনি দস্তানা-পরা দু-হাতে কর্ণমূল বৃথাই চেপে ধরতে চাইলেন। তবু আরও চারটি শব্দ-তরঙ্গ ওঁর মস্তিষ্ক বিদীর্ণ করে দিল যেন। মনে হল শব্দটা আসছে ঐ অদ্ভুত-দর্শন 'ডুডেকাহেড্রন' থেকে; কিন্তু তা যে অসম্ভব! বস্তুটা থেকে উনি বিশ-মিটার দূরে দাঁড়িয়ে—এই ব্যবধানে নেই কোন বাতাস; ভ্যাকুয়ামের মাঝ দিয়ে শব্দ-তরঙ্গ যেতে পারে না—ফলে এ শীৎকার ধ্বনি শব্দ-তরঙ্গ নয়, বেতার-তরঙ্গ! তাছাড়া ওঁর হেড ফোন শব্দ-গ্রাহক যন্ত্রও নয়, ইলেকট্রনিক বেতার-গ্রাহক যন্ত্র। তা হলে এ কী শুনলেন উনি? ধীরে ধীরে সঙ্গীদের দিকে ফিরলেন। তাঁরা কোনও কথা বলছেন না; কিন্তু তাঁদের বজ্রাহত ভঙ্গিই প্রমাণ দেয়, বেতার-তরঙ্গের শীৎকার ওঁরাও শুনেছেন একই ভাবে!

ভেবেছিলেন ফেরার পথে ডঃ সিংকে জানাবেন সেই আকাশ-সঙ্গিনী মিস্ বোসের কথা। ওর সাময়িক স্ফূর্তির কথা। কিন্তু সব কিছু গুলিয়ে গেছে শ্রীনিবাসনের। এটুকু আন্দাজ করেছেন যে, ঐ অদ্ভুত ধরণের বস্তুটার ভিতর সুকৌশলে রক্ষিত ছিল কোন বেতার-প্রেরক যন্ত্র। যার ফিউস গলে গেছে উত্তাপে। প্রখর সূর্যালোক উত্তাপের মাধ্যমে ঘুমন্ত রাজকন্যার কপালে জিয়ন-কাঠি ছুঁইয়ে দিয়েছে। এছাড়া ওর কোন ব্যাখ্যা হয় না। গ্রহান্তরের অতি বুদ্ধিমান জীবেরা পাঁচলক্ষ বছর পূর্বে যে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা শুরু করেছিল—আজ এতদিনে তার পূর্ণাহুতি হল। তাঁরা নিশ্চয় সূর্যমণ্ডলের তৃতীয় গ্রহে মানব-প্রজাতির পূর্বপুরুষদের দেখে আশা করেছিলেন—একদিন সুদূর ভবিষ্যতে বিবর্তনের তাগিদে তারা বুদ্ধিমান জীবে পরিণত হবে। হয়তো তাঁরা নিজেদের বিবর্তন দেখেই এমন একটা অনুমান করেছিলেন। ভেবেছিলেন, ঐ প্রায়মানব যখন অতি দূর ভবিষ্যতে মহাকাশে দোসর খুঁজতে বার হবে তখন প্রথমেই আসবে চাঁদে। তাই চাঁদের মাটির নিচে ছয় মিটার গভীরে প্রোথিত করে গিয়েছিলেন তাঁদের যন্ত্রটা। তাই ঐ বস্তুটাতে রেখেছেন চৌম্বক-বৃত্তি। যাতে বুদ্ধিমান মানুষ ওটা খুঁজে পায়। চন্দ্রগর্ভ থেকে বার করে আনে। তাহলেই সেটা সূর্যালোকের সংস্পর্শে আসবে। স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের ফিউস-তার গলে যাবে উত্তাপে। যন্ত্রটা বেতার-সঙ্কেতে মানুষের জয়গান ঘোষণা করবে। ওঁদের সেই পরিকল্পনা অক্ষরে অক্ষরে সাফল্য লাভ করেছে। মহাকাশ ভেদ করে সে বেতার-তরঙ্গ প্রতি সেকেণ্ডে ৩,০০,০০০ কিলোমিটার বেগে এখন ছুটছে তার আবিষ্কর্তার উত্তরপুরুষদের কাছে! সে বেতারবার্তা বলছে: শুভবস্তু বিশ্বে! সূর্যমণ্ডলের তৃতীয় গ্রহের সেই প্রায়মানব এতদিনে তার দোসরের পরিচয় লাভের

যোগ্যতা অর্জন করেছে।

কী আশ্চর্য! কী অদ্ভুত!

কিন্তু কোথায় আছে সেই গ্রহান্তরের জীব? সূর্যমণ্ডলে নিশ্চয় নয়। মহাকাশের কোন্ ঠিকানায়? আমাদের গ্যালাক্‌টিক-সিস্টেমে? কত আলোকবর্ষ দূরে? কত সহস্র বৎসর পরে ঐ বেতার-তরঙ্গ পৌঁছাবে তার গন্তব্যস্থলে? সেখানে এখনও—এই পাঁচ লক্ষ বছর পরেও সে সভ্যতা টিকে আছে তো? যদিও থাকে তবু তারা সে খবর পাবে বেশ কয়েক শতাব্দী অথবা সহস্রাব্দি পরে। তারা যদি অতঃপর সূর্যমণ্ডলের এই তৃতীয় গ্রহের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করে তবে কত হাজার বছর পরে তা পৃথিবী জানতে পারবে?

এইসব কথা ভাবতে ভাবতে তিনি যখন কোপারনিকাসে ফিরে এলেন তখন সেখানে প্রখর দিবালোক। এখন দিন পনের সেখানে দিবাভাগের আয়োজন। ডঃ শ্রীনিবাসন তাঁর অদ্ভুত আবিষ্কারের কথা বলতে গেলেন কোপারনিকাস বিজ্ঞানাগারের পণ্ডিতদের; কিন্তু তার পূর্বেই তাঁরা যে তথ্যটা জানালেন তাতে সব কিছু গুলিয়ে গেল আবার।

ইতিমধ্যে অর্থাৎ উনি কেপলার বেস-এর উদ্দেশ্যে রওনা হবার পর জ্যোতির্বিজ্ঞানে আর একটি বিস্ময়কর অতি বিস্ফোরণ ঘটেছে, যার অর্থ এখনও বোঝা যায়নি। প্রথমত পৃথিবীর সব বড়জাতের মানমন্দিরেই ধরা পড়েছে একটি অজ্ঞাত বেতার-তরঙ্গ—যেটি চন্দ্রলোক থেকে বৃহস্পতি গ্রহের দিকে ধাবমান। তার সংকেতের পাঠোদ্ধার করা যায়নি। কিন্তু ঠিক তার পরেই ঘটেছে আর একটা অদ্ভুত কাণ্ড। জ্যোতির্বিজ্ঞানাগারে রক্ষিত টেলিভিশান স্ক্রীনে হঠাৎ ফুটে উঠেছে একটি অদ্ভুত চিত্র—পৃথিবীর শক্তিশালী একাধিক টেলিভিশানে। অথচ কেউই সে ছবিটি পাঠিয়েছে বলে স্বীকার করছে না। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা চিত্রটি হুবহু পাইওনিয়ার এক-এ অঙ্কিত স্বর্ণফলকে আঁকা সেই ছবিটি (চিত্র—৬)।

প্রায় ত্রিশ বছর পূর্বে, ১৯৭২ সালে 'পাইওনিয়ার এক'কে পাঠানো হয়েছিল মহাশূন্যের দিকে। ৭৩ সালের ডিসেম্বরে তার বৃহস্পতি গ্রহকে অতিক্রম করার কথা। ১৯৮৭ সালে সে প্লুটো-কে অতিক্রম করে চলে গেছে ধনুরাশির দিকে। সেই পাইওনিয়ার এক-এর গায়ে আঁকা ছবিটি কে ফেরত পাঠালো পৃথিবীতে? চন্দ্রলোক থেকে বৃহস্পতির দিকে ধাবমান পাঁচটি অজ্ঞাত বেতার-তরঙ্গের গুরুত্ব এই অত্যাশ্চর্য আবিষ্কারে যেন ম্লান হয়ে গেছে। ওটা কী তা বোঝা যায়নি—ভারতের কাণ্ড হতে পারে। পাকিস্তানেরও হতে পারে। কিন্তু এটা অবাস্তব একটা ঘটনা। মহাশূন্যে কে আছে যে ঐ পাইওনিয়ার-চিত্রটি আমাদের কাছে এভাবে ফেরত পাঠালো? যে গতিবেগে পাইওনিয়ার এক্‌কে পাঠানো হয়েছে তাতে তিন হাজার আলোক বর্ষ দূরে তার গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে দশ কোটি বছর লাগার কথা। মাত্র ত্রিশ বছর পরে—

যদি ধরে নেওয়া যায় কোন নক্ষত্রলোকের উপগ্রহস্থিত কোন বুদ্ধিমান 'জীব' ঐ পাইওনিয়ার এক্‌টিকে ক্রিকেট বলের মত লুফে নিয়েছে—তাহলে তারা

বুঝতে পেরেছে তার উৎপত্তিস্থল। 'গোল্ড-প্লাকে' আঁকা ছবি দেখে। বেতার তরঙ্গে পৃথিবীতে সে খবর জানিয়েছে। তাহলে অন্তত একটি কথা বোঝা যায় —সে নক্ষত্রের অবস্থান কিছুতেই পৃথিবী থেকে ত্রিশ আলো-বছরের চেয়ে দূরে নয়। ত্রিশ আলো-বছর ? সে তো কিছুই নয়। মাত্র সাতটি নক্ষত্র অত কাছে অবস্থিত—আলফা সেন্টরি, লুব্ধক (Sirius), প্রশ্বন (Procyon), শ্রবণা (Altair), ফোমালহট (Fomalhaut), অভিজিৎ (Vega) এবং পুনর্বসু (Pollux)। তবে কি এদেরই কোন গ্রহে তাঁদের বাস ? এত কাছে ?

তিন পার্থিব-দিন পরের কথা। ডঃ শ্রীনিবাসন ফিরে এসেছেন পৃথিবীতে : প্রাথমিক একটা মৌখিক রিপোর্ট দাখিল করেছেন বিজ্ঞান-মন্ত্রককে। লিখিত রিপোর্ট এখনও দাখিল করেননি। প্রথমেই অধ্যাপক ইকবাল আহমেদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন—যাবতীয় তথ্যের একটি মাইক্রোফিলম কপি তাঁকে দাখিল করেছেন। স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর ফিরে এসে দেখা হয়নি। মিসেস শ্রীনিবাসন দুদিনের জন্য জাকার্তা গেছেন এশীয় নারী-সম্মেলনের মাসিক মিটিং এ যোগ দিতে। আগামী কালই তাঁর ফেরার কথা। সবে সকাল হয়েছে। প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে শ্রীনিবাসন প্রথমেই এগিয়ে গেলেন টেলিফোন স্ট্যাণ্ডের দিকে। মনে পড়ল, আজ তাঁকে রিপোর্টটা দাখিল করতে হবে। তার পূর্বে অধ্যাপক আহমেদের সঙ্গে একটা প্রাথমিক আলাপ হলে মন্দ হয় না। দেখা যাক, উনি কোন সমাধানে আসতে পেরেছেন কিনা। ঠিক সমাধান না হ'ক, সমাধানের কোন পথ-নির্দেশ।

টেলিফোনটা তুলে নিতেই অটোমেটিক-রেকর্ডার ঘোষণা করল, গুড ইভ্‌নিং মাই বয়,······আই বেগ য়োর পার্ডন···গুডমর্নিং ! আমি মধ্যরাতে কথা বলছি বটে, কিন্তু তুমি তো শুনবে কাল সকালে। টাইম-স্পেস-কন্টিনুয়াম ! সে যাই হোক, শোন—সুখবর আছে। সব কিছু নাহলেও অনেক কিছু বুঝতে পারা গেছে। তুমি এ মেসেজটা শুনলেই আমার কাছে চলে এস। আমাকে ফোন ক'র না। আমি ঘুমুতে যাচ্ছি। ঘণ্টা-চারেক ঘুমিয়ে নেওয়া খুব দরকার। সকাল আটটায় দেখা হবে···

রইল পড়ে ব্রেকফাস্ট। হাতঘড়িতে দেখলেন সাড়ে সাতটা। না, মুন টাইম নয়। হাতঘড়িটা ইতিমধ্যে বদল করেছেন উনি। গ্যারেজ থেকে গাড়ি বার করে সিধা ও'র বাড়ির দিকে।

ও'রা দুজনেই একই শহরের নাগরিক। উটকামণ্ড, উটি। পাহাড়ের বুকে সূর্যকরোজ্জ্বল ঝলমলে ছবির মত শহর। পুতুলের ঘরের মত থাকে থাকে সাজানো বাড়ি। মাথার উপর রোপ-ওয়ের ঊর্ণনাভ জালিকা। সে সব কিছুই নজরে পড়ল না ডক্টর শ্রীনিবাসনের। আক্ষরিক অর্থে যদি না ধরেন তবে বলব বিদ্যুৎ-গতিতে ড্রাইভ করে তিনি এসে পৌঁছালেন তাঁর গুরুর আবাসে।

অধ্যাপক আহমেদ একজন বিচিত্র মানুষ। এক মাথা সাদা চুল, এক বুক দাড়ি। যেন খর্বাকৃতি টলস্টয়। বয়স বর্তমানে সাতানব্বই। পদার্থ ও

গণিতে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য। সাধারণ ভাবে তাঁকে নোবেল-লরিয়েট বলা হয় বটে, কিন্তু নোবেল-প্রাইজ তিনি পাননি। পাননি নয়, নেননি! গত পঞ্চাশ বছরের ইতিহাসে তিনি চতুর্থবার সে ইতিহাস রচনা করেছেন। ১৯৬৮ সালে বরিশ পাস্টেরনাক,—রাশিয়ান, ৬৪-তে জ্য-পল সার্ত্র—ফরাসী, ৭৩ সালে উত্তর ভিয়েৎনামের লেডুক থো এবং ১৯৯৮ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় ইকবাল আহমেদ। বিশ্বের ঐ শ্রেষ্ঠ পুরস্কার কেন প্রত্যাখ্যান করেছেন তা তিনি একটি 'খোলা চিঠি'তে বিশ্বকে জানিয়েছিলেন। সেই 'খোলা চিঠি' ইতিহাস রচনা করেছে : তিনি লিখেছিলেন, "আমি মনে করি গত একশ বছরে পৃথিবী আরও পরিণত হয়েছে, তাই যে-কথা ১৯২১ সালে আমার গুরুস্থানীয় বৈজ্ঞানিক আলবার্ট আইনস্টাইন সৌজন্যবোধে উচ্চারণ করেন নি সে-কথা কটা প্রকাশ করায় আমি কোন বাধা দেখি না। শুধু আইনস্টাইন নন, বহু বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিকের ক্ষেত্রে এ দুর্ঘটনা বারে বারে ঘটেছে! বর্তমান বৎসরে অর্থাৎ ১৯৯৮ খৃষ্টাব্দে নোবেল-কমিটি আমাকে 'শান্তির' জন্য পুরস্কার প্রদানের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। আমি মনে করি এটা পুরস্কার নয়, আর কিছু। প্রফেসর আইনস্টাইনের ইউনিফায়েড ফিল্ড থিয়োরির উপর আমি সামান্য যা কাজ করেছি তা প্রকাশিত হয়েছে দশ বৎসর পূর্বে। সেই কাজটিই আমার সারা জীবনের পরিশ্রমের একমাত্র ফল। আমার জ্ঞান-বুদ্ধিমত তার যাথার্থ্য প্রমাণ করবার চেষ্টা আমি করেছি, যদিও দুর্ভাগ্যক্রমে অনেকেই তা বুঝতে পারেননি। সে দোষ আমার নয়। ঠিক অনুরূপ অবস্থা হয়েছিল আমার গুরুস্থানীয় প্রফেসর আইস্টাইনের ক্ষেত্রেও। তাঁর আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্বের সারমর্ম সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে নোবেল কমিটি তাঁকে সেই আবিষ্কারের জন্য পুরস্কৃত করতে ভরসা পাননি। আমার ক্ষেত্রেও অনুরূপ ঘটনা ঘটায় আমি বিস্মিত নই; কিন্তু 'বিশ্বশান্তি'র জন্য আমার কোন রকম অবদান না থাকা সত্ত্বেও এই জীবন সায়াহ্নে আমাকে নোবেল প্রাইজ প্রাপকদের তালিকাভুক্ত করার এ প্রয়াসে আমি সত্যই বিস্মিত। তাই ঐ পুরস্কার গ্রহণে আমি অসমর্থ।"

এমনই খেয়ালী মানুষ সাতানব্বই বছরের বৃদ্ধ অধ্যাপক ইকবাল আহমেদ।

ডঃ শ্রীনিবাসন ভারতীয় কায়দায় বৃদ্ধ মুসলমান ভদ্রলোকের পদধূলি নেবার উপক্রম করতেই বৃদ্ধ ওঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, এই যে তুমি এসে গেছ! বস। তোমার সমস্যার একটা মোটামুটি সমাধান করা গেছে, বুঝলে? দু-একটি খট্‌কা অবশ্য এখনও আছে—

: বলুন স্যার?—আসন গ্রহণ করেন শ্রীনিবাসন।

: না। আমি আগে বলব না। তুমি বরং বল, কতদূর বুঝছ?

: সে তো আমি ইতিপূর্বেই বলেছি।

: না, সব কথা বলনি। তুমি যখন বলেছিলে, তখনও প্রমাণিত হয়নি ঐ ডুডেকাহেড্রনটার নির্মাণকাল পাঁচ লক্ষ বৎসর পূর্বে। এখন আবার নতুন করে বল। আমি প্রশ্ন করে যাই একে একে। প্রথমে বল, সাংকেতিক লিপির মাঝামাঝি যে বারোটি গোলাকার চিহ্ন আছে (চিত্র—৮) তার ব্যঞ্জনা কী?

: আমি প্রথমে ভেবেছিলাম ওটা সৌরমণ্ডলের চিহ্ন। বুধ থেকে প্লুটো এই নয়টি গ্রহ, সূর্য এবং প্রস্যারপাইনা, একুনে এগারো হয়, বারো নয়। তাই ঐ থিওরিটা বাতিল করতে হল।

বন্ধ মিটি মিটি হাসছেন। বললেন, বেশ, বাতিল করলে। বিকল্প থিওরিটা কী খাড়া করলে?

: আমার ধারণা হল—ওঁরা দশমিক-গঠন পদ্ধতি মানতেন না। এক থেকে দশ নয়, এক থেকে বারো তারপর শূন্য। এর নজির আছে, মায়া সভ্যতায়। ফুটকি, সরল রেখা আর বক্ররেখার সাহায্যে ১ থেকে ১৯ পর্যন্ত লেখা হত; ওরা গুনতো 'কুড়ি-চল্লিশ-ষাট-আশি-একশ' করে—আমরা যেমন দশমিক-পদ্ধতিতে দশ-কুড়ি-ত্রিশ-চল্লিশ গুনে যাই। গ্রহান্তরের জীবেরাও হয়তো তেমনি গুনতেন বারো-চব্বিশ-ছত্রিশ-আটচল্লিশ ধরে। সেক্ষেত্রে গোটা বস্তুটা কেন 'ডুডেকাহেড্রন' হল অর্থাৎ দ্বাদশতল-বিশিষ্ট ঘন-বস্তু হল তার ব্যাখ্যা মেলে। 'বারো'ই ছিল ওঁদের অংকশাস্ত্রের প্রথম য়ুনিট।

: এইটেই তোমার মত?

: না স্যার। সেক্ষেত্রে পঞ্চভুজের বাহুটা কিছুতেই এক মিটার হত না। এক মিটার দৈর্ঘ্যটার সঙ্গে দশমিক-পদ্ধতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পৃথিবীর উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরুর দ্রাঘিমা-রেখা বরাবর দৈর্ঘ্যের এক কোটি ভাগের এক ভাগ হচ্ছে এক মিটার। এক কোটি হানে একের পিঠে সাতটা শূন্য—টেন টু দি পাওয়ার সেভেন। পার্থিব কোন দৈর্ঘ্যকে আলোর গতি থেকে অথবা নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের কোন অপরিবর্তনীয় দৈর্ঘ্যকে 'বারো' দিয়ে ভাগ করে ঐ এক মিটার 'য়ুনিট'টাকে উদ্ধার করতে পারিনি।

: সুতরাং?

: জানি না স্যার। তবে মনে হয়, আমার প্রথম ধারণাটা ভুল। দশমিক পদ্ধতি ওঁরা জানতেন।

: রাইট ও! দশমিক পদ্ধতির সোজা পথে না, চললে গণিতশাস্ত্র অচল। ওটা বুদ্ধিমান জীবকে জানতেই হবে, মানতেই হবে, না হলে সেই জীবের সভ্যতা মায়া সভ্যতায় আটকে থাকত—সংখ্যাতত্ত্বের এমনই নির্দেশ। তাছাড়া ওঁরা যে দশমিক তত্ত্ব জানতেন তার একাধিক প্রমাণ আমি পেয়েছি ঐ সাঙ্কেতিক লিপিতে। ক্রমশঃ বুঝিয়ে বলছি। প্রথমে বলি, তোমার প্রথম থিওরিটাই ঠিক। সঙ্কেত-লিপির ঐ দ্বাদশটি গোলাকার চিহ্ন সৌরমণ্ডলের চিত্রই।

: কিন্তু বারোটি কেন স্যার? এগারো নয় কেন?

হাসলেন বন্ধ। বললেন, তার একটিমাত্র জবাব। ১৯৩০ সালের পূর্বে অর্থাৎ প্লুটো আবিষ্কারের আগে ঐ সঙ্কেতলিপিটা উদ্ধার করলে মানুষ বলত—দশটা কেন নয়? আজ এই ২০০১ সালে প্লুটোর পরবর্তী গ্রহ প্রস্যারপাইনা আবিষ্কৃত হওয়ায় তুমি আর এক ধাপ এগিয়ে বলছ এগারোটি কেন, নয়?

: তার মানে আপনি বলছেন—প্লুটোর পিছনে একটি নয়, দুটি গ্রহ আছে?

: আমি বলছি না শ্রীনিবাসন। গ্রহান্তরের দেবতাত্মা বলছেন। তুমি আমি

জানি না—তাঁরা তা জেনেছেন।

অনেকক্ষণ স্থির হয়ে বসে থাকেন শ্রীনিবাসন। তত্ত্বটা হজম করতে সময় লাগা স্বাভাবিক। তারপর বললেন, আর ঐ বারোটা বৃত্তের নিচে যে পাঁচটি সরল রেখা আছে? যার এক প্রান্তে লেখা 'প্র' এবং অপর প্রান্তে 'ও'?

: লক্ষ্য করে দেখ 'প্র' অক্ষরটা সৌরমণ্ডলের তৃতীয় গ্রহের ঠিক নিচেই। ওটা 'প-য়ে-রফলা' নয়—প্রায়-মানবদের সাঙ্কেতিক চিহ্ন। হোমো-ইরেকটাস, যারা দুপায়ে দাঁড়াতে শিখেছে তাদেরই ছবি—কাল্পনিক চিত্র নয়। দেখে দেখে আঁকা পোর্ট্রেট।

শ্রীনিবাসনের সর্বদেহ রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। ঐ 'প-য়ে-রফলা' চিহ্নটা তাহলে একটা পোর্ট্রেট? দেখে দেখে আঁকা ছবি! পাঁচ লক্ষ বছর আগেকার?

বিদ্যুদ্চমকের মত একটা চিন্তা খেলে গেল ডঃ শ্রীনিবাসনের মাথায়। বললেন, আপনি কি বলতে চান—ঐ পাঁচটি রেখার যোগফল আমাদের দূরত্বকে বোঝাচ্ছে? রেখার এ প্রান্তে যদি হোমো-ইরেক্টাস তাহলে ও প্রান্তের ঐ 'ও' চিহ্নটা কি তাঁদের প্রতীক?

: আমার তো তাই মনে হচ্ছে।

: কিন্তু মাপের 'য়ুনিট' কি? কোন্ স্কেলে দূরত্বটা মাপব?

: স্কেলটা আমার মনে হচ্ছে সাঙ্কেতিক চিত্রেই বলা আছে। খুঁজে দেখ।

ডঃ শ্রীনিবাসন তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চিত্রটি (চিত্র—৮) দেখতে থাকেন। শেষে পরাজয় স্বীকার করে বলেন, পারলাম না স্যার, বুঝিয়ে বলুন।

বৃদ্ধ বলেন, ভেবে দেখ—দূরত্বটা মহাজাগতিক। ফলে 'য়ুনিট'টাকে বিশাল হতে হবে। আমরা জ্যোতির্বিজ্ঞানে দূরত্বের য়ুনিট বা মাপকাঠি হিসাবে ধরেছি 'পারসেক' বা 'আলোকবর্ষ'। কিন্তু সে দুটি মাপকাঠি দিয়ে এত বিশাল দূরত্ব ম্যাপে এঁকে দেখানো যায় না। সেটা হবে দিল্লি থেকে নিউ ইয়র্কের দূরত্ব বোঝাতে মিলিমিটার য়ুনিট গ্রহণ। তাছাড়া আলোক-তরঙ্গের গতি যে প্রতি সেকেণ্ডে ৩,০০,০০০ কিলোমিটার সেটা তো সেই গ্রহান্তরের জীব জানতেন না!

: জানতেন না? কেমন করে জানলেন যে, জানতেন না?

: অতি সহজে। আমরা যে ষাট সেকেণ্ডে মিনিট, ষাট মিনিটে ঘণ্টা, চব্বিশ ঘণ্টায় দিনের ভাগ করব তা পাঁচ লক্ষ বছর আগে তাঁরা কেমন করে জানবেন? ওঁরা জ্যোতির্বিজ্ঞানীই ছিলেন, জ্যোতিষী ছিলেন না। তাই 'সেকেণ্ড' এই সময়ে মাপটা তাঁরা জানতেন না। ফলে আলোক-তরঙ্গ যে সেকেণ্ডে ৩,০০,০০০ কিলোমিটার যায় তা জানবেন কেমন করে?

: তা হোক, কিন্তু তা সত্ত্বেও 'আলোকবর্ষ' দূরত্ব তাঁদের জানা অসম্ভব নয়। কারণ দিন ও বৎসরের ধারণাটা প্রাকৃতিক ঘটনা থেকে নেওয়া। পৃথিবী নিজের অক্ষের চারিদিকে ঘুরে আসতে যে সময়টুকু নেয় তার ৩৬৫·২৫৬৩১২ গুণ সময়ে সে সূর্য প্রদক্ষিণ করে—এই তথ্যটার সঙ্গে মানব-সভ্যতার কোন সম্পর্ক নেই। ফলে 'সেকেণ্ড' এই সময়ের মাপটা তাঁরা না জানলেও, 'বৎসর' সময়ের মাপটা তাঁদের না-জানার কিছু নেই। এই 'আলোকবর্ষ' দূরত্বটাই বা জানবেন না কেন?

: জবাবে দুটো কথা বলব। প্রথমতঃ তোমার ঐ হিসাবটা সর্বযুগে অভ্রান্ত নয়। দিনের মাপ প্রতি শতাব্দীতে ⋅০০১ সেকেণ্ড বেড়ে যায়। অর্থাৎ পাঁচ লক্ষ বছর আগে বৎসর ছিল পাঁচ সেকেণ্ড কম। অর্থাৎ ও'রা যখন এসেছিলেন তখন 'আলোকবর্ষ' মাপে কিছু ছোট ছিল। সেটা অবশ্য তেমন কিছু নয়, আসলে ও'রা ম্যাপে বোঝাবার সময় এমন একটা দৈর্ঘ্যের য়ুনিট খুঁজেছিলেন যা আলোক-বর্ষের চেয়ে লক্ষ-কোটি গুণ বড়। এমন কী য়ুনিট তাঁরা বেছে নিতে পারেন?

আবার অনেকক্ষণ চিন্তা করলেন শ্রীনিবাসন। শেষে বললেন, আপনিই বলুন!

: বলছি। কিন্তু তার আগে বলছি—ঐ বারোটি গোলাকার চিহ্নের ওপরে যে চিহ্নটি আছে তার অর্থ কি? ঐ যে ফুটকি-চিহ্ন দিয়ে আঁকা একটা সামন্তরিক (parallelogrm), যার দুটি কর্ণকে (diagonal) খুব মোটা দাগ দিয়ে আঁকা হয়েছে?

: ওটার অর্থ আমি বুঝিনি। কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করেছেন স্যার? ঐ সিমেট্রিকাল চিত্রে একটি অসঙ্গতি আছে—জমির সমান্তরাল মোটা দাগটার এক দিকে একটা × চিহ্ন আছে, অপর দিকে নেই।

বৃদ্ধ মিটিমিটি হাসছেন। বলেন, হ্যাঁ, ওটা আমার নজরে পড়েছে। আরও লক্ষ্য করেছি, চিত্রের কেন্দ্রবিন্দু থেকে ঐ চিহ্নটার দূরত্ব ঐ লম্বা সরলরেখার সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্যের তিন ভাগের এক ভাগ।

: তার মানে?—চকিতে মুখ তোলেন শ্রীনিবাসন।

: শুধু তাই নয়—বড় ডায়াগনালটি দেখছি ছোটটির দশগুণ। এমন কোন মহাজাগতিক বস্তুর কথা কি তোমার—

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান, ডঃ শ্রীনিবাসন। বলেন: কী আশ্চর্য! এতক্ষণ ধরতে পারিনি? ছবিটা আমাদের গ্যালাক্টিক-সিস্টেমের একটা সেক্সান। ছায়াপথ-ঘেরা আমাদের নক্ষত্র-জগতের এক সাঙ্কেতিক চিত্র। দৈর্ঘ্যে প্রায় এক লক্ষ আলোকবর্ষ, বেদ দশ হাজার আলোকবর্ষ আর ঐ চিহ্নিত বিন্দু হচ্ছে সূর্যমণ্ডলের অবস্থান—কেন্দ্র থেকে প্রায় ত্রিশ হাজার আলোকবর্ষ দূরে এবং মেজর-এ্যাক্সিসে।

: তবে তো সবটাই বুঝে গেছ দেখছি।

: না স্যার, বুঝিনি। স্কেলটাকে এখনও ধরতে পারিনি। তাছাড়া গ্যালাক্টিক-সিস্টেমের ঐ চিত্রের নিচে ইংরাজী 'H' অক্ষরটারই বা ব্যঞ্জনা কী?

বৃদ্ধ হেসে বললেন, সে-সব কথা আমি বলব না শ্রীনিবাসন। বাকিটা তোমাকে বুঝে নিতে হবে। তবে আমার বিশ্বাস—দূরত্বের হিসাবটা তাঁরা স্পষ্টাক্ষরে বলে গেছেন। অন্তত আমার হিসাব তাই বলছে।

: আপনার হিসাব কী বলছে তা কেন বলবেন না?

: সেটা তোমাদের বিজ্ঞান বিশ্বাস করতে পারবে না বলে। উদ্ভুটে কথা বলায় ইতিমধ্যেই আমি যথেষ্ট উপহাসাস্পদ হয়েছি। আর নয়। এ পর্যন্ত আমি যেটুকু বলেছি, সেটুকু অবলম্বন করেই তুমি বরং তোমার রিপোর্ট দাখিল কর।

: আমি কেন করব স্যার ? এ আবিষ্কার তো আপনার। আপনার নামেই—

ডান হাতটা তুলে শ্রীনিবাসনকে থামিয়ে দেন বৃদ্ধ। বলেন, বিজ্ঞানের যেখানে শেষ সেখান থেকে দর্শনের যাত্রারম্ভ; দর্শন যেখানে থামে সেখান থেকেই ধর্মরাজ্যের শুরু। আমি এখন ঐ তৃতীয় পর্যায়ের বাসিন্দা শ্রীনিবাসন। আমাকে এ সবের মধ্যে জড়িও না।

শতবর্ষের সীমান্তে প্রফেসর ইকবাল আহ্‌মেদ আজ আর বৈজ্ঞানিক নন, সাধক! ইদানীং তিনি সুফী ধর্ম আর বৈদান্তিক ধর্ম নিয়ে মেতেছেন। জাগতিক ধরা-ছোঁয়ার বাইরে তিনি। স্বেচ্ছায় বস্তুতান্ত্রিক মধুচক্রকোষ কোটর ত্যাগ করে এসে আশ্রয় নিয়েছেন তাঁর চৈতন্যময় একান্তবাসে। সেখানে তৃতীয়-সত্তার স্থান নেই—আছেন তিনি নিজে আর তাঁর খোদাতাল্লা। উত্তমপুরুষ আর ত্বমসি।

কিন্তু বিশ্বের সেই 'ট্রাডিসান' যে সমানে চলেছে!

দলছুট যা পায়নি, জর্জ যা পায়নি, অধ্যাপক আহ্‌মেদই বা তা পাবেন কেমন করে? ডাক এল উচ্চতম মহল থেকে। এর মধ্যে ডঃ শ্রীনিবাসনের অবদান কতখানি তা বোঝা গেল না। যেতে হল। সমাজবদ্ধ জীব—রাষ্ট্রের প্রয়োজনে সাড়া না দিয়ে পার পাবেন কেমন করে? 'স্টেট-এমার্জেন্সি' বলে কথা! আহ্বান এসেছে স্বয়ং রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে। বিশেষ সংবাদবহ মারফৎ। রাষ্ট্রপতি স্বয়ং অধ্যাপক আহ্‌মেদের সঙ্গে একটি একান্ত সাক্ষাতে আগ্রহী।

রাষ্ট্রপতি ওঁর চেয়ে বয়সে প্রায় বিশ বছরের ছোট। তিনিও সত্তরের কোঠায়। আইনজ্ঞ সুপণ্ডিত। সসম্মানে অধ্যাপক আহ্‌মেদকে হাত ধরে নিয়ে গিয়ে বসালেন একটি গদি-আঁটা সোফায়, রাষ্ট্রপতি ভবনের এক বাতানুকূল-করা নিভৃত মন্ত্রণা-কক্ষে। তারপর বললেন, প্রফেসর, আপনি নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন কেন আমি আপনার সাক্ষাৎপ্রার্থী! আমি ব্যক্তিগতভাবে জানতে চাই, আপনি কতটা জেনেছেন, বুঝেছেন। পৃথিবীর বাইরে মহাকাশে যদি বুদ্ধিমান জীব সত্যই থাকে তবে আমরা নিশ্চয়ই তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করব। আমি, চাই সে পথপ্রদর্শক হ'ক ভারত। জগৎসভায় তাহলে আমাদের শ্রেষ্ঠ আসনটি সত্যিই ফিরে আসবে। এজন্য কয়েক সহস্র-কোটি মুদ্রার এক পরিকল্পনা তৈরী হচ্ছে। সে পরিকল্পনা অনুমোদন করার পূর্বে আমি ব্যক্তিগতভাবে আপনার কাছে কয়েকটি কথা জানতে চাই।

: বলুন। আমি সাধ্যমত জবাব দেব।

: গ্রহান্তরের বুদ্ধিমান জীবের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ আছে কি?

: না নেই।

: তাদের অবস্থান সম্বন্ধে আমাদের বিজ্ঞানীরা যা বলেছেন সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ আছে কি?

: আছে। তবে শতকরা ৯৯ ভাগ সম্ভাবনা ওঁরা গতিমুখ সম্বন্ধে নির্ভুল।

: আপনি কি মনে করেন—যে বুদ্ধিমান জীব চন্দ্রলোকে ঐ অদ্ভুত-দর্শন বস্তুটা রেখে গিয়েছিল তারাই 'মেসিয়ার-১৩'-এর জবাব পাঠিয়েছে ?

: তাই আমার অনুমান। বস্তুত বেশ কয়েক বছর পূর্বেই আমি ওদের বেতার-সঙ্কেতের বিষয়ে আমার পেপার দাখিল করি। বিশ্ববিজ্ঞানে একমাত্র আমিই বলেছিলাম বেতার-তরঙ্গের ঐ সংকেত কোন প্রাকৃতিক ঘটনা নয়, বুদ্ধিজীবী কোন প্রাণীর চৈতন্যপ্রসূত বেতার-স্পন্দন। তাতে বিশ্ববিজ্ঞানের কাছে উপহাসাস্পদ হয়েছি মাত্র।

: একটা কথা, চাঁদে যে বস্তুটা পাওয়া গেছে তার অমন অদ্ভুত আকৃতির কি কোন ব্যঞ্জনা আছে ? কি যেন নাম বস্তুটার—ডুডেকাহেড্রন !

: আছে। ওঁরা ইঙ্গিতে আমাদের জ্ঞানরাজ্যের শেষ সীমাটা দেখিয়ে বলেছিলেন—ত্রিমাত্রিক বুদ্ধিতে এই তোমার ধারণারাজ্যের শেষ সীমান্ত।

: কেন ?

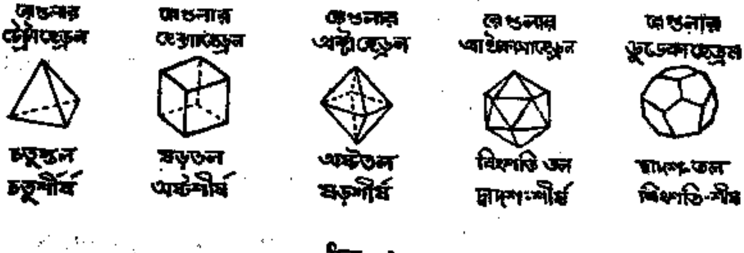
: বিংশতি-শীর্ষ-বিশিষ্ট ঐ ডুডেকাহেড্রন হচ্ছে ত্রিমাত্রিক জ্ঞানে সবচেয়ে বেশী শীর্ষ-বিশিষ্ট রেগুলার পলিহেড্রন। কুড়ির বেশী আমরা চিন্তা করতে পারি না।

: বুঝলাম না।

: স্বাভাবিক। যেহেতু আপনি বিজ্ঞান-চর্চা করেননি।—স্পষ্ট জবাব।

রাষ্ট্রপতি একটু লজ্জিত হলেন। তবু সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বলেন, আমার বোধগম্য ভাষায় বুঝিয়ে বলতে পারেন ?

: চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি ? শুনুন—রেগুলার পলিহেড্রন হচ্ছে এমন একটি ঘন বস্তু, যার প্রতিটি তলের একই আকৃতি, একই মাপ—যা কেন্দ্র থেকে সম-দূরত্বে অবস্থিত। প্রথম উদাহরণ হচ্ছে টেট্রাহেড্রন। তার চারটি তল, প্রত্যেকটিই সমবাহু ত্রিভুজ। তাতে চারটি চূড়া। পিরামিড কিন্তু



চিত্র—৯

রেগুলার পলিহেড্রন নয়, যেহেতু তার চারদিকে ত্রিভুজ, পঞ্চমদিকে বর্গক্ষেত্র। রেগুলার টেট্রাহেড্রনের পরবর্তী উদাহরণ হচ্ছে লুডো খেলার 'ছক্কা', যার বৈজ্ঞানিক নাম 'রেগুলার হেক্সাহেড্রন'। তাতে ছয়টি তল। আটটি চূড়া। পরবর্তী উদাহরণ আটতলবিশিষ্ট রেগুলার অক্টাহেড্রন। চূড়ার সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে ছয়-তে। তারপর 'আইকোসাহেড্রন'—তলের সংখ্যা কুড়ি, কিন্তু

শীর্ষের সংখ্যা বারো। সর্বশেষ উদাহরণ 'ডুডেকাহেড্রন', যার তলের সংখ্যা বারো কিন্তু শীর্ষসংখ্যা কুড়ি। এর চেয়ে অধিক শীর্ষওয়ালা কোন রেগুলার পলিহেড্রন আমাদের ত্রিমাত্রিক বোধে ধরা দেয় না (চিত্র—৯)। গ্রহান্তরের বুদ্ধিমান জীবেরা জানতেন, পার্থিব জীব তার ত্রিমাত্রিক ধারণায় ঐ ডুডেকা-হেড্রনে এসে থেমে যাবে। তার পরের স্তরে তাকে জানতে হবে এ বিশ্বপ্রপঞ্চ ত্রিমাত্রিক নয়। বুঝতে হবে স্থান ও কাল অসংপৃক্ত নয়। সেই সত্য প্রণিধান করার আগে তার পক্ষে গ্রহান্তরের সঙ্গে যোগাযোগ সম্ভবপর নয়। তাই ও'রা ইঙ্গিতে আমাদের জ্ঞানসীমার ঐ তুঙ্গশীর্ষটি তুলে ধরে বলতে চেয়েছেন—এবার এর পরের কথা তোমরা ভেবে দেখ। আমাদের সৌভাগ্য, প্রায় একশ বছর আগেই প্রফেসর আইনস্টাইন সে সত্যটা আবিষ্কার করেছেন—বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন, এ বিশ্বপ্রপঞ্চ ত্রিমাত্রিক নয়। বস্তুতে সেই স্থান ও কালের আঙ্গিক সম্পর্কটা, আপেক্ষিকতাবাদের মূল তত্ত্বটা না জানা থাকলে মানব-বিজ্ঞানকে এখানেই কূপমণ্ডূক হয়ে থাকতে হত।

রাষ্ট্রপতি বললেন, শুনেছি সে-তত্ত্ব নাকি অত্যন্ত দুর্বোধ্য। আপনি সহজ সরল ভাষায় আপেক্ষিকতাবাদের মূল তত্ত্বটা আমাকে বুঝিয়ে দিতে পারেন ?

বৃদ্ধ অধ্যাপক জবাব দিলেন না। স্মিত হাসলেন শুধু।

পুনরায় লজ্জা পেলেন রাষ্ট্রপতি। বললেন, বুঝেছি, বুঝেছি। আমি বিজ্ঞানের কিছুই জানি না। এ আমার অনধিকারীর অহেতুকী কৌতূহল।

এবার সামনের দিকে ঝুঁকে বসেন বৃদ্ধ অধ্যাপক। বলেন, আজ্ঞে না। তত্ত্বটা আমি আপনাকে সহজ সরল ভাষায় বুঝিয়ে দিতে পারি। আপনার যেটুকু বিজ্ঞান ও গণিতের জ্ঞান সেটুকুই যথেষ্ট। আমি আপনার কাছে দাবী করব শুধু দুটি জিনিস—ঐকান্তিক নিষ্ঠা এবং কিছুটা সময়। দিতে পারবেন ?

রাষ্ট্রপতি বললেন, আমার নিষ্ঠা বা সময়ের অভাব হবে না প্রফেসর আহমেদ।

বৃদ্ধ বললেন, বেশ। তবে শুনুন···

• • •

ভারতবর্ষের ঐ ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রপতির মত সময়, ধৈর্য এবং অধ্যবসায় যদি আমাদের থাকে তবে আমরা পরবর্তী পর্বে সেই দুরূহতম তাত্ত্বিক আলোচনায় প্রবেশ করতে পারি।

আর সে ধৈর্য কিম্বা অধ্যবসায় যদি না থাকে, তা হলে একটি বিকল্প ব্যবস্থাও করা যায়। সেক্ষেত্রে আমাদের কর্তব্য—ত্রিমাত্রিক ধ্যানধারণার শেষ-সীমান্তে ঐ ডুডেকাহেড্রনটাকে প্রদক্ষিণ করে, চিত্র—৯-এর গায়ে মনশ্চক্ষে হাত বুলিয়ে প্রায়-মানবদের মত আত্মসন্তুষ্ট থাকা। এই বিকল্প ব্যবস্থায় পরবর্তী পর্বের সব কটা পাতা অনায়াসে বাদ দিয়ে আমরা চতুর্থ পর্বে কাহিনীর সূত্রটা আবার তুলে নিতে পারি। লোমশ-সর্দারের ভাষায় বলতে পারি—তৃতীয় পর্বটা খাদ্যও নয়, খাদকও নয়। কী দরকার ও ঝামেলায় ?

তৃতীয় কোন বিকল্প পথ যে নেই তা আমাকে নতুন করে বলতে হবে না—সে কথা বহুদিন পূর্বেই বলে গিয়েছেন জ্যামিতি-জনক ইউক্লিড তাঁর ছাত্র টলেমিকে।

সম্রাটপুত্র টলেমি তাঁর গৃহশিক্ষক ইউক্লিডকে প্রশ্ন করেছিলেন—স্যার, এর চেয়ে সহজ কোন পথ নেই ঐ জ্যামিতির উপপাদ্যগুলো বুঝবার ?

জবাবে গণিতজ্ঞ ইউক্লিড বলেছিলেন, There is no Royal Road to Geometry.

[আজ্ঞে না, জ্যামিতি-রাজ্যে সম্রাট-তনয়ের জন্য কোন রাজপথ নেই।]

কী করা যায় বলুন ? গুরুদেব লোমশ-সর্দারের মন্ত্রশিষ্য হয়ে মধুচক্রকোষ আশ্রমেই নাম লেখাব ? যে-পর্বটা খাদ্যও নয়, খাদকও নয়—তার পাতা উল্টে যাব ?

॥ তৃতীয় পর্ব ॥

স্থান : ঘটনা পরম্পরা

কাল : মাপবার সংযুক্ত মাপকাঠি

পাত্র : প্রফেসার আলবার্ট আইনস্টাইন

॥ এক ॥

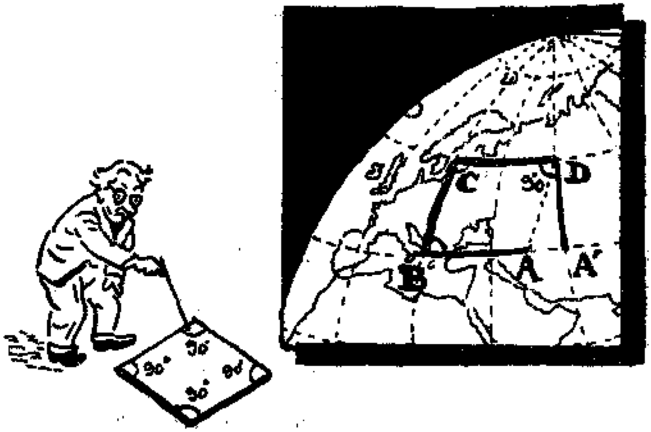
নিউটনের প্রসঙ্গে উঠলেই আমরা চট করে বলে দিতে পারি—তাঁর বাগানে একটা আপেল গাছ ছিল ; সেই গাছ থেকে তিনি পাকা-আপেলটির মত মাধ্যাকর্ষণকে একদিন টুপ করে পড়তে দেখেছিলেন। তেমনি আইনস্টাইনের নাম শুনলে আমরা বিদ্যেবাগীশের কাছে শুনি : তিনি ফোর্থ ডাইমেনশনের সুড়ঙ্গপথে অভিযান চালিয়ে 'রিলেটিভিটি' বস্তুটাকে আবিষ্কার করেন। যদি প্রশ্ন তুলি—'রিলেটিভিটি' কী অথবা 'ফোর্থ' ডাইমেন্‌শনটা কী জাতের জন্তু' ? ধমক শুনতে হয়—'বড় বড় পণ্ডিতেই ও-সব তত্ত্ব বোঝেন না, তোমাকে কেমন করে বোঝাই হে বাপু ! তবে হ্যাঁ, আবিষ্কারটা যুগান্তকারী, কালজয়ী, সহস্রাব্দীর শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার ! আরও ভাল ভাল বিশেষণ আছে, অভিধানে খুঁজে দেখ !'—ব্যস্‌ ! ল্যেঠা চুকে গেল।

অহেতুক দোষারোপ করে লাভ নেই—ব্যাপারটা সত্যই জটিল। গাণিতিক ব্যাখ্যা তো দূরের কথা, তাত্ত্বিক-আলোচনাও ঘুম-পাড়ানিয়া নয়। তবু হয়তো চেষ্টা করলে মোদ্দা কথাটা মোটামুটি বোঝা যায়। সত্যি কথা বলতে কি, বোঝার চেয়েও শক্ত হচ্ছে বিশ্বাস করা, মেনে নেওয়া। অথচ মেনে না নিয়েও উপায় নেই। এতকাল বাপ-পিতামোর আমল থেকে যা জেনে এসেছি সব ভুল —ঐ অবিশ্বাস্য কথাগুলোই সত্য !

প্রশ্ন উঠবে—ভুল যদি, তবে এতদিন তা টের পাইনি কেন ? অংকের গলদ এতদিন নজরে পড়েনি কেন ? সহজবোধ্য জবাব—বাজারের হিসাবে এক নয়া-পয়সার ঘাটতি হলে তুমি সেটা মেনে নাও, বল ও চব্বিশ নয়া পয়সাও যা, চার আনাও তাই। কিন্তু বাসের টিকিটের বেলায় তা মানতে চাইবে না ; কারণ মাসে যদি তোমাকে একশবার টিকিট কাটতে হয় তবে মাসিক নগদ একটি টাকা খসছে ! প্রাক-আইনস্টাইন যুগের মহাজাগতিক হিসাবের বেলায় ঐ এক নয়া পয়সার হের-ফের পরবর্তী যুগে রীতিমত গণ্ডগোল সৃষ্টি করতে শুরু করল। সেটার গুরুত্ব তখন মাত্র 'এক নয়া পয়সা' নয়। এ তত্ত্বটা বিজ্ঞান এতদিন খেয়াল করেনি, জানত না।

কেমন জান ? একটা উদাহরণ দিলেই বুঝবে। ধর, সহজ একটা জ্যামিতিক সত্য—একটা 'স্কোয়ারের', মানে বর্গক্ষেত্রের চারটে বাহু সমান, এটা তো মানবে ? আমি বলব—না, ওটা পার্থিব সত্য নয়। ধর আমড়াতলার মোড় থেকে তুমি সিধে পশ্চিম-মুখো হাজার কিলোমিটার হেঁটে গেলে। হাজার কিলোমিটার পশ্চিমে গিয়ে তুমি ডাইনে মোড় ফিরে সিধে আবার এক হাজার কিলোমিটার উত্তর-মুখে গেলে, সেখানে পৌঁছে আবার ডাইনে ফিরে সিধে এক হাজার কি. মি. পুব-মুখো গেলে। সেখানে পৌঁছে শেষবার ডাইনে ফিরে নাক-বরাবর আবার হাজার কিলোমিটার দক্ষিণে এলে। এবার কোথায় পৌঁছাবে তুমি ? আজ্ঞে না, 'আমড়াতলার মোড়ে' নয়। 'যেথায় খুশী' ! কারণটা বোঝা যাবে চিত্র—১০-এর দিকে তাকালে ; ছবিতে 'A' হচ্ছে 'আমড়াতলার মোড়'। বর্গক্ষেত্র

পরিক্রমা শেষ করে তুমি এসে পৌঁছাবে A' বিন্দুতে। চিত্রে AB=BC=CD =DA'। প্রতিটি হাজার কিলোমিটার। প্রতিটি বিন্দুতেই সমকোণ রচনা করা হয়েছে—কিন্তু শেষবার CD থেকে সমকোণ রচনা করলে আমরা DA পথে আসব না—আসব দ্রাঘিমা রেখা DA' বরাবর, তাই নয় ?



চিত্র—১০

তার মানে কি জ্যামিতির উপপাদ্যগুলো সব ভুল ? না, ভুল নয়—জ্যামিতি নির্ভুল থাকবে কাগজের উপর, যার দুটি মাত্র মাত্রা—দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ। পৃথিবী তো দ্বি-মাত্রিক নয়। ত্রি-মাত্রিক ঘন বস্তু। তাই ঐ গণ্ডগোলটা হচ্ছে। অবশ্য ভুলটা এসব ক্ষেত্রে খুবই সূক্ষ্ম। তাই জ্যামিতির সূত্র ধরে বাস্তুভিটের জমি জরীপ করা চলে ; গোটা দেশের জমি জরীপ করা চলে না। তার জন্য ঘন জ্যামিতির আইন-কানুনের আলাদা হিসেব। কাগজের দুনিয়া আর বাস্তবের পৃথিবী তো এক নয়।

আইনস্টাইন আরো এক ধাপ এগিয়ে বললেন—পৃথিবীটা তিন-মাত্রার হতে পারে—বিশ্বপ্রপঞ্চ চার-মাত্রার। ফলে মহাজাগতিক যে-সব সূত্র কেপলার-গ্যালিলেও-নিউটন বলে গেছেন, তা মহাজাগতিক অর্থে সত্য নয়। ঐ সব ফর্মুলার ফেলে এ পৃথিবীর ঐ বাস্তুভিটের জমিটুকুই নির্ভুল (অঙ্কে নির্ভুল নয়, বাস্তব প্রয়োগে) মাপতে পারে, সূর্য-নক্ষত্র-নীহারিকার ক্ষেত্রে ঐ হিসেবে রীতিমত হেরফের হবে।

'চারমাত্রার বিশ্বপ্রপঞ্চ' ব্যাপারটা বুঝি-না-বুঝি, 'অ্যানালজি' থেকে এটুকু বোঝা যাচ্ছে, কেন এতদিন কেপলার-গ্যালিলেও-নিউটনের সূত্র ধরে আমরা কাজ চালিয়ে আসতে পেরেছিলাম—আমরা এবং আমাদের বাপ-পিতেমো। ঐ যে বিশ্বপ্রপঞ্চের চতুর্মাত্রিক মূল-স্বরূপ তার ছন্দটা আইনস্টাইন ধরতে পেরেছিলেন ধাপে ধাপে। তিনটি পর্যায়ে তিনি বিশ্ব-বিজ্ঞানকে সে পরম সত্যটি

উপহার দিয়েছিলেন। তাঁর প্রথম দান 'স্পেশাল থিওরি অব রিলেটিভিটি' (১৯০৫); দ্বিতীয় দান 'জেনারেল থিওরি অব রিলেটিভিটি' (১৯১৬) এবং শেষ দান—দীর্ঘ তেত্রিশ বছর গবেষণার পর 'দ্য য়ুনিফায়েড ফিল্ড থিওরি' (১৯৪৯)।

বিশ্বপ্রপঞ্চের ঐ যে নন্দন-ছন্দ—যে-ছন্দে পরমাণুর অভ্যন্তরে না-ধর্মী বৈদ্যুৎ হাঁ-ধর্মী বৈদ্যুতের চারিদিকে আবর্তিত হচ্ছে, যে-ছন্দে নক্ষত্র-নীহারিকা মহাশূন্যে ধাবমান—তাকে বুঝব কী দিয়ে? মাপব কী করে? সম্বলের মধ্যে তো আছে মাত্র পাঁচটি ইন্দ্রিয় আর বুদ্ধি। গ্রহ-নক্ষত্রের ব্যাপারে আবার পঞ্চেন্দ্রিয়ের মধ্যে একমাত্র একটিই কার্যকরী হচ্ছে, দৃষ্টি। বাকি চারটির কেরামতি এই ক্ষুদ্র পৃথিবীতেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু চোখ দিয়েই বা কতটুকু দেখতে পাই? এ তো ঝিনুক দিয়ে সাগর মাপা!

ইংরাজ দার্শনিক জন লক বলেছিলেন, বস্তুতে 'গুণ' দুই প্রকার—প্রাথমিক (Primary) এবং অপ্রধান (Secondary)। তাঁর মতে বস্তুর আকৃতি, কাঠিন্য, গতি ইত্যাদি বাস্তব, সেগুলি তার প্রাথমিক গুণ—সেগুলি বস্তুর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। অপরপক্ষে বস্তুর বর্ণ, গন্ধ, স্বাদ ইত্যাদি তার অপ্রধান গুণ—যা আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বোধের নিরিখে বস্তুতে আরোপিত মাত্র। পরবর্তী দার্শনিকেরা এ চিন্তাধারার কৃত্রিমতা অনুধাবন করেছিলেন। জার্মান গাণিতিক পণ্ডিত লিবনিৎজ্ বললেন, "বর্ণ, গন্ধ, উত্তাপই শুধু নয়, বস্তুর গতি, আকৃতি, সম্প্রসারণ ইত্যাদিও আপাত-প্রতীয়মান আরোপিত গুণ মাত্র।" পিংপঙের বলটাকে চোখে দেখে বলছি ওটা সাদা, গোল, ছোট্ট—তেমনি সেটা হাতে নিয়ে বলছি ওটা হাল্‌কা, মসৃণ। আসলে এগুলি পিংপঙ বলের বস্তুনিহিত নিজস্ব গুণ আদৌ নয়, আমার চৈতন্যগ্রাহ্য জগতে তার আরোপিত অভিধা মাত্র।

ক্রমশঃ দেখছি পশ্চিমখণ্ডের দার্শনিক আর বিজ্ঞানীরা সেই সিদ্ধান্তের দিকেই এগিয়ে যেতে চাইছেন, যা নাকি অদ্বৈত বেদান্তের শাঙ্করভাষ্য—প্রতিটি বস্তুই যেহেতু তার গুণের সমাহার এবং যেহেতু সেই গুণের অবস্থান শুধুমাত্র আমার চৈতন্যে বা মনে সুতরাং এই বিশ্বপ্রপঞ্চ, বস্তু ও শক্তি—পরমাণু থেকে 'পাল্‌সার' আছে শুধুমাত্র আমার মনোজগতে বা চৈতন্যে। তার বাস্তব অস্তিত্ব শুধুমাত্র 'মায়া'। আইনস্টাইন ঐজাতীয় চিন্তাধারাকেই ক্ষুরধার গণিতের পথে নিয়ে গেলেন আমাদের ধ্যান ধারণার শেষ সীমান্তে। বললেন, 'স্থান' আর 'কাল' এরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন দুটি পৃথক ধারণা নয়; স্থান বা মহাকাশের কোন পৃথক অস্তিত্ব নেই, সময় বা 'কাল' এর কোন নিরপেক্ষ সংজ্ঞা নেই—'স্থান ও কাল'কে আমরা সংযুক্তভাবে ব্যবহার করতে পারি কতকগুলি জাগতিক ঘটনা-পরম্পরা মাপতে—ওরা শুধুমাত্র মাপকাঠি।

যদিও গণিতের মাধ্যমে গেলেন তবু এ সূত্র যেন দর্শনের রাজ্যে। কিন্তু বিজ্ঞানও একে উড়িয়ে দিতে পারল না। বিজ্ঞান চিরকাল বলে এসেছে—যে তত্ত্বের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রমাণ পাব না তা মানি না। এ বিশ্বপ্রপঞ্চকে 'মায়া' বলে মানব কেন? দু চোখ ভরে বিশ্বকে দেখছি না? দর্শন বলছে, ভেবে দেখ, কতটুকু তোমার দৃষ্টিশক্তির সীমা!

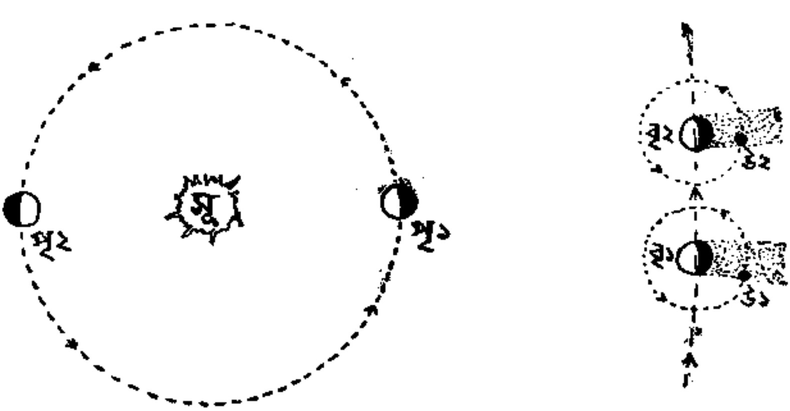
বিজ্ঞানকে থমকে দাঁড়াতে হচ্ছে—তা বটে! দৃষ্টিপথে কতটুকু দেখি? বিজ্ঞানই বলেছে—দেখতে হলে 'আলো' চাই। 'আলো' কি! এক জাতের ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক তরঙ্গ। কিন্তু সে তরঙ্গ-ভঙ্গিমার অতি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ আমার দৃষ্টিশক্তির ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য—বাদবাকি নিছক অন্ধকার। লাল আলোক-তরঙ্গের দৈর্ঘ্য ·০০০০৭ সেণ্টিমিটার, আর 'অতি বেগুনী' বা ভায়োলেটের ·০০০০৪ সে. মি। এটুকুই দেখি চোখে। এর ডাইনেও আঁধার, বাঁয়েও আঁধার। লাল-উজানী-আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য সামান্য বেশী—·০০০০৮ থেকে ·০৩২ সে মি। তা চোখে দেখি না, ত্বক তা অনুভব করতে পারে। আবার বেগুনী-পারের আলোক-তরঙ্গের দৈর্ঘ্য সামান্য খাটো,—·০০০০৩ থেকে ·০০০০১ সে মি; তাই তা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আদৌ নয়। তা শুধু ক্যামেরায় ধরা পড়ে। বেগুনী-পারের আলোর চেয়েও যে 'আলোক তরঙ্গ' মাপে ছোট, তাকে বলি 'এক্স-রে'। এ-ছাড়া আরও নানান দৈর্ঘ্যের 'আলো'র তরঙ্গ আছে—গামা-রে, রেডিও-তরঙ্গ, মহাজাগতিক-রশ্মি ইত্যাদি। যেহেতু তা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, তাই তাদের 'আলো' বলে মানতেই চাই না।

তাহলে পরিদৃশ্যমান জগৎ কেমন করে সত্য? ঐসব তরঙ্গ-ভঙ্গ যদি তোমার আমার দৃষ্টিতে ধরা পড়ত তাহলে তো দুনিয়াকে অন্যরকম বোধ হত। এক্স-রে রশ্মি যদি চোখে ধরা দিত তাহলে বাত্তিচেল্লির 'ভেনাস' দেখতে গিয়ে কঙ্কাল দেখে আঁতকে উঠতুম।

তার মানে যা দেখছি তাই সত্য নয়। সীমিত দৃষ্টি দিয়ে যা দেখছি তা আমার 'মনগড়া' দুনিয়া, মায়াময় জগৎ। বিশ্বকে বুঝে নিতে হবে বোধের নিরিখে—বুদ্ধি দিয়ে। অংক কষে।

আলোর গতি: আপেক্ষিকতা-তত্ত্বের উপর আলোকপাত করতে হলে সবার আগে সেই আলোর গতি-প্রকৃতির একটা ধারণা করে নিতে হবে। আলো যে নিখুঁত সরল-রেখায় চলে না, অতি ছোট ছোট তরঙ্গের আকারে চলে এ তত্ত্বটা বুঝতে পারার আগেই আলো নিয়ে নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছিল। মধ্যযুগের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক দেকার্তে'র (১৫৯৬-১৬৫০) ধারণা ছিল আলোর গতি অসীম; কিন্তু গ্যালিলেও-র (১৫৬৪-১৬৪২) বিশ্বাস সেটা মোটেই অসীম নয়। গ্যালিলেও-র জীবদ্দশাতেই ফরাসী বৈজ্ঞানিক মার্সেন শব্দের গতি মোটামুটি বার করে ফেললেন। গ্যালিলেও তাই দেখে এক অন্ধকার রাতে লণ্ঠন হাতে আলোর গতি মাপতে বার হলেন, কিন্তু তাঁর সরল যন্ত্রের সাহায্যে সেটা মেপে বার করা তাঁর সময়ে অসম্ভব ছিল। বস্তুত তাঁর ধারণার কোনও বাস্তব প্রমাণ তিনি দিয়ে যেতে পারেননি। তবে তাঁরই আবিষ্কৃত দূরবীনের সাহায্যে দিনেমার বৈজ্ঞানিক রোমার কী ভাবে আলোর গতিবেগটা মোটামুটিভাবে বার করে ফেলেন সেটা বুঝে নিতে খুব বেশী অংক কষতে হবে না। রোমার বুঝতে পেরেছিলেন—আলোর গতি অসীম না হলেও সেটা অত্যন্ত বেশী। বস্তুত আলোর গতিবেগ শব্দের গতির চেয়ে প্রায় সওয়া-আট লক্ষ গুণ বেশী। দুটো গতিবেগের কোন তুলনাই হয় না। রোমার অন্তত এটুকু বুঝতে পারলেন যে, পৃথিবীতে

কোথাও আলো জেলে গ্যালিলেও'র পদ্ধতিতে আলোর গতিটা মাপা যাবে না। মহাকাশ থেকে ভেসে-আসা কোন আলোকরশ্মি কতটা সময়ে কতটা দূরত্ব যাচ্ছে সেটা হিসাব করে বার করতে হবে। গ্যালিলেও নিজেই তাঁর দূরবীনের সাহায্যে বৃহস্পতি গ্রহের চার-চারটে উপগ্রহ দেখতে পেয়েছিলেন (বৃহস্পতির ঘাটের কোলে তেরটি চাঁদের-টুকরো ছানাপোনা আছে)। আমাদের চাঁদ যেমন নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে (২৭.৩২১৬৬১৪৮ পার্থিব-দিনে) পৃথিবীর চারদিকে এক পাক ঘুরে আসে ঠিক তেমনি বৃহস্পতির একটি বিশেষ উপগ্রহ ৪২.৫ ঘণ্টায় বৃহস্পতিকে প্রদক্ষিণ করে। পৃথিবীর তুলনায় চাঁদ যত ছোট বৃহস্পতির তুলনায় তার সেই উপগ্রহ অনেক-অনেক বেশি ছোট; তাই যদিও আমাদের চাঁদের প্রতিদিন 'চন্দ্র-গ্রহণ' হয় না, বৃহস্পতির সেই উপগ্রহটির প্রতিদিনই গ্রহণ হয়। রোমার-সাহেব লক্ষ্য করে দেখলেন—বৃহস্পতির ঐ উপগ্রহে 'চন্দ্র-গ্রহণ' হচ্ছে ৪২½ ঘণ্টা সময়ের ব্যবধানে। তার অর্থ—ঐ উপগ্রহটি ৪২½ ঘণ্টায় বৃহস্পতিকে একবার প্রদক্ষিণ করছে। তিনি আরও লক্ষ্য করে দেখলেন, ঐ সময়ের ব্যবধানটা সব সময় সমান থাকছে না। প্রতিদিনই সেই চন্দ্রগ্রহণের সময়টা একটু একটু করে পিছিয়ে



চিত্র—১১

যাচ্ছে। সময়ের ব্যবধানটা বাড়তে বাড়তে ছয় মাস পরে দেখা গেল সেটা হয়েছে ১০০০ সেকেণ্ড, অর্থাৎ ষোলো মিনিটেরও বেশি। তার হেতুটা বোঝা যাবে চিত্র—১১-র দিকে তাকালে। প্রথম অবস্থায় পৃথিবী যখন পৃ-১ অবস্থানে ছিল তখন বৃহস্পতির ঐ চাঁদটি ছিল উ-১ অবস্থানে। ছয় মাস পরে পৃথিবীর অবস্থান পৃ-২-তে। যেহেতু বৃহস্পতি গ্রহ অপেক্ষাকৃত ধীরগতিতে সূর্য-প্রদক্ষিণ করছে তাই ঐ ছয় মাসের ব্যবধানে তার অবস্থানের বদল হয়েছে বৃ-১ থেকে একটু দূরে বৃ-২-তে। তার মানে ছয় মাস পরে রোমার-সাহেব পৃ-২ অবস্থান থেকে যখন বৃহস্পতির চন্দ্রগ্রহণ দেখছেন তখন সেই উপগ্রহটি আছে উ-২ অবস্থানে। বৃহস্পতির সামান্য স্থান-পরিবর্তনকে ধর্তব্যের মধ্যে না নিলে বলতে পারি

চন্দ্রগ্রহণ পেছিয়ে যাবার আসল কারণটা হচ্ছে যেহেতু আলোকরশ্মিকে পৃ-১ থেকে পৃ-২ এই দূরত্বটা অতিক্রম করতে হচ্ছে। অর্থাৎ পৃথিবী যে উপবৃত্তের (ellipse) আকারে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে, তার পরাক্ষ (major axis)-টুকু পার হতে আলোর সময় লাগছে ১০০০ সেকেন্ড। (পৃথিবী প্রায় বৃত্তের আকারে সূর্য-প্রদক্ষিণ করে। চিত্রে বৃত্তই আঁকা হয়েছে। ফলে মেজর এ্যাক্সিস হয়েছে বৃত্তের ব্যাস) রোমারের সময়ে ও'রা জানতেন ঐ পরাক্ষের মাপ, অর্থাৎ পৃ-১ থেকে পৃ-২-দূরত্ব ১,৭২,০০০,০০০ মাইল। তাই তিনি সংখ্যাটাকে এক হাজার দিয়ে ভাগ করে বললেন, আলোর গতি সেকেন্ডে ১,৭২,০০০ মাইল। আমরা বর্তমানে জানি, পৃথিবীর সূর্য-প্রদক্ষিণ-পথের ঐ পরাক্ষের দৈর্ঘ্য ১,৮৬,০০০,০০০ মাইল। তাই হিসাবমত আলোর গতি সেকেন্ডে প্রায় ১,৮৬,০০০ মাইল বা প্রায় ৩,০০,০০০ কিলোমিটার।

প্রায় অর্ধ-শতাব্দী পরে ইংরাজ বৈজ্ঞানিক জেমস্ ব্রাডলে এবং আরও অর্ধ শতাব্দী পরে 'ফিজ্যু', 'ফুকো', এবং বর্তমান শতাব্দীতে মার্কিন নোবেল-লরিয়েট পদার্থ-বিজ্ঞানী মাইকেলসন আলোর ঐ গতিকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে নির্ধারণ করলেন। আরও দেখা গেল, মহাশূন্যে আলোর যা গতি জলের ভিতর, বা কাচের মত স্বচ্ছ কোন কিছুর ভিতর তার গতি কমে যায়। যেমন বলা যায়—জলের ভিতর আলোর গতি সিকি-পরিমাণ কমে যায়; কাচের ভিতর কমে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। আবহাওয়া অর্থাৎ বাতাসে সেটা এত কম হ্রাসপ্রাপ্ত হয় যা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। আরও মজার কথা—স্বচ্ছ কাচ বা জলের ভিতর আলোক-তরঙ্গের গতিবেগ হ্রাসপ্রাপ্ত হলেও দেখা যাচ্ছে ঐ মাধ্যম ভেদ করে বাতাসে বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে আলোক-তরঙ্গ আবার তার গতিবেগ—সেই সেকেন্ডে ৩,০০,০০০ কিলোমিটার গতি—আপনা থেকেই ফিরে পাচ্ছে। তা থেকে এটুকু বোঝা গেল যে, মাধ্যমের গুণাগুণের উপর আলোর গতি নির্ভর করছে। স্বতই মনে প্রশ্ন জাগে—মহাশূন্যে, যেখানে বাতাস নেই সেখানে আলোর গমনাগমনের মাধ্যম কী?

আলো যখন তরঙ্গভঙ্গে এগিয়ে চলে, তখন তার একটা 'মাধ্যম' চাই বইকি। জলে ঢেউ চলে জল আছে বলে, শব্দতরঙ্গ বাতাসে ভেসে চলে বাতাস আছে বলে—বাতাস যেখানে নেই শব্দতরঙ্গ সেখানে এগিয়ে যেতে পারে না, জল ছাড়া ঢেউ যেমন কল্পনা করা যায় না। তাহলে ঐ যে মহাশূন্যের ও-প্রান্ত থেকে সূর্যের আলো, নক্ষত্রের আলো নক্ষত্রের গ্রহ উপগ্রহের প্রতিফলিত আলো ভেসে আসছে তারও একটা মাধ্যম চাই। শুধু আলোই বা কেন—১৮৬৪ সালে ম্যাক্সওয়েল প্রমাণ করলেন বিদ্যুৎও এক জাতের তরঙ্গ। ক্রমে প্রমাণিত হল বেগুনী-পারের আলো, লাল-উজানী আলো, গামা রশ্মি মহাজাগতিক রশ্মি সবই তরঙ্গ ধর্মী। সকলেরই মহাশূন্য পাড়ি দিতে একটা মাধ্যমের প্রয়োজন। বাধ্য হয়ে এই সব তরঙ্গভঙ্গের জন্য একটা মাধ্যম কল্পিত হল। মেনে নেওয়া হল, মহাশূন্যে আছে এক মাধ্যম, তার নাম—'ঈথার'।

কল্পনা করা হল, ঐ ঈথারের ওজন নেই, আকার নেই, কোন গুণ নেই—আছে শুধু অস্তিত্ব।

অস্তিত্বের প্রমাণ ছাড়াই যুক্তির খাতিরে বিশ্ব-বিজ্ঞান এ সিদ্ধান্ত মেনে নিতে বাধ্য হল।

ঈথারের অস্তিত্বের প্রমাণ : কিন্তু বিজ্ঞান যে প্রমাণ ছাড়া কোন কিছুর অস্তিত্বে বিশ্বাস করবে না বলে প্রতিজ্ঞা করে বসে আছে? ফলে এক জাতের পদার্থ-বিজ্ঞানী উঠে পড়ে লাগলেন ঈথারের বাস্তব-অস্তিত্ব প্রমাণ করতে। দ্বিতীয় দল বললেন, কী দরকার বাপু? বাস্তব-অস্তিত্ব থাক না থাক, শুধু অঙ্কের খাতিরে ওটা মেনে নাও না কেন? $\sqrt{-1}$ (রুট-ওভার মাইনাস্-ওয়ান)-এর তো বাস্তব-অস্তিত্ব নেই, তবু ওটা মেনে নিচ্ছি এজন্য যে, ওটা মেনে নিলে অঙ্ক কষতে সুবিধা হয়। 'রুট-ওভার মাইনাস-ওয়ান' কী, তা বোঝাতে গেলে বিস্তর অঙ্ক কষতে হবে; তার চেয়ে একটা সহজ উদাহরণ দিই তাহলেই বুঝবে ঐ অবাস্তব $\sqrt{-1}$-এর বাস্তব-অস্তিত্ব ছাড়াই কী ভাবে শক্ত শক্ত অঙ্ক কষে ফেলা যায় :

এক বেদুইন-সর্দার মৃত্যুকালে উইল করে গেল যে, তার সম্পত্তির অর্ধেক পাবে বড় ছেলে, এক-চতুর্থাংশ মেজ ছেলে এবং এক-পঞ্চমাংশ ছোট ছেলে। তিন পুত্র শ্রাদ্ধান্তে গুনে দেখল বাবা রেখে গেছেন উনিশটি উট। বোঝ বখেড়া! উনিশটা উট কী ভাবে অর্ধেক করা যাবে? কিম্বা চার অথবা পাঁচ ভাগ! বাধ্য হয়ে তারা তিন ভাই হাজির হল কাজীর কাছে। কাজী বললে, এ তো সহজ হিসাব! আমার আস্তাবল থেকে একটা উট নিয়ে এসে ওটাকে 'কুড়ি'তে পরিণত করলেই লেঠা চুকে যাবে। তিন ভাই হাঁ-হাঁ করে ওঠে। প্রতিগ্রহ তারা নেবে কেন? কাজী বললে, বাপু হে, তোমরা ব্যস্ত হয়ো না। আমি দানখয়রাত করতে বসিনি—অঙ্কের হিসাবটা শুধু বুঝিয়ে দিচ্ছি। শোন। আমার উটটা যোগ করায় এখন উটের মোট সংখ্যা হল কুড়ি, কেমন তো? এবার বড় ছেলে তার অর্ধেক নাও—দশটি। মেজ ছেলে কুড়ির এক চতুর্থাংশ—পাঁচটি; ছোট ছেলে এক পঞ্চমাংশ—চারটি। যোগ করে কত হল? দশ + পাঁচ + চার = একুনে উনিশ। আমার ফালতু উট এবার আমার আস্তাবলে ফিরে যাক!

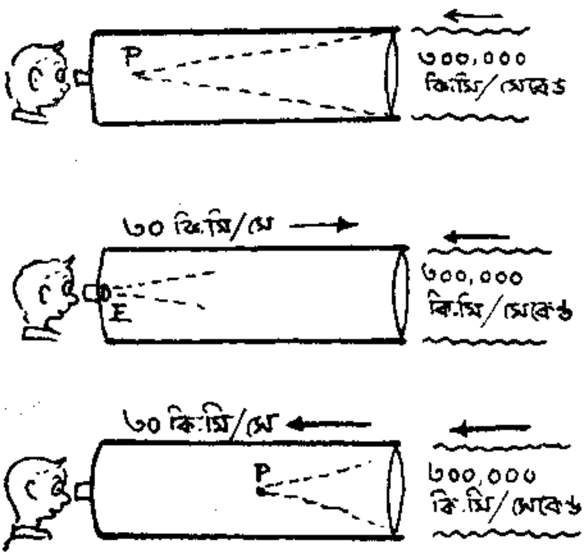
অঙ্কে যাঁরা দড় তাঁরা বলবেন—হিসাবে ফাঁক আছে। তা থাক, তিন ছেলে তো ঐ নিয়ে ঝগড়া-কাজিয়া করল না। পিতৃদত্ত উট কেটে খণ্ড-খণ্ড করতে হল না—তাই বা কম কি?

$\sqrt{-1}$ হচ্ছে অঙ্কশাস্ত্রে ঐ কাজীর ফালতু উটের মত। বাস্তবে তাকে আস্তাবল থেকে না আনলেও খাতা-কলমে অঙ্কটা কষে কাজী-সাহেব হিসাব মেলাতে পারতেন। দ্বিতীয় দলের বৈজ্ঞানিকরা বললেন, 'ঈথার'টাকেও ঐ $\sqrt{-1}$ অথবা কাজীর অনুপস্থিত উটের মত মেনে নাও না বাপু অঙ্কের খাতিরে।

কিন্তু প্রথম দলের বিজ্ঞানীরা তা মানতে রাজী নন।

তাঁরা বললেন, ঈথার যদি থাকে, তবে মেনে নিতে হবে ঈথার-সমুদ্রে গ্রহ-নক্ষত্র-নীহারিকা, আলো, বেতার-তরঙ্গ মহাজাগতিক রশ্মি প্রভৃতি ভেসে বেড়াচ্ছে বটে কিন্তু ঈথার আছে অচল-অনড়। অ্যাকোয়ারিয়ামে যেমন মাছ ভেসে বেড়ায়, জল থাকে অনড়; কিম্বা নিস্তরঙ্গ হ্রদে যেমন নৌকা ভেসে চলে ঢেউয়ের তালে তালে কিন্তু হ্রদের জল থাকে অচল। কিন্তু নিস্তরঙ্গ হ্রদে নৌকা এগিয়ে

চলেছে না স্থির আছে তা তো আমরা বুঝতে পারি নৌকা থেকে হাত বাড়িয়ে, জলে হাত ডুবালেই। বিজ্ঞানীরা ভাবলেন—ঠিক তেমন ভাবে ঈথার সমুদ্রে হাত ডুবিয়ে কি বোঝা যাবে না যে, নিস্তরঙ্গ ঈথারের ভিতর দিয়ে পৃথিবী এগিয়ে চলেছে? বাতাস স্থির, তবু নৌকা যদি পূব-মুখো যায় তবে পালটা পশ্চিম দিকে ফুলে ওঠে; তেমনি নিস্তরঙ্গ ঈথারের ভিতর দিয়ে পৃথিবী যখন এগিয়ে চলেছে তখন পরীক্ষা করলে নিশ্চয় বোঝা যাবে ঈথারের বিপরীত মুখী প্রবাহ। ঐ ঈথার প্রবাহটা যদি ধরা পড়ে তবে বোঝা যাবে ঈথার-সমুদ্রে পৃথিবী সূর্য-প্রদক্ষিণ করছে—তার চেয়ে বড় কথা প্রমাণ হবে ঈথারের অস্তিত্ব। এই জাতের একটি পরীক্ষার কথা এবারে বলি:



চিত্র—১২

চিত্র—১১ থেকে বেশ বোঝা যাচ্ছে পৃথিবী ছয় মাস আগে-পিছে বিপরীত মুখে অগ্রসর হয়। মনে করা যাক ১লা জানুয়ারী তারিখে আমরা টেলিস্কোপে একটা নক্ষত্রকে 'ফোকাস' করলাম। তখন পৃথিবীর গতিমুখ ঐ নক্ষত্রের দিকে। আমরা জানি, সূর্য-প্রদক্ষিণ-পথে পৃথিবীর গতি প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ৩০ কি মি.। প্রথমে ধরা যাক পৃথিবী স্থির আছে; নক্ষত্র থেকে আলোক-তরঙ্গ সেকেণ্ডে ৩,০০,০০০ কিলোমিটার বেগে দূরবীনের লেন্সে এসে পড়ছে এবং 'P' বিন্দুতে ফোকাস হচ্ছে (চিত্র—১২ উপরে); অর্থাৎ প্রতিবিম্ব রচনা করছে। যেহেতু 'P' বিন্দুটা দূরবীনের অনেকটা মাঝামাঝি, আইপীসের অনেক সামনে, তাই দর্শক সেই প্রতিবিম্বটা দেখতে পাবে না। এবার মনে করি, পৃথিবী সেকেণ্ডে ৩০ কিলোমিটার বেগে সামনের দিকে এগিয়ে আসছে। এবার অর্থাৎ দ্বিতীয়

অবস্থায় প্রতিবিম্বটা আইপীসের (E-চিহ্নিত) উপর পড়বে। দর্শক ঠিক মত দেখতে পাবে। মনে করা যাক, এই দ্বিতীয় অবস্থায় পয়লা জানুয়ারী যন্ত্রটাকে সাবধানে সীলমোহর করে রাখলাম। তারপর ছয় মাস পরে, ১লা জুলাই যদি আমরা ঐ দূরবীনে নক্ষত্রটাকে দেখতে চাই তাহলে সেটা 'আউট-অফ-ফোকাস' হয়ে যাবার কথা। কারণ এবার তৃতীয় অবস্থায় পৃথিবী উল্টো দিকে চলেছে, অর্থাৎ আলোর গতিমুখের দিকে চলেছে। আইনমোতাবেক তাই হওয়ার কথা ; বাস্তবে কিন্তু বার বার পরীক্ষা করেও এমনটি ঘটতে দেখা গেল না। ব্যাপার কি ? কেন এমনটা হচ্ছে ?

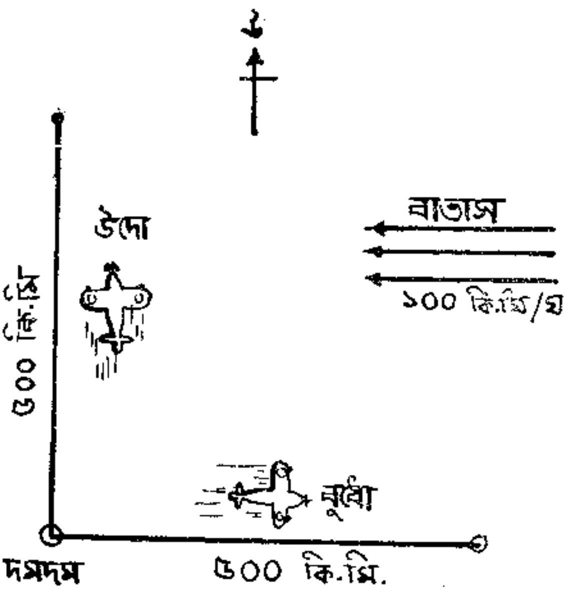
এর পর ঈথারের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে আর এক জাতের পরীক্ষা করলেন মাইকেলসন এবং মর্লে—যৌথভাবে। ঘটনাটা ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দের। সে পরীক্ষাতেও ঈথারের অস্তিত্ব প্রমাণিত হল না—কিন্তু কেন হল না, তার কোন যুক্তিনির্ভর ব্যাখ্যাও কেউ দিতে পারেনি তখন। পরীক্ষাটির কথা আমাদের বিস্তারিতভাবে আলোচনা করতে হবে, কারণ ঐ পরীক্ষার আপাত-অসঙ্গতিই আপেক্ষিকতাবাদের ভগীরথ। পরীক্ষাটির তাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় নেমে পড়ার আগে একটা অনুরূপ বাস্তব পরীক্ষার কথা আলোচনা করি বরং। ঈথার বস্তুটা আছে কি নেই সেটাই এখনো স্থির হয়নি, তাই আমাদের পরিচিত বস্তু 'বাতাসে' একটা অনুরূপ পরীক্ষা আগে করে হাত পাকাই :

উদো আর বুধো দুই যমজ ভাই। দুজনেই পাইলট। একই রকম দক্ষ বৈজ্ঞানিক। একই মডেলের দুটি বিমান নিয়ে ঠিক একই সময়ে তারা দমদম বিমানঘাটি থেকে রওনা হল। উদো গেল উত্তরে, বুধো সিধে পূর্বে। তাদের দুজনের গতিবেগই ঘণ্টায় হাজার কিলোমিটার। ধরা যাক দুজনেই ৫০০ কি মি সোজা গেল এবং সোজা ফিরে এল। অঙ্কের হিসাবে ওরা ঠিক একই মুহূর্তে দমদমে ফিরে আসবে। কারণ দুজনেই যাতায়াতে হাজার কি. মি পথ অতিক্রম করেছে, সময় নিয়েছে এক ঘণ্টা। এবার মনে করা যাক, ঐ সময় পূবালী ঝড় বইছিল ঘণ্টায় ১০০ কি মি বেগে। তাহলে কী হবে ? ঠিক একই মুহূর্তে তারা ফিরে আসবে কি ? না, তা আসবে না। দেখা যাবে পাশের থেকে চাপ থাকায় উদোকে যতটা বেগ পেতে হচ্ছে তার চেয়ে বুধোকে বেশি ঝামেলা পোহাতে হচ্ছে। ফলে বুধোর সময় কিছু বেশি লাগবে। এক ঘণ্টা পার হয়ে যাবার পরেও বুধোর ৩৬ সেকেণ্ড বেশি সময় লাগবে, উদোর ১৮ সেকেণ্ড।

যাবার সময় বুধোর গতিবেগ ছিল (১০০০—১০০) ৯০০ কি মি প্রতি ঘণ্টায়। ঐ গতিতে ৫০০ কি. মি পথ অতিক্রম করতে তার সময় লেগেছে ৫০০÷৯০০=$\frac{৫}{৯}$ ঘণ্টা=৩৩$\frac{১}{৩}$ মিনিট। তেমনি ফেরার সময় বুধোর গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় (১০০০+১০০)=১১০০ কি মি। ঐ গতিতে ফেরার পথে তার সময় লেগেছে ৫০০÷১১০০=২৭.২৭ মিনিট। যোগ করলে দাঁড়াচ্ছে ৩৩.৩৩+২৭.২৭=৬০.৬০ মিনিট=১ ঘণ্টা ৩৬ সেকেণ্ড। উদোর ক্ষেত্রে অঙ্কটা কিছু জটিল—সেটা বরং মেনেই নেওয়া যাক। মোট কথা বলতে পারি, আমরা যদি বায়ুর গতিবেগ না জানতুম অথচ ঘড়িতে দেখতুম উদো ফিরেছে ১৮ সেকেণ্ড

দেরিতে আর বুধো ৩৬ সেকেন্ড দেরি করে, তবে বলতে পারতুম সেই অজ্ঞাত বায়ুবেগ ছিল ঘণ্টায় ১০০ কি মি.।

এবার আমাদের পক্ষে মাইকেলসন মর্লে-র পরীক্ষাটা বুঝে নেওয়া সহজ হবে। উদো-বুধোর বদলে এবার রেস লড়বে এক যমজ আলোকরশ্মি। বাতাসের বদলে এবার মাপতে হবে 'ঈথারের প্রবাহ'।

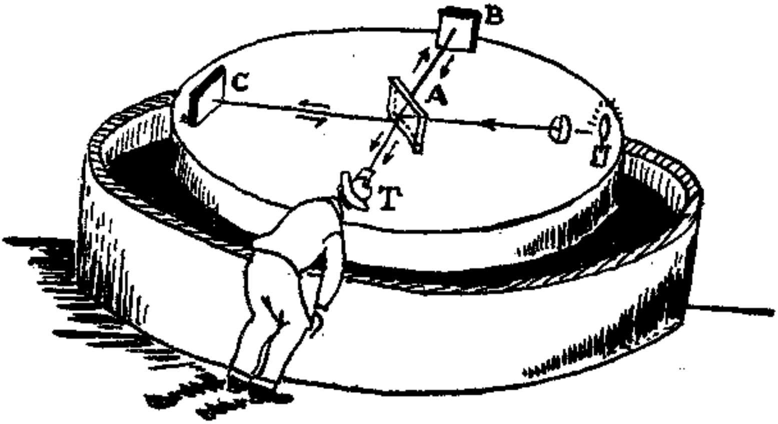


চিত্র—১৩

মাইকেলসন-মর্লের যন্ত্রটির নাম 'ইণ্টারফেরোমিটার'। উঁনি স্থির করলেন একটি আলোকগুচ্ছকে (beam of light) দু ভাগে ভাগ করে দু দিকে পাঠাবেন। চিত্র—১৪ তে আলোকগুচ্ছ উৎস থেকে রওনা হয়ে A চিহ্নিত কাঁচের উপর এসে পড়ল। ঐ A কাঁচটা অর্ধেক আয়না, অর্ধেক স্বচ্ছ কাঁচ। ফলে অর্ধগুচ্ছ আলো চলে গেল C চিহ্নিত দর্পণের দিকে স্বচ্ছ কাঁচ ভেদ করে, এবং বাকী অর্ধেক চলে গেল B চিহ্নিত দর্পণের দিকে। দুটি আলোকগুচ্ছই যথারীতি দর্পণে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে এল কেন্দ্রস্থ A-তে। এবার প্রথম গুচ্ছটি A দর্পণে প্রতিফলিত হয়ে পৌঁছালো T-তে ; দ্বিতীয় আলোকগুচ্ছও ফিরে এল T-তে। T বস্তুত একটি টেলিস্কোপ।

আমাদের উদো-বুধোর ক্ষেত্রে এয়ারোপ্লেনের গতিবেগ আর বাতাসের গতিবেগে বিশেষ ফারাক ছিল না। উড়োজাহাজ যাচ্ছিল ঘণ্টায় হাজার কি. মি. বাতাস একশ কি. মি.। অর্থাৎ দশ ভাগের এক ভাগ মাত্র। এবার আলোর গতি প্রতি-সেকেন্ডে ৩,০০,০০০ কিলোমিটার এবং ঈথার-তরঙ্গের আপেক্ষিকে

পৃথিবীর গতি মাত্র ৩০ কিলোমিটার—যেহেতু পৃথিবী ঐ গতিতে সূর্য প্রদক্ষিণ করছে। তা হোক, যন্ত্রটা এতই নিখুঁত যে, এক্ষেত্রে আলোক তরঙ্গদ্বয়ের নিজ নিজ পথ অতিক্রম করতে হিসাবমত যতটুকু সময়ের পার্থক্য হবার কথা তা ইণ্টারফেরোমিটারে ধরা পড়বে। আলোর গতিবেগ যদি মাত্র একশ মিটার পরিমাণ কমে যেত তাহলেও ঐ সূক্ষ্ম যন্ত্রে ধরা পড়ত। কিন্তু কিমাশ্চর্যমতঃপরম্! কোন ফারাক ধরা গেল না। যন্ত্রটাকে নানা দিকে ঘুরিয়ে, পৃথিবীর বিভিন্ন



চিত্র—১৪

প্রান্তে বিভিন্ন সময়ে বারে বারে পরখ করে দেখা গেল, সামান্যতম হেরফেরও ধরা পড়ছে না। আলো-উদো এবং আলো-বুধো প্রতিবারই ঠিক এক সময়ে ফিরে আসছে—ঈথার-সমুদ্রে পৃথিবী কোন্ মুখে চলেছে তার তোয়াক্কা না করে!

বিজ্ঞানীরা মহা ফাঁপড়ে পড়লেন। তাঁদের সামনে তখন দুটি বিকল্প পথ: হয় মেনে নাও ঈথার বলে কিছু নেই। তার মানে, ইতিপূর্বে ইলেকট্রোম্যাগ্নেটিক তরঙ্গ, আলো, মহাজাগতিক রশ্মি ইত্যাদি বিষয়ে যেসব সিদ্ধান্ত নিয়েছিলে তা ছেঁড়া-কাগজ-ফেলার ঝুড়িতে ফেল। না-হলে কোপার্নিকাস্-এর সিদ্ধান্তটা বাতিল করে বল—পৃথিবী স্থির, সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্রের দল পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে। অনেক পদার্থবিদ বললেন, এই দ্বিতীয় মতটাই মেনে নেওয়া বরং সহজ—কারণ ঈথার নেই অথচ মহাকাশ পাড়ি দিয়ে আলো আসছে—এটা ভাবাই যায় না!

ওঁদের চিন্তাধারা আর একটু খতিয়ে দেখা যাক বরং:

মাইকেলসন মর্লের পরীক্ষা ব্যর্থ হল কেন? ঈথারের অস্তিত্ব ঐ পরীক্ষায় কেন ধরা পড়ল না এ নিয়ে বিজ্ঞানী মহলে নানান্ জল্পনা শুরু হল—সেকথা আগেই বলেছি। যদি ধরে নেওয়া যায়—ঈথার আদৌ নেই তাহলে অবশ্য একটা ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায়, কিন্তু ঈথারের অস্তিত্ব বিষয়ে বিজ্ঞানীরা তখন এতই স্থির-বিশ্বাসী যে, সে মতটা মেনে নেওয়া চলে না—মেনে নিলে যে আবার নতুন জাতের সমস্যা দেখা দেয়: আলোক-তরঙ্গের মাধ্যম তাহলে পাব কোথায়?

অনেক বিবেচনা করে বিজ্ঞানীরা ঐ পরীক্ষার ব্যর্থতার হেতু হিসাবে চার জাতের ব্যাখ্যা দাখিল করলেন। প্রথম মতটা সরল: মেনে নাও পৃথিবী ঈথারের ভিতর স্থির আছে, আর যাবতীয় গ্রহ-উপগ্রহ-নক্ষত্র-নীহারিকা ঈথার-তরঙ্গে ভেসে চলেছে। তাহলে ব্যর্থতার একটা যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা দেওয়া যায় বটে, কিন্তু এ যেন সেই প্রাক-কোপারনিকাস যুগে ফিরে যাওয়া! আসলে পৃথিবী তো সূর্যের একটি গ্রহ মাত্র—বিশ্ব-ব্যাপারের কেন্দ্রস্থলে বিশেষ ক্ষমতা নিয়ে সে সিংহাসনে আরূঢ়,—এটা কেমন করে মেনে নিই? ঈথার-তরঙ্গে সব কিছুই যদি ভাসমান হয় তবে পৃথিবীকেও দুর্গা বলে ভেসে পড়তে হবে।

কেউ কেউ বললেন, এমন যদি মনে করি, পৃথিবী তার চতুর্পার্শ্বস্থ ঈথারকে টেনে নিয়ে চলেছে? সেক্ষেত্রেও তো ঈথার-প্রবাহ পৃথিবী থেকে বোঝা যাবে না, কিন্তু ইংরাজ বৈজ্ঞানিক ব্র্যাডলে ইতিপূর্বেই দেখিয়েছেন,—ছয় মাস আগে-পিছে পৃথিবী থেকে নক্ষত্রের আলো দূরবীনে ধরতে হলে দূরবীনটাকে কিছু বাঁকাতে হয়। যাকে বলে 'অ্যাবারেশন' (aberration)। পৃথিবী যদি ঈথারকে তার সাথে টেনে নিয়ে যেত—মটোরগাড়ির ভিতরকার বাতাস যে-ভাবে মটোরগাড়ির সঙ্গেই ছোটে, তাহলে নক্ষত্রের 'অ্যাবারেশন' বলে কিছু থাকতো না। কিন্তু সেটা আছে—পরীক্ষিত সত্য; তাই ও মতটা টিকল না।

তৃতীয় মতাবলম্বীরা বললেন, ধর যদি এমন হয়, ইণ্টারফেরোমিটার যন্ত্রটা ঈথার-সমুদ্রে পৃথিবীর সঙ্গে যেদিকে যত জোরেই ভেসে চলুক আলোর গতি সেই যন্ত্রের আপেক্ষিকে সর্বদাই অপরিবর্তিত থাকবে। তা যদি মানি, তবে মেনে নিতে হয়, ঈথার-তরঙ্গের সঙ্গে আলোর গতি হবে এক-এক সময় এক-এক রকম। উদো-বুধোর রেসের সঙ্গে তুলনা করে বলতে হয়—বাতাস যত জোরে যেদিক থেকেই বইতে থাক দুই বৈমানিকের গতিবেগ কখনও হের-ফের হবে না। এই ব্যাখ্যা মেনে নিলেও পরীক্ষার ব্যর্থতার একটা হদিস মেলে কিন্তু এর চেয়ে যে 'ঈথার নেই' মেনে নেওয়াই ভাল ছিল। কারণ 'ঈথার'কে যে কল্পনা করা হয়েছিল আলোর মাধ্যম হিসাবে—মাধ্যমের ধর্ম হচ্ছে তার সঙ্গে তরঙ্গের গতিবেগের কোন হেরফের হবে না। শব্দ তরঙ্গের উদাহরণটা বিবেচনা করে দেখুন না কেন? শব্দ-তরঙ্গের গতিবেগ তো উৎসের গতি-নিরপেক্ষ। উৎসমুখ যেদিকেই থাক, যত জোরেই থাক, শব্দ-তরঙ্গের গতিবেগের কোন হেরফের হবে না। রেল ইঞ্জিন স্টেশনের দিকে এগিয়েই আসুক অথবা পিছিয়েই যাক তার সিটির শব্দ একই বেগে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়বে—শব্দের তীক্ষ্নতা (pitch) বাড়তে পারে, গতিবেগ নয়। বাস্তবিকপক্ষে আলোর ক্ষেত্রেও যে অনুরূপ ঘটনা ঘটেছে তার প্রমাণ মেলে একটি বিশেষ-জাতের নক্ষত্রের দিকে তাকালে। যাকে বলি যুগ্মতারকা; যেমন আমাদের আকাশের সব চেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্র লুব্ধক। ঐ নক্ষত্র আসলে এক জোড়া নক্ষত্র—তারা যেন হাত-ধরাধরি করে পাক খাচ্ছে। একটা ডাম্বেল পাক খেতে খেতে আকাশে ঘুরলে যেমন হয়। এক্ষেত্রে ঘূর্ণ্যমান নক্ষত্র-যুগলের একটি যখন আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে তখন দ্বিতীয়টি আমাদের কাছ থেকে পিছিয়ে যাচ্ছে। ঐ তিন নম্বর ব্যাখ্যাটা যদি মেনে নেই—

অর্থাৎ ধরে নিই আলোর গতি নির্ভর করছে তার উৎসের গতির উপর, তাহলে আমরা সেই আইনটা ঐ যুগ্মতারকায় প্রতিফলিত হতে দেখতাম—যে নক্ষত্রটি এগিয়ে আসছে তার গতিবেগ বেশি বলে মনে হত, যেটি পিছিয়ে যাচ্ছে সেটির চেয়ে। বাস্তবে তা আমরা দেখতে পেলুম না। অর্থাৎ তিন নম্বর যুক্তিটা ধোপে টিকল না।

এবার চতুর্থ যুক্তি। সেটা পেশ করলেন উনবিংশ শতাব্দীর শেষাশেষি, বস্তুত ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে, ফিট্‌জেরাল্ড এবং লরেন্‌ৎজ। প্রমাণ দিতে পারলেন না, দিলেন একটি প্রকল্প (hypothesis); অর্থাৎ সম্ভাব্য যুক্তি। থিওরিটার নাম 'ফিট্‌জেরাল্ড-লরেন্‌ৎজ-সংকোচন প্রকল্প' (Fitzgerald-Lorentz Contraction Hypothesis)। যেহেতু সেটি আমাদের আপেক্ষিকতাতত্ত্বের দু নম্বর ভগীরথ তাই সেটাকে ভাল ভাবে বুঝে নিতে হবে।

ফিট্‌জেরল্ড-লরেন্‌ৎজ সংকোচন: এই মতের মূল তত্ত্বটা হল—ঈথার-সমুদ্রে প্রতিটি বস্তু গতিমুখের দিকে সংকুচিত হয়ে যায়। না হবে কেন? রবারের বল যখন দেওয়ালে আহত হয় তখন সে চেপ্টে যায়, গোল টম্যাটো মেঝেতে পড়ে থেঁৎলে যায়। ঠিক তেমনি ভাবে—ওঁরা বললেন, ঈথারের প্রত্যাঘাতে প্রতিটি বেগবান বস্তু গতিমুখের দিকে কিছুটা সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে। এটা যদি মেনে নেওয়া যায় তাহলে মাইকেলসন-মলের ব্যর্থতার কারণটাও খুঁজে পাব। কারণ এখন বলতে পারা যাবে যে, ইণ্টারফেরোমিটার যন্ত্রের চোঙাটা ঈথারের প্রতিবন্ধকতা ভেদ করে এগিয়ে যাবার সময় কিছুটা সংকুচিত হয়েছে বলেই এমনি ঘটেছে। উদো-বুধোর রেসের উদাহরণ নিয়ে এবার বলব—বাতাসের প্রতিবন্ধকতায় ওদের গন্তব্যস্থলের দূরত্বটাই এমন ভাবে সংকুচিত হয়ে গেল—যাতে দুজনে একই সময়ে ফিরে আসবে। ফিট্‌জেরাল্ড অংক কষে গতি রসঙ্গে সংকোচনের ঐ পরিমাণটা মেপে একটা ফর্মুলা দাখিল করলেন; অর্থাৎ কতটা বেগে গেলে কতটা সংকুচিত হবে। উনি আরও বললেন, এই সংকোচন চলমান বস্তুর কাঠিন্যের উপর মোটেই নির্ভর করবে না—লোহা, কাঠ ও রবার এই কারণে একই ভাবে সংকুচিত হবে—তার পরিমাণটা নির্ভর করবে শুধুমাত্র তার গতিবেগের উপর।

প্রশ্ন হতে পাবে—থিওরি কেন, সংকুচিত হচ্ছে কি হচ্ছে না সেটা মেপে দেখলেই হয়। বাস্তবে তা সম্ভবপর নয়। কারণ থিওরি অনুযায়ী ফুটরুলটাও যে সংকুচিত হয়ে গেছে—মেপে ফারাকটা বার করব কেমন করে? এ যেন বলা—চোখ বুজলে আয়নায় তোমার মুখখানা বাঁদরের মত দেখতে লাগে। অপ্রমাণ করবে কি করে?

ব্যাপারটা কেমন যেন অবিশ্বাস্য লাগছে না? লোহা আর রবার একই রকমভাবে সংকুচিত হবে? কেন? না, যেহেতু ঈথার প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াচ্ছে—যে ঈথারের না আছে ওজন, না আকার, না কোনও কাঠিন্য। যেহেতু মেপে দেখাতে পারছি না তাই ঐ অদ্ভুত যুক্তিটা মেনে নিতে হবে? চোখ বন্ধ অবস্থায় আমার প্রতিবিম্ব যে জীব-বিশেষের মত আয়নায় দেখা যায় না এটা দেখতে পারছি

না বলেই মেনে নেব ?

কিন্তু না মেনে নিলে মাইকেলশন-মর্লের পরীক্ষার ব্যর্থতাটা ব্যাখ্যা করব কেমন করে ?

বস্তুত গত শতাব্দীতে ঐ 'ফিট্জেরাল্ড-লরেন্ৎজ-সংকোচন' থিওরিটা কেউ প্রমাণও করতে পারেননি, অপ্রমাণও নয়।

উনবিংশ শতাব্দী শেষ হল সমস্যাটা অমীমাংসিত অবস্থাতেই। বিজ্ঞানীরা ঈথারের অস্তিত্ব তখনও মেনে নিতে ইচ্ছুক—যদিও তার প্রমাণ পাওয়া যায়নি। আর কেন তার প্রমাণ পাওয়া গেল না তার কোনও সন্তোষজনক জবাব নেই। তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়ালো ? ঈথার আছে, না নেই ? যদি থাকে, তবে কোন ভাবেই তার অস্তিত্ব প্রমাণিত হচ্ছে না কেন ? যদি না থাকে—তবে আলো এবং অন্যান্য ইলেক্ট্রোম্যাগ্নেটিক তরঙ্গের মাধ্যম কী ?

এজাতীয় সমস্যার সমাধান নাকি করতে পারতেন পরশুরামের মৃত্যুঞ্জয়ী চরিত্র মহেশবাবু। তিনি নাকি অঙ্ক কষে প্রমাণ করেছিলেন ঈশ্বর $= 0$; আত্মা $=$ ভূত $= \sqrt{0}$। ঈথারের অস্তিত্ব নিয়ে তিনি কোন পরীক্ষা করেছেন বলে জানি না।

এভাবেই গত শতাব্দীর শেষ হল। সমাধান পাওয়া গেল বিংশ শতাব্দীর একেবারে প্রথমেই। পরশুরাম রসিকতা করে যা বলেছেন প্রায় সেই জাতীয় জিনিসই বাস্তবে ঘটল। এক ভদ্রলোক হাতীর শুড়ের মত চিহ্ন এঁকে স্রেফ অঙ্ক কষে সমস্যাটার সমাধান করে দিলেন। ভদ্রলোকের নাম—প্রফেসর আলবার্ট আইনস্টাইন।

॥ দুই ॥

বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের মূলতত্ত্ব

বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ-তত্ত্বের মূল সূত্রদ্বয় আগেই বলেছি, আইনস্টাইনের আবিস্কারকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। তার প্রথমটি হচ্ছে বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ বা "স্পেশাল থিওরি অব রিলেটিভিটি"। এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, যে দুটি বস্তুর মধ্যে আপেক্ষিকতা মাপা হবে তারা অপরিবর্তিত গতিতে সরলরেখায় সঞ্চরণশীল। গতির যদি হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে তবে তা তাঁর দ্বিতীয় থিওরির-অন্তর্ভুক্ত হবে। অর্থাৎ বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ সেক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যেখানে দুটি বস্তুর গতি সরলরেখায় এবং আপেক্ষিক গতি অপরিবর্তিত। গতিবেগ সেখানে বাড়ছে বা কমছে, যাকে বলি ত্বরণ,—যেমন আকাশের দিকে ছুঁড়ে দেওয়া কোনও বলের—সেখানে দ্বিতীয় থিওরিটা প্রযোজ্য হবে। শেষ থিওরিটা সর্ব-বিজ্ঞান-শাস্ত্রের সমন্বয় প্রচেষ্টা। বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের দুটি মূল সূত্র। তার প্রথমটি হচ্ছে সরল ভাষায়: **ঈথারের অস্তিত্বটা কোন-ভাবেই প্রমাণ করা যাবে না।** 'কেন যাবে না' সেটা আলোচনা করার আগে আসুন, আমরা দু-একটা উদাহরণ নিয়ে পরখ করি। মনে করুন, রেলগাড়িতে যেতে যেতে আপনার ঝিমুনি আসছিল। চট্কা ভাঙতেই জানালা দিয়ে দেখতে

গেলেন—একটা প্যাসেঞ্জার গাড়ি বিপরীত দিকে চলেছে। আপনার বগির স্প্রিং যদি ভাল থাকে তাহলে আপনি বলতে পারবেন না—কোন গাড়িটা যাচ্ছে আর কোনটা থেমে আছে। সেটা বুঝে নেবার একমাত্র উপায় হল জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে কোন স্থির বস্তুকে পরখ করা—গাছ বা টেলিগ্রাফের পোস্ট। এবার মনে করুন ঐ স্থির বস্তু আপনার কাছেপিঠে একটাও নেই—যেমন ধরুন, আপনি মহাকাশের যাত্রী; রকেটে চড়ে মঙ্গল গ্রহে চলেছেন। জানলা দিয়ে হয়তো চাঁদ, সূর্য, পৃথিবীকে দেখতে পাচ্ছেন—কিন্তু তারা তো কেউ স্থির নয়। এই সময়ে যদি আপনি জানলা দিয়ে দেখেন, আর একটি রকেট আপনার পিছন থেকে ক্রমশঃ এগিয়ে এসে আপনাকে অতিক্রম করে গেল, তাহলে নিজ গতিবেগ জানা না থাকলে আপনি বলতে পারবেন না তার গতিবেগ কত। মনে করুন, আপনি অঙ্ক কষে বার করলেন, সে প্রতি ঘণ্টায় আপনাকে এক হাজার কিলোমিটার ছাড়িয়ে যাচ্ছে। বেশ, তাতেই বা কি? তার অসংখ্য বিকল্প সমাধান হতে পারে:

আপনার গতিবেগ ঘণ্টায় ৫০০০ কি. মি. হলে ওর হচ্ছে ৬.০০ কি মি.;
আপনার গতিবেগ ঘণ্টায় ৬০০০ কি মি. হলে ওর হচ্ছে ৭০০০ কি মি;
আপনি যদি মহাশূন্যে স্থির থাকতেন তবে ওর গতিবেগ ১০০০ কি. মি.
এবং আপনি যদি ব্যাক-গিয়ারে ঘণ্টায় হাজার কি মি. যান ও স্থির আছে।

তাহলে? বস্তুত কোন স্থির বস্তুর হদিস যতক্ষণ না পাচ্ছেন ততক্ষণ বলতে পারছেন না—কে কত জোরে বা কোন্ দিকে যাচ্ছে। এ থেকেই আইনস্টাইন বললেন সব গতিই আপেক্ষিক। ঐ থেকেই তত্ত্বটার নাম আপেক্ষিকতাবাদ। বস্তুত কোন বস্তুর নিজস্ব গতি বলে কিছু নেই, গতি মাত্রেই আপেক্ষিক—কারও সঙ্গে তুলনামূলক বিচার মাত্র করা চলবে। কোন একটা বস্তুর গতি 'এত' এ-কথার কোনও মানে নেই—বলতে হবে অমুক বস্তুর পরিপ্রেক্ষিতে এই বস্তুর গতি 'এত'। যেহেতু আমরা পৃথিবীতে বাস করি তাই ঐ মূল তত্ত্বটা খেয়াল করি না। আমরা যখন দেখি রেড রোডে নোটিশ ঝুলছে 'ঘণ্টায় ৪০ কি. মি. গতিসীমা' তখন বুঝে নিই সেটা পৃথিবীর কোন স্থির বস্তুর আপেক্ষিকে। কিন্তু পুলিশ কমিশনার সাহেব মহাশূন্যে ঐ নোটিশ টাঙালে তা নিরর্থক হবে; তাঁকে বলতে হবে কার আপেক্ষিকে ঐ সর্বোচ্চ গতিসীমা।

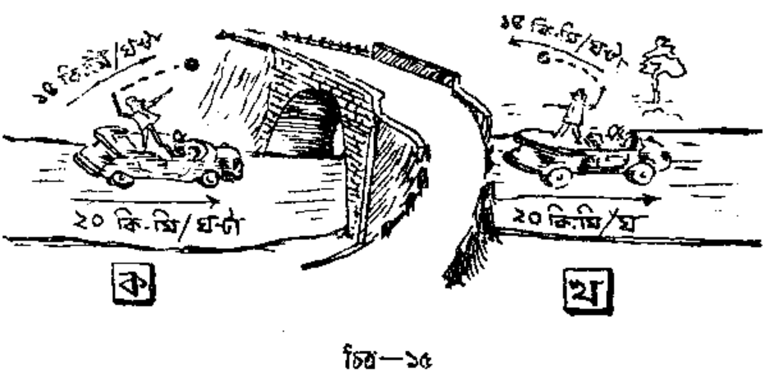
মজা হচ্ছে মহাশূন্যে স্থির বস্তু কোন কিছুই নেই। পৃথিবী দরবেশী নাচের ভঙ্গিতে নিজ অক্ষের চারদিকে ঘুরতে ঘুরতে সূর্য প্রদক্ষিণ করছে; সূর্য এই গ্যালাক্টিক-সিস্টেমে পাক খাচ্ছে; গোটা গ্যালাক্টিক সিস্টেম আবার আবর্তিত হতে হতে একদিকে ছুটে চলেছে। সমস্ত বিশ্ব-প্রপঞ্চ গতির ছন্দে আবদ্ধ—কেউ স্থির নেই। বিশ্বের কেন্দ্রবিন্দু বলে কিছু নেই। কোন কিছুই গতিহীন হতে পারে না। সবাই চলেছে পরস্পরের সঙ্গে আপেক্ষিক বেগে। কিন্তু তা থেকে কেমন ভাবে প্রমাণিত হবে যে, ঈথারের অস্তিত্ব কিছুতেই প্রতিষ্ঠা করা যায় না? যাবে এইভাবে; ঈথার যদি থাকে এবং স্থির হয়ে থাকে তবে তা আমরা মেপে বার করতে পারব না—কারণ আমরা আপেক্ষিক গতিই শুধু মাপতে সক্ষম। নিউটন অনেক আগে বলেছিলেন, জাহাজটা এগিয়ে চলেছে না স্থির হয়ে আছে

তা জাহাজের ভিতরে বসে কোন যন্ত্রের সাহায্যেই মেপে বলা যাবে না। শুধু নিউটনের সময়ে নয়, আজও বিজ্ঞান এমন কোন যন্ত্র বার করতে পারেনি যাতে বাইরের কোন সাহায্য না নিয়ে জাহাজের রুদ্ধদ্বার কেবিনে বসে তার গতিটা পরিমাপ করা যায়। অনুরূপভাবে বলব, ঈথার যদি আদৌ থাকে তবে তথাকথিত স্থির-ঈথার সমুদ্রে পৃথিবীর গতি আমরা মেপে বার করতে পারব না, কারণ আমরা যে ঐ পৃথিবীতেই বাস করছি। পৃথিবীনামক জাহাজের রুদ্ধদ্বার কেবিনে!

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভাল—আইনস্টাইন কিন্তু ঈথারের অস্তিত্ব স্বীকার বা অস্বীকার করেননি; শুধুমাত্র বলেছেন—থাকলেও তার অস্তিত্ব প্রমাণ করা অসম্ভব। তাঁর বিভিন্ন থিয়োরিতে ঈথার-প্রসঙ্গ আর ওঠেনি—সেটা আছে কি নেই সে কথাও যেন বাহ্য।

ওঁর দ্বিতীয় সূত্রটি হল **আলোকের গতি পর্যবেক্ষকের গতির সঙ্গে সম্পর্ক বিমুক্ত**। এই উক্তিটি আরও বিপ্লবাত্মক। এর ধাক্কাটা বোঝা যাবে একটা উদাহরণ নিয়ে আলোচনা করলে:

মনে করুন—একটি ছেলে ঘণ্টায় পনের কিলোমিটার বেগে একটা ক্রিকেট বল ছুঁড়ল। তার অর্থ—বলটা ছেলেটিকে অতিক্রম করে যাবে ঘণ্টায় পনের কিলোমিটার দূরত্বে, তা সে দাঁড়িয়েই থাকুক অথবা গতিশীলই হক। মনে করা যাক, এবার ছেলেটি একটা হুড-খোলা গাড়ির উপর দাঁড়িয়ে (চিত্র—১৫ ক-র ভঙ্গিতে) ঐভাবে বল ছুঁড়ল গাড়িটা যখন ঘণ্টায় ২০ কি. মি বেগে ব্রীজের দিকে যাচ্ছে। তাহলে ছেলেটির আপেক্ষিকে বলটার গতিবেগ ঘণ্টায় পনের কি মি. হলেও সেটা ব্রীজের গায়ে গিয়ে আঘাত করবে (১৫+২০)=৩৫ কি মি.



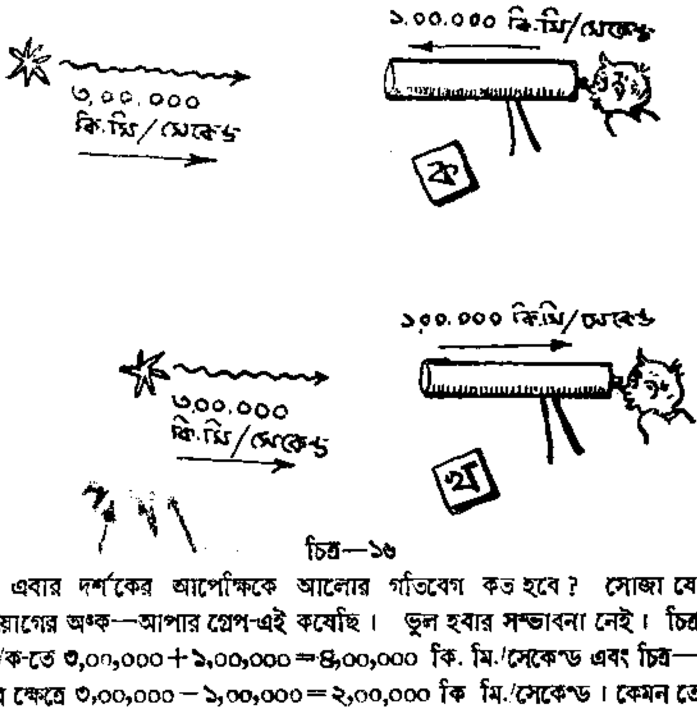
চিত্র—১৫

বেগে। কিন্তু যদি মনে করি, গাড়িটা ব্রীজ পার হয়ে যাবার পর ছেলেটি পিছন ফিরে বলটা ছুঁড়ছে (চিত্র—১৫ খ) তখন বলটা ব্রীজের গায়ে গিয়ে আঘাত করবে (১৫—২০) = –৫ কি মি বেগে। তার মানে বলটা কোনদিনই ব্রীজের গায়ে গিয়ে আঘাত করবে না। গাড়ির পিছু পিছু ৫ কি মি বেগে ছুটতে থাকবে।

এবার আমরা ঐ ছেলেটির পরিবর্তে একটা নক্ষত্রকে কল্পনা করব, ব্রীজটা এক্ষেত্রে পৃথিবীতে অবস্থিত একটি দূরবীন এবং ক্রিকেট বলটি একটি আলোক-

তরঙ্গ। এক্ষেত্রে নক্ষত্রটা যেন এই আলোক-তরঙ্গটাকে সেকেণ্ডে ৩০০,০০০ কি.মি. বেগে "ছুঁড়ে দিল"।

পূর্বোক্ত উদাহরণে ছেলেটির গতি ব্রীজের আপেক্ষিক ছিল ঘণ্টার ২০ কি. মি —একবার এ-মুখো একবার ও-মুখো ; এবারও আমরা কল্পনা করব নক্ষত্রের আপেক্ষিকে পৃথিবীর গতি সেকেণ্ডে ধরুন ১০০,০০০ কি. মি. একবার এ-মুখো একবার ও-মুখো—যেমন আঁকা হয়েছে চিত্র—১৬ ক ও খ-য়ে।



চিত্র—১৬

এবার দর্শকের আপেক্ষিকে আলোর গতিবেগ কত হবে? সোজা যোগ-বিয়োগের অংক—আপার গ্রেপ-এই কষেছি। ভুল হবার সম্ভাবনা নেই। চিত্র—১৬/ক-তে ৩,০০,০০০ + ১,০০,০০০ = ৪,০০,০০০ কি. মি./সেকেণ্ড এবং চিত্র—১৬ খ-র ক্ষেত্রে ৩,০০,০০০ − ১,০০,০০০ = ২,০০,০০০ কি মি./সেকেণ্ড। কেমন তো?

আমাদের নন্না কিণ্ডারগার্টেন স্কুলের 'মিস' ঘ্যাচ্ঘোচ্ করে অংক দুটো কেটে দিলেন। কী ব্যাপার? দিদিমণি বললেন—এখনই কী শিখিয়েছি? আমার দ্বিতীয় সূত্র বলছে না—'আলোর গতি পর্যবেক্ষকের গতির সঙ্গে সম্পর্কবিমুক্ত?'

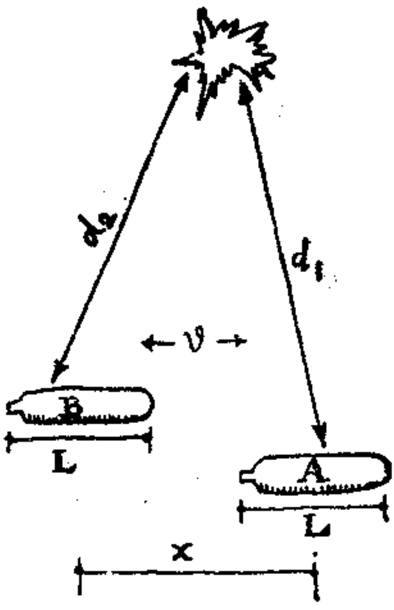
এ কী অশাস্ত্রীয় কথা রে বাবা? সহজ যোগ-বিয়োগের অংক মানবে না? 'দুয়ে দুয়ে চার হয়' এ কথাটাও তর্ক করে উড়িয়ে দেবে নাকি? তাই দেবে। শিব্রাম চক্রবর্তীই বলেছেন, 'দুয়ে দুয়ে চার হয়, আবার তেমন তেমন গরু পেলে দুয়ে দুয়ে দুধও হয়!' আইনস্টাইন তাঁর স্পেশাল থিয়োরিতে দুয়ে দুয়ে খাঁটি দুধই বানালেন! ইউনিফায়েড ফিল্ড থিওরিতে সেই দুধ জ্বাল দিয়ে ঘন ক্ষীরও তৈরী করলেন। দল বেঁধে ফুচ্কা খেতে অভ্যস্ত তোমার-আমার পাকস্থলী যদি সে ক্ষীর হজম করতে না পারে তবে দোষ আমাদের পাকস্থলীর—ঐ খাঁটি ক্ষীরের নয়।

রসিকতা থাক ; নিঃসন্দেহে আইনস্টাইনের এই দ্বিতীয় সূত্রটা বিপ্লবাত্মক

চিন্তাধারার জনক। আমাদের আবহমান কালের ধ্যান-ধারণা যেন তিনি এক পরমাণু-বোমার বিস্ফোরণে উড়িয়ে দিলেন। বললেন, দুটি ক্ষেত্রেই আলোর গতি অপরিবর্তিত থাকবে—সেই গতি প্রতি সেকেন্ডে ৩,০০,০০০ কিলোমিটার।

মূল সূত্রদ্বয় থেকে লব্ধ সিদ্ধান্ত : এবার আমরা খতিয়ে দেখব, ঐ দুই মূল সূত্রের নিরিখে বস্তুর গুণে—বিশেষ করে যে গুণগুলিকে দার্শনিক লক বস্তুর অন্তর্নিহিত প্রাথমিক গুণ বলেছিলেন—সেগুলি কী রূপ নিচ্ছে, বস্তুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, ভর (mass) তার সময়ের ধ্যান-ধারণা। একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। মনে করা যাক, একজোড়া হুবহু একই জাতের দুটি মহাকাশযান বা রকেট, A এবং B মহাকাশ পাড়ি দিচ্ছে। তাদের ওজন, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, ভর সবই সমান এবং তারা একই মুহূর্তে রওনা হল—কিন্তু A-এর গতি কিছু বেশি, ধরা যাক তাদের আপেক্ষিক গতি হচ্ছে v। আর মনে করা যাক, ওরা যে মুহূর্তে রওনা হল ঠিক তখনই আকাশে একটা নক্ষত্রের বিস্ফোরণ ঘটল। যেহেতু আলোকরশ্মি ওদের কাছে এসে পৌঁছাতে কিছুটা সময় লাগবে তাই ওরা তখনই তা দেখতে পেল না। ধরা যাক, যে সময়ের ব্যবধানে ওরা নক্ষত্রের বিস্ফোরণ প্রত্যক্ষ করল সেটার মাপ t। সেই সময়ের মধ্যে A তার সহযাত্রী B-কে x পরিমাণ দৈর্ঘ্য ছাড়িয়ে এসেছে। চিত্র—১৭ তে ব্যাপারটা এঁকে দেখানো হয়েছে।

ফিট্‌জেরাল্ড ইতিপূর্বেই বলেছিলেন, এক্ষেত্রে রকেট দুটির দৈর্ঘ্য কমে যাবে—যেহেতু তারা স্থির নয়, ঈথার সমুদ্রে এগিয়ে যাচ্ছে। লরেন্‌ৎজ সেই সঙ্কোচনের পরিমাপটাও একটি প্রমাণহীন কল্পিত ফর্মুলায় (hypothetical formula) কষে বলে দিতে পেরেছিলেন। আইনস্টাইন বললেন, ওঁদের হিসাবটা ঠিকই ছিল। তিনি তার প্রমাণও দাখিল করলেন—প্রমাণ অর্থে তিনি এ বিশ্ব-প্রপঞ্চের জন্যে কতকগুলি ফর্মুলা নির্দেশ করলেন; বললেন—'স্থান ও কাল' পরস্পর সংপৃক্ত। প্রতিটি বস্তু—মহাকাশের দানব তারকা থেকে পরমাণুর অভ্যন্তরস্থ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সব কিছু সেই অপরিবর্তনীয় আইন মেনে চলে। কেন চলে? এটাই জগতের ধর্ম। এটাই বিশ্ব ব্যবস্থার মূল সূত্র। নিউটন



চিত্র—১৭

মাধ্যাকর্ষণের 'কারণ' নির্দেশ করতে পারেননি, তার 'কার্য-কারণ সম্পর্ক' বিধি-

বন্ধ করেছিলেন ; বলেছিলেন—এইটাই হচ্ছে জগতের ধর্ম। আইনস্টাইন আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে গেলেন। জগৎ-ব্যবস্থার মূল ধর্মটির আরও কাছাকাছি গিয়ে কতকগুলি সূত্র দিলেন। 'কেন' তা তিনিও বলতে পারেননি ; 'কেমন করে' 'কী নিয়মে' তা বলতে পেরেছিলেন।

এবারে আমরা দেখব তাঁর সূত্রে বস্তুর মূল গুণগুলি কীভাবে পরিবর্তিত হল :

(ক) **দৈর্ঘ্যের সংকোচন** : চিত্র—১৭-তে উল্লিখিত মহাকাশযানে অবস্থিত বৈমানিকদ্বয় যদি তাঁদের নিজ নিজ রকেটের দৈর্ঘ্য মেপে দেখেন তাহলে দেখবেন তা অপরিবর্তিতই আছে—সেই L পরিমাণ দীর্ঘ। কিন্তু ওদের আপেক্ষিক গতি যখন v তখন A যদি কোন যন্ত্রের সাহায্যে B-র দৈর্ঘ্য মাপতে পারত তবে দেখতো B র দৈর্ঘ্য কিছুটা কমে গেছে। সেই সংকোচনের পরিমাপটা পাওয়া যাবে নিম্নোক্ত ফর্মুলা থেকে :

$$L' = L \times \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \qquad \cdots \text{(i)}$$

এখানে—L হচ্ছে ওদের প্রাথমিক দৈর্ঘ্য, v হচ্ছে আপেক্ষিক গতি, c আলোর গতি, (যা A অথবা B-র গতির উপর নির্ভরশীল নয়, সর্বদাই ৩,০০,০০০ কি. মি /সে.) এবং L' হচ্ছে A-র হিসাবমত B-এর দৈর্ঘ্য। একটা বাস্তব উদাহরণ নিলে কিছুটা ধারণা হবে। ধরা যাক, রকেটের প্রাথমিক দৈর্ঘ্য অর্থাৎ L = বিশ মিটার এবং ওদের আপেক্ষিক গতি, v = ১,৫০,০০০ কিলোমিটার/সেকেন্ড (মানে আলোর গতির আধাআধি)। সেক্ষেত্রে অংকটা কষলে আমরা দেখব L' = ১৭ মিটার ; তার মানে A-র কাছে B-র দৈর্ঘ্য ৩ মিটার কমে গেছে। আপেক্ষিক গতিটা যত বাড়বে L' ততই কমবে। v যদি হয় আলোর গতির শতকরা নব্বই ভাগ, অর্থাৎ ২,৭০,০০০ কি. মি /সেকেন্ড তাহলে হিসাবে দেখছি L' আরও কমে হচ্ছে দশ মিটার অর্থাৎ প্রাথমিক দৈর্ঘ্যের আধাআধি। ধরুন v যদি শূন্য হয়, অর্থাৎ আপেক্ষিক গতি না থাকে ? অঙ্কের হিসাবে তখন L = L' অর্থাৎ দৈর্ঘ্য অপরিবর্তিত থাকবে। এবারে বলুন তো ঐ 'v = ০' মানে কি ? আপেক্ষিত গতি নেই ? তা তো জানি, কিন্তু তারই বা অর্থ কি ? কী বললেন ? দুটোই স্থির আছে ? আজ্ঞে না। ভুল হল। এ দুনিয়ায় কিছুই স্থির নেই, v = ০ অর্থে দুটোই একই দিকে একই গতিতে যাচ্ছে।

প্রশ্ন হতে পারে, B যদি ঐ অবস্থায় A-র দৈর্ঘ্য মাপে, তবে কী দেখবে ? একই জিনিস দেখবে ; দেখবে A ঐভাবে সঙ্কুচিত হয়ে যাচ্ছে। অথচ A এবং B দুজনেই নিজ নিজ আকাশযানের দৈর্ঘ্য মেপে সব সময়েই ঐ বিশ মিটার পাবে, কারণ তাদের মাপকাঠিটাও যে ঐভাবে সঙ্কুচিত হয়ে গেছে।

আরও প্রশ্ন হতে পারে—তাই যদি হবে তাহলে এতদিন বিজ্ঞান সেটা টের পায়নি কেন ? জবাবে বলব—আপেক্ষিক গতি যতক্ষণ না আলোর গতির সঙ্গে তুলনীয় মান লাভ করছে ততক্ষণ বাস্তবে এ সংকোচন ধরা পড়ে না। একটা বাস্তব উদাহরণ দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করি। ধরুন একটা এয়ারোপ্লেন ঘণ্টায় ১২০০ কি. মি বেগে যাচ্ছে—এক্ষেত্রে ঐ ফর্মুলায় ফেলে দেখতে পারেন,

সঙ্কোচনের পরিমাণ এক মিলিমিটারের লক্ষ ভাগের কাছাকাছি।

অনেকক্ষণ অঙ্ক কষেছি, এবার একটু কাব্য আলোচনা হ'ক। ফিট্‌জেরাল্ডের ঐ দৈর্ঘ্যের সঙ্কোচন সম্বন্ধে সমসাময়িক এক ইংরাজ কবি যে লিমেরিকটি রচনা করেছিলেন এবার তা পাঠকদের উপহার দিই :

"There was a young fellow named Frisk
Whose fencing was exceedingly brisk :
So fast was his action,
The Fitzgerald contraction
Reduced his rapier to a disk."

ভাবার্থ অনুবাদ করে সাদা বাংলায় বলতে পারি

বাপ্‌রে কি চট্‌পটে পালোয়ান ভোম্বল,
বন্‌বন্‌, সাঁই সাঁই ঘোরাতো সে ডাম্বল ;
বিদ্যুৎগতি বেগে
ফিট্‌জেরাল্ড চাপ লেগে
ডাম্বেল চেপ্‌টিয়ে হল শেষে কম্বল !!

(খ) ভর (mass)-এর বৃদ্ধি : নিউটনের মতে—যে মত মেনে নিয়ে কয়েক শতাব্দী ধরে বিজ্ঞান অগ্রসর হয়েছে—কোন বস্তুর 'ওজন' নানা কারণে হ্রাসবৃদ্ধি প্রাপ্ত হতে পারে ; কিন্তু তার 'ভর' চিরকাল অপরিবর্তিত থাকবে। অর্থাৎ 'ভর' হচ্ছে বস্তুর নিজস্ব আদিগুণ—গরম করলে তার আয়তন বদলায়, চাঁদে নিয়ে গেলে তার ওজন বদলায়, কিন্তু বস্তুর ভর বা mass অপরিবর্তনীয়। আইনস্টাইন তাঁর নূতন সূত্রে বললেন, কথাটা ঠিক নয়। বস্তুর ভর তার আপেক্ষিক গতির উপর নির্ভরশীল। উপরের উদাহরণে যদি মনে করি দুটি আকাশযানের (যখন তাদের আপেক্ষিক গতি ছিল শূন্য) ভর (ওজনও) আদি অবস্থায় ছিল m, তাহলে এখন একে অপরের ভর (ওজনও) পাবে m' এই সূত্রে :

$$m' = m \div \sqrt{1 - v^2/c^2} \quad \cdots \text{(ii)}$$

ধরা যাক আদি অবস্থায় (যখন v = o) ওদের দুজনেরই ওজন ছিল ১০০০ কে. জি.। এখন যদি ওদের আপেক্ষিক গতি হয় আলোর গতির আধাআধি (১,৫০,০০০ কি মি./সে.) তাহলে m' হয়ে যাবে ১২০০ কে. জি। তার মানে A কোন যন্ত্রের সাহায্যে B-র ওজন মাপতে পারলে দেখবে যে, B-এর ওজন ২০০ কে. জি. বেড়ে গেছে। B-ও মাপতে পারলে দেখবে A-র ওজন ঐভাবে বেড়ে গেছে। ঐ ফর্মুলায় v = o হলে পাচ্ছি m' = m ; অর্থাৎ আপেক্ষিক গতি না থাকলে কেউ কারও ওজনে কিছু হেরফের পাবে না।

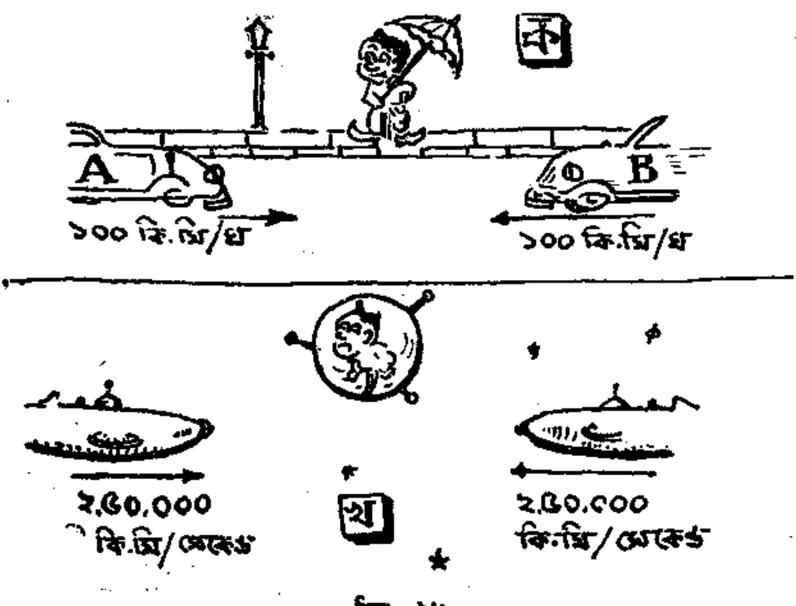
তার মানে কী দাঁড়ালো ? ওজন কমানোর জন্য যত ছোটাছুটি করব ততই ওজন বাড়বে ? হিসাব তো তাই বলছে। ফর্মুলায় ফেলে দেখেছি একজন দেড়শ কে. জি-র মেদের মৈনাক যদি ঘণ্টায় পঁচিশ কিলোমিটার বেগে দৌড়াতে পারেন (কল্পনা করতে পারছেন ?) তবে তাঁর ওজন এক গ্রামের লক্ষ ভাগের প্রায় এক ভাগ বেড়ে যাবে। আমাদের দুর্ভাগ্য, এমন কৌতুককর বিষয়টি নিয়ে

লেখা সেই ইংরাজ কবির কোন লিমেরিক খুঁজে পাইনি। আমি কিন্তু লোভ সামলাতে পারলুম না :

ভুঁড়ির খাঁজে চর্বি দেখে তম্বী মোদের স্বাতীদি
হুলা-হুলা নাচ নাচিতে গেলেন চলে তাহিতি।
নাচের 'গতি' বাড়ল যত
'ভর'-ভরাক্ত হলেন তত ;
নৃত্যশেষে তম্বী স্বাতী হলেন নিশ্ছিদ্র হাতীদি !

এখানে একটা কথা বলে রাখি—'ভর' বা mass বাড়ছে মানে আয়তন বাড়ছে না কিন্তু ; আকার যে কমছে তা তো আগেই বলেছি। পদার্থ বিদ্যা যাঁরা কিছুটা পড়েছেন তাঁরা হয়তো বলবেন—তবে কি বুঝব ঘনাঙ্ক (density বাড়ছে ? জবাবে বলব—আজ্ঞে হ্যাঁ।

(গ) আপেক্ষিক গতির বৃদ্ধি : ইতিপূর্বে চিত্র—১৬তে একটা অসঙ্গতির কোন কিনারা হয়নি। আপ্তবাক্যের মত তখন শুধু বলেছিলাম—কোন কিছুই ঐ আলোর গতি অর্থাৎ ৩,০০,০০০ কিলোমিটার সেকেন্ড কিছুতেই অতিক্রম করবে না। কিন্তু কোন্ ফর্মুলায় ? এবার সেই ফর্মুলাটা আমরা লিপিবদ্ধ



চিত্র—১৮

করব। ধরা যাক, দুটি গাড়ি A এবং B পরস্পরের দিকে ঘণ্টায় ১০০ কি মি. বেগে ছুটে আসছে (চিত্র—১৮ ক) আর যদুবাবু মাঝখানে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন (অশাস্ত্রীয় কিছু বলিনি, যদুবাবু দুই গাড়ি সমেত পৃথিবীর বাসিন্দা, যে পৃথিবী সেকেন্ডে ৩০ কিলোমিটার বেগে সূর্য প্রদক্ষিণ করছে ; সে কথা ঐ

হিসাবে আনছি না)। এক্ষেত্রে যদুবাবুর কাছে দুটি গাড়িরই আপেক্ষিক গতিবেগ ১০০ কি. মি ঘণ্টা। কিন্তু যে কোন গাড়ির ড্রাইভারের কাছে অপর গাড়ির আপেক্ষিক গতি ১০০+১০০=২০০ কি মি/ঘ। অঙ্কের সূত্রে এটাকে বলব:

$V_{AB}=V_A+V_B=$ ১০০+১০০=২০০/ঘ. ঐ অঙ্কে V_{AB} হচ্ছে A অথবা B-র আপেক্ষিক গতি অপর গাড়ির তুলনায়। V_A হচ্ছে স্থির বিন্দু যদুবাবুর তুলনায় A-র আপেক্ষিক গতি, V_B হচ্ছে যদুবাবুর তুলনায় B-র আপেক্ষিক গতি।

এইবার ধরা যাক যদুবাবুকে একটা চন্দ্রযানে তুলে মহাকাশে পাঠানো হয়েছে। যদুবাবু স্থিরই থাকুন আর গতিশীলই হ'ন তাঁর আপেক্ষিকে ধরা যাক A এবং B-র গতি যথাক্রমে V_A এবং V_B (চিত্রে $V_A=V_B=$ ২,৫০,০০০ কি. মি/সে.। এই অবস্থায় যদি A তার নিজের আপেক্ষিকে B-র গতি মেপে দেখে অথবা বা একই কথা, B তার নিজের আপেক্ষিকে A-র গতি মেপে দেখে, তখন আর উপরোক্ত সরল ফর্মুলা $V_{AB}=V_A+V_B$ নির্ভুল হবে না। আগেরটা মোটামুটি নির্ভুল ছিল যেহেতু চিত্র—১৮/ক তে মটোর গাড়ির গতিবেগ আলোর গতির তুলনায় ছিল অতি নগণ্য। এখন ফর্মুলাটা হবে:

$$V_{AB}=(V_A+V_B)\div\left(1+\frac{V_A+V_B}{c^2}\right)$$

[c= আলোর গতি]…(ii

আমাদের চিত্র—১৮/খ-তে যে সংখ্যাগুলি দেওয়া হয়েছে ($V_A=V_B=$ ২,৫০,০০০ কি মি/সে এবং c=৩,০০,০০০ কি. মি. সে) তা ঐ ফর্মুলায় বসালে আমরা পাব $V_{AB}=$১,৮৮,৭৯৭ কি. মি/সে.।

(ঘ) **গতির সর্বোচ্চ সীমা:** আপেক্ষিকতাবাদের সবচেয়ে বিস্ময়কর কথাটা বোধ হয় এই—কোন জাগতিক বস্তু গতিবৃদ্ধি করতে করতে আলোর গতির সমান হতে পারবে না, বা তাকে ছাড়িয়ে যেতে পারবে না। সেই সর্বোচ্চ গতিসীমা হচ্ছে আলোকতরঙ্গের গতি—আরও বিজ্ঞানসম্মত ভাষায় ইলেক্ট্রো-ম্যাগ্নেটিক যাবতীয় তরঙ্গের গতিবেগ। কারণটা বোঝা যাবে আমরা যদি আমাদের ইতিপূর্বে লব্ধ সমীকরণে আপেক্ষিক গতি v-কে c-এর সমান অথবা বড় ধরে নিয়ে ফলাফলটা লক্ষ্য করি। প্রথম সমীকরণে আমরা দেখেছি—আপেক্ষিক গতি যত বাড়বে দৈর্ঘ্য তত কমবে। সেখানে যদি v=c বসাই তাহলে অঙ্কশাস্ত্র মতে L' হয়ে যায় শূন্য। তার মানে বস্তুটা উপে যাবে! v যদি c-এর চেয়ে বড় হয় তাহলেও অবাস্তব অবস্থায় উপনীত হচ্ছি আমরা।

একই ভাবে দ্বিতীয় সমীকরণে v=c বসালে আমরা পাচ্ছি m'=অনন্ত!

তাই আইনস্টাইনের থিয়োরি বলছে—কোন বস্তুর গতিই আলোকতরঙ্গের গতিসীমার সমান হতে পারবে না, বা তাকে অতিক্রম করতে পারবে না।

তত্ত্বটার অর্থ ঠিকমত বুঝে নিতে এখানে আমরা একটা কাল্পনিক বিচার-সভার আয়োজন করেছি। একপক্ষে আছেন একজন রক্ষণশীল ডক্টর নিউটনিয়ান, অপরপক্ষে প্রফেসর আপেক্ষিকতাবাদী।

নিউটনিয়ান বললেন, প্রফেসর, আপনার ঐ শেষ যুক্তিটার কেমন যেন গা-জুরি ভাব আছে না ? ৩,০০,০০০ কি. মি./সে একটা নির্দিষ্ট সংখ্যা—আপ্ত-বাক্যের মত যদি আপনি বলেন ওটাকে ডিঙিয়ে গেলে জাত যাবে তা কেমন করে মানি ?

আপেক্ষিকতাবাদী বললেন, ডক্টর, এ বৈজ্ঞানিক আলোচনা সভায় আসুন আমরা ব্যঙ্গ এবং বিদ্রূপকে পরিহার করে শুধু মাত্র তাত্ত্বিক আলোচনা করি। জাত যাবার কথা আমি বলিনি। বলেছি,—ধরে নিন, ওটা আমার থিয়োরির একটা 'অ্যাক্‌শাম', স্বতঃসিদ্ধান্ত। ওটা মেনে নিলে জগৎ-প্রপঞ্চের আর সব কিছু আমি ব্যাখ্যা করে দেব।

ডক্টর নিউটনিয়ান বলেন, স্বতঃসিদ্ধান্ত আমরা প্রমাণ করতে পারি না, কিন্তু সেটা স্ব-বিরোধী হয় না। ইউক্লিডের জ্যামিতিতে যে কয়টি স্বতঃসিদ্ধান্ত আছে, তার প্রমাণ নেই কিন্তু তা বিশ্বাস করতে বাধে না। তা স্ব-বিরোধী নয়।

: আমার সূত্রটা কি জন্য স্ব-বিরোধী ?

: ধরুন আমি পৃথিবী থেকে একটা রকেট ছাড়লাম যার নাকের ডগায় আরও একটি ছোট রকেট আছে এবং ঐ যৌথ রকেটের সঙ্গে পৃথিবীর আপেক্ষিক গতি ০.৯c—এটা আমি পারি কিনা ?

: বাস্তবে পারেন কিনা জানি না, অঙ্কের হিসাবে মেনে নিলাম—পারেন।

: এবার, অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠ ত্যাগ করার পর ঐ ছোট্ট রকেটটিকে মূল রকেট থেকে ছেড়ে দিলাম যাতে মূল রকেটের সঙ্গে তার আপেক্ষিক গতিবেগ হয় ০.৯c। পারি ?

: ধরা যাক, পারেন।

: তখন ভূপৃষ্ঠের সঙ্গে ঐ ছোট্ট রকেটটার আপেক্ষিক গতিবেগ .৯c+.৯c=১.৮c হবে না ?

: আজ্ঞে না। আমার ফর্মুলা অনুযায়ী ওটা কষলে দেখবেন, অঙ্কের উত্তর হবে ০.৯৯c। ঐ ছোট্ট রকেটের উপর থেকে যদি আরও ছোট্ট একটি অনুরূপ রকেট ছাড়েন তবে ভূপৃষ্ঠের সঙ্গে তার আপেক্ষিক গতিবেগ হবে .৯৯৯c। কোনদিনই আপনি ঐ 'c' সংখ্যাটির নাগাল পাবেন না।

ডক্টর এবার একটি অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন তুললেন, প্রফেসর, আপনি কি জন্ম-মুহূর্তে 'গুংগা' বলে চীৎকার করে উঠেছিলেন ?

অধ্যাপক আপেক্ষিকতাবাদীর বিহ্বল দৃষ্টি দেখে বোঝা যায়, এ অদ্ভুত প্রশ্নের প্রাসঙ্গিকতা তিনি ধরতে পারেননি। ডক্টর নিউটনিয়ান বলেন, চণ্ডী-দাসের খুড়োমশাই শুনেছি অমন একটা 'আজব কল' তৈরি করেছিলেন—যত জোরেই ছোটো লক্ষ্যবস্তুর নাগাল পাবে না।

অধ্যাপক আপেক্ষিকতাবাদী বললেন, যেহেতু ইতিপূর্বেই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ পরিহার করব বলে আমরা দুজনেই প্রতিশ্রুত, তাই ধরে নিচ্ছি আপনি সিরিয়াস। সেজন্য জবাবে বলছি—না, চণ্ডীদাসের খুড়োমশাই-এর সেই আজব কলে মুখ ও মণ্ডামিঠাই-এর দূরত্বটা খুড়োমশায়ের গতি-নিরপেক্ষ ছিল ; আমার এ হিসাব

'আবোল তাবোল' নয় এক্ষেত্রে গতি যত বাড়বে আপেক্ষিক গতিও তত বাড়বে ; কিন্তু ঐ ৩,০০,০০০ কি. মি./সে. গতিসীমা কিছুতেই ছাড়িয়ে যাওয়া যাবে না।

ডক্টর স্পষ্টতই লজ্জিত হয়ে পড়েন। বলেন, আ'য়াম্ সরি প্রফেসর ; কিন্তু আপনি যে অঙ্কশাস্ত্রটাকে 'নয়-ছয়' করে দিচ্ছেন !

: দিচ্ছি না। একটা উদাহরণ দিই : ৯×০=০ এবং ৬×০=০ ; মানেন তো ?

: কেন মানব না ? নিশ্চয়ই মানব।

: এবার দুটি সমীকরণকেই যদি দু-দিকেই শূন্য দিয়ে ভাগ দিই তাহলে পাব ৯=০=৬। অঙ্কশাস্ত্রটা নয়-ছয় হল কিনা ?

: কী আশ্চর্য ! তা কি করে হবে ? শূন্য দিয়ে যে ভাগ দেওয়া যায় না !

: কেন যায় না ? কার আপ্তবাক্য অনুসারে ?

: কী মুশকিল ! এটা তো অঙ্কশাস্ত্রের মৌলিক নিয়ম, না হলে অঙ্ক মেলে না।

: আলোর গতিকে অতিক্রম করা যায় না, এটাও আমার মতে একটা মৌলিক নিয়ম, না হলে অঙ্ক মেলে না !

: আপনি কি কোন মতেই ঐ উদ্ভুটে সূত্রটা প্রত্যাহার করবেন না ?

: করতে পারি এক শর্তে। আপনি একটা বিকল্প সূত্র দিন, যাতে সব সমস্যার সমাধান কষে বের করা যাবে—ঐ মাইকেলশন-মর্লের পরীক্ষা কেন ব্যর্থ হল সেটা সমেত।

এখানেই আমাদের নাটকের যবনিকা : কারণ ডক্টর নিউটনিয়ান এ কথায় মনে করলেন তাঁকে অপমান করা হয়েছে। তিনি সক্রোধে বিচারসভা ত্যাগ করলেন।

আলোর গতিসীমা অতিক্রম করতে পারলে ব্যাপারটা কি দাঁড়াবে তা কিন্তু ইংরাজ কবিটি বুঝিয়ে দিয়েছেন আর একটি অপূর্ব লিমেরিকে—

"There once was a lady called Bright,
Who could travel faster than light ;
She went out one day,
In an Einsteinian way
And came back the previous night."

এ পর্যন্ত পড়ে পাঠকের কী অবস্থা হয়েছে জানি না, লেখকের তো রীতিমত মাথা ঝিমঝিম করছে। বোধ করি সেই জন্যই বহু চেষ্টা করেও এই লিমেরিকটির অনুবাদ করতে পারলাম না। একটা ভাব মাথায় আসছে—বড়বাজারে সারি সারি দোকানে বায়না নেওয়া আছে ! হালখাতার পুজো সারতে হবে। পয়লা বৈশাখ ব্রাহ্মমুহূর্তে উঠেই অর্কফলায় করবী-ফুল বেঁধে ঠাকুরমশাই হালখাতা সারতে বার হলেন। সমস্ত চত্বরটা 'বিদ্যুদ্‌লাঞ্ছিত-বেগে' পরিক্রমা করে সন্ধ্যাবেলায় যখন ঘর্মাক্ত কলেবরে বাসায় ফিরে এলেন তখন হিসাব করে দেখলেন সেটা চৈত্র-সংক্রান্তির সন্ধ্যা !

(ঙ) **'ভর' এবং 'শক্তি' সংপৃক্ত** : বিংশ শতাব্দীর শুরুতে আপেক্ষিকতাবাদের জনক যে ছোট্ট সূত্রটি উপহার দিয়েছিলেন $E = mc^2$, এবার তার কথা বলব। ঐ সূত্রের সরণী বেয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কী-ভাবে পারমাণবিক বোমা আবিষ্কৃত হল সে-কথা আমার 'বিশ্বাসঘাতক' গ্রন্থে সবিস্তারে বলেছি। ঐ ফর্মুলাটা কী ভাবে উনি পেলেন এখন শুধু তাই বলি : আমরা ইতিপূর্বেই দেখেছি, গতিবেগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বস্তুর 'ভর'ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ফলে তার শক্তিরও বৃদ্ধি হয় ; কারণ, একই গতিসম্পন্ন দুটি বস্তুর মধ্যে যদি একটার ওজন (ভর বেশী হয় তবে সেটি বেশী শক্তিশালীও হয়। আইনস্টাইন অংক কষে দেখালেন—ভর বৃদ্ধির জন্য যে অতিরিক্ত শক্তি পাওয়া যাচ্ছে সেটার পরিমাণ ভর-বৃদ্ধির সঙ্গে আলোর গতির বর্গের গুণফল। এটা যখন অংক কষে মিলে যাচ্ছে তখন শুধু ভর-বৃদ্ধিটুকু নয়—কোনও বস্তুর সম্পূর্ণ ভরকে অনুরূপ সূত্রের সাহায্যে শুধুমাত্র শক্তিরূপে কেন কল্পনা করা যাবে না ? এই সিদ্ধান্তেই এসেছিলেন আইনস্টাইন—তাঁর ঐ ক্ষুদ্রতম সমীকরণ সূত্রে $E = mc^2$; যেখানে E হচ্ছে শক্তির পরিমাণ, m হচ্ছে ভর এবং c যথারীতি আলোর গতি।

পারমাণবিক বোমা আবিষ্কারের প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বেই তিনি বললেন, কণামাত্র বস্তুকে সম্পূর্ণভাবে শক্তিতে রূপান্তরিত করলে ধারণাতীত শক্তির জন্ম দেওয়া যাবে। বস্তুত একশ গ্রাম ওজনের একটা কয়লার টুকরোকে যদি সম্পূর্ণরূপে বিনাশ করে শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায় তবে উৎপন্ন শক্তির দ্বারা সারা ভারতবর্ষের সব কটা বয়লার, সব কটা রেলের চাকা সারা বছর ধরে চালানো যাবে।

আপনি বলতে পারেন, তা হচ্ছে কই মশাই ? একশ গ্রাম কয়লা পুড়লে তো এক কেটলি চায়ের জলও গরম হয় না। তা হয়তো হয় না ; কিন্তু সেক্ষেত্রে তো আপনি কয়লাটা 'সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করলেন না—উনুনের ল্যাবরেটারীতে কতকগুলো রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটালেন মাত্র। ছিল কয়লা, হল ছাই—কিছুটা গ্যাস, কিছুটা অঙ্গারপিণ্ড—দিয়ে গেল কিছুটা উত্তাপ, যাতে চায়ের কেটলিটাও ফুটল না। 'সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট' হলেও অবশ্য আপনার চা-পান-এর সৌভাগ্য হত না—প্রচণ্ড শক্তির বিস্ফোরণে আপনাদের গোটা শহরটাই হিরোসিমায় পরিণত হত।

(চ) **আপেক্ষিকতাবাদে 'সময়'-এর অভিধা** : চিত্র—১৭-তে দুই সহযাত্রীর দৈর্ঘ্য এবং 'ভর' কিভাবে বদলেছে তা আমরা আলোচনা করেছি ; কিন্তু তখন ওদের কালগণনাতে কোন তারতম্য হচ্ছে কিনা সে প্রসঙ্গ তুলিনি। বরং আমরা বলেছিলাম, নক্ষত্রের বিস্ফোরণ ওরা দেখবে 't' সময়ের ব্যবধানে। বলিনি, সেটা কার ঘড়ি অনুসারে—A না B ! আমরা যেন ধরে নিয়েছিলাম ওদের ফুটরুল, স্প্রিং-ব্যালেন্স পাগলামি শুরু করলেও ঘড়ি দুটো ঠিক সময় দিচ্ছিল। তখন সে প্রসঙ্গ তুলিনি, তার কারণ কালের পরিবর্তনটা আরও বিস্ময়কর, আরও যেন অবিশ্বাস্য ! আমাদের ধ্যান-ধারণায় সেটা আরও বড় জাতের অবাক-করা খবর। এতক্ষণ হেলে ধরে হাত পাকিয়েছি, এবার আসুন—দেখা যাক কেউটে ধরা যায় কিনা।

প্রথমেই বলে রাখি, আপেক্ষিকতাবাদ বলছে—আপেক্ষিক গতির বৃদ্ধির সঙ্গে সময়ের ক্রমশঃ হ্রাস হবে। কতটা ? নিচের ফর্মুলা সেটার হদিস দেবে :

$$t' = t \times \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \qquad (iv)$$

এখানে 't' হচ্ছে সময়ের ব্যবধান যা A দেখবে B ঘড়িতে, অথবা B দেখবে A-ঘড়িতে। নিজের নিজের ঘড়িতে তারা সময়ের ব্যবধানটা 't' পরিমাণেই দেখবে।

বীজগণিত ছেড়ে একটা বাস্তব উদাহরণ নিই। ধরা যাক, ঠিক বেলা বারোটায় দুটি ঘড়ি একই সময় দিচ্ছিল এবং রকেট দুটির আপেক্ষিক গতি ছিল শূন্য। তার পরমুহূর্ত থেকেই দুজনের আপেক্ষিক গতির ফারাক হল ১,০০,০০০ কি. মি./সে. $\left(v = \frac{c}{2}\right)$, এক্ষেত্রে নিজ ঘড়িতে বেলা একটার সময় A দেখবে B-র ঘড়িতে একটা বাজতে ছয়। B দেখবে তার ঘড়ি ঠিকই আছে, অর্থাৎ তার নিজের ঘড়িতে যখন বেলা একটা বাজে এবং A-র ঘড়ি ছয় মিনিট স্লো। আপেক্ষিক গতিটা যদি বেড়ে হয় ২,৭০,০০০ কি. মি./সে. তাহলে যে কোন একজন যখন নিজের ঘড়িতে দেখবে বেলা একটা তখন অপরের ঘড়িতে দেখবে সাড়ে বারোটা। এই যে ঘড়ি স্লো হয়ে যাচ্ছে, সেটা দুটি ক্ষেত্রে একই রকম হবে—যখন A এগিয়ে আসছে B-এর দিকে ; কিম্বা পিছিয়ে যাচ্ছে B-এর কাছ থেকে। আপেক্ষিক গতির জন্য একের যে মনে হচ্ছে অপরের ঘড়িটা স্লো হয়ে গেছে, তার সম্পূর্ণ ব্যঞ্জনাটা আমাদের স্থিরমস্তিষ্কে বুঝে নিতে হবে। গতির সঙ্গে সঙ্গে সময়ের গতিটা কমে যাচ্ছে, তার মানে কি ? ঘড়ির দোষে নয়—'কালের অতিবাহন ছন্দ'টাই শ্লথ হয়ে যাচ্ছে। তার অর্থ, ওখানে বালুকাঘড়ি থাকলেও সেটা শ্লথ-গতি হত, মানুষের হৃদস্পন্দন, নাড়ির গতি, সব কিছুই একই মাপে শ্লথ হয়ে যাবে, যে সময়ের ব্যবধানে কোন পরমাণুর ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসের চারদিকে পাক খাচ্ছে সেই সময়টাও সমানভাবে প্রভাবিত হবে। এতে 'কাল' বা 'সময়' সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণাটা ছিল সেটাকেই বদলে ফেলার প্রয়োজন হয়ে পড়ল। 'সময়' বলতে আমরা কী বুঝি ? সংজ্ঞা দিয়ে বোঝানো মুশকিল ; কিন্তু এটুকু জানি, এক ঘণ্টা বলতে আমি যা বুঝি, তুমিও তাই বোঝ। সেটা হচ্ছে 'পৃথিবীর সূর্যোদয় থেকে পরবর্তী সূর্যোদয় এই সময়কালের চব্বিশ ভাগের এক ভাগ'। চন্দ্রলোকে—যেখানে আহ্নিক গতি ২৯½ পার্থিব দিন, সেখানে এক ঘণ্টা সে অর্থে গ্রাহ্য নয়। সেখানে ঘণ্টা মানে 'সূর্যোদয় থেকে সূর্যোদয়' এই সময়কালের চব্বিশ ঘণ্টার এক ভাগ না হলেও—পার্থিব এক ঘণ্টার পরিমিতি আমাদের বোধের নিরিখে চন্দ্রলোকেও অভিন্ন। কবিরা শুধু নয়, দার্শনিকরাও কল্পনা করেছেন—'কাল' যেন একটি প্রবহমান নদী—যার গতি অপরিবর্তনশীল, গতিবেগে এবং দিকমুখে ; যে মুহূর্তটি অতিক্রান্ত তাকে আর কিছুতে ফিরিয়েই আনা যাবে না। আইনস্টাইন এই ধারণাটার মূলেই কুঠারাঘাত করলেন। আর্দ্রা নক্ষত্র পৃথিবী থেকে প্রায় ৩০০ আলোকবর্ষ দূরে। সেখানে বসে যদি কোন দর্শক আজ, এই মুহূর্তে দিল্লী

শহরকে দেখতে পায় তবে দেখতে পাবে সম্রাট আওরঙ্গজেবকে! কারণ আলমগীরের সময়ে পৃথিবী থেকে যে আলোক-রশ্মি রওনা হয়েছিল আজই তো তা আর্দ্রা-নক্ষত্রে পৌঁছালো। আর্দ্রা নক্ষত্রের বদলে দর্শকটি যদি থাকে এ্যান্ড্রোমেডো-গ্যালাক্সিতে তাহলে পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে সে কোন 'মানুষ'কে দেখতে পাবে না—মানুষ তখনও আসেনি পৃথিবীতে—দেখতে পাবে ম্যামথ আর স্যাবর্-টুথড্-টাইগারদের! তাহলে কেমন করে বলি অতীতের মুহূর্তটিকে কোনক্রমেই ফিরিয়ে আনা যাবে না?

সময় শ্লথগতি হওয়ার বিষয়ে আর একটা উদাহরণ নিয়ে আর একটু বিস্তার করা যাক! ধরুন, একটি রকেট আজ জনা-পাঁচেক যাত্রী নিয়ে স্বাতী নক্ষত্রের দিকে রওনা হল। স্বাতী নক্ষত্র 'বুটেস্' মণ্ডলে এবং তার দূরত্ব তেত্রিশ আলোকবর্ষ! ধরা যাক, রকেটের গতিবেগ আলোর গতির খুব কাছাকাছি। তাহলে ঐ গতিবেগে ছুটলে আমাদের কল্পিত রকেটটি তেত্রিশ বছরের কিছু বেশী সময়ে ঐ স্বাতী-নক্ষত্রে পৌঁছবে। তৎক্ষণাৎ সে একই গতিবেগে পৃথিবীর দিকে রওনা হলে ছেষট্টি বছরের কিছু পরে পৃথিবীতে ফিরে আসবে।

যেহেতু রকেটের গতিবেগ ছিল আলোর গতির কাছাকাছি, তাই আকাশচারীদের ঘড়ি পৃথিবীর ঘড়ির তুলনায় অনেক ধীর গতিতে চলেছে। ওদের কাছে এই ছেষট্টি বছর সময়কাল হয়তো সপ্তাহ খানেক বলে মনে হবে। কিন্তু এদিকে পৃথিবীতে যে ছেষট্টি বছর কেটে গেছে! ফলে তরুণ আকাশচারীরা ফিরে এসে দেখবে—তাদের তরুণী ভার্যার দল পলিতকেশা বৃদ্ধা। ওদের দেড়-দু' বছরের রেখে যাওয়া ছেলেমেয়েরা ওদের চেয়ে পঁয়ত্রিশ-চল্লিশ বছরের বড়!

কিন্তু তাই বা কেন? আমরা তো দেখেছি—A-র তুলনায় B-র সময় যেমন শ্লথ হবে তেমনি B-র তুলনায় A-র সময়ও তো তেমনি শ্লথ হয়ে যাবে। গতিটা যখন আপেক্ষিক, তখন অনায়াসে মনে করা যায় রকেটটাই স্থির আছে—পৃথিবীই বরং তেত্রিশ দুকুনে ছেষট্টি আলোকবর্ষ দূরত্ব পাড়ি দিয়ে এল। সেক্ষেত্রে তো পৃথিবীর লোকের মনে হওয়ার কথা তাদের জীবনে মাত্র এক সপ্তাহ কাটলো আর রকেটবাসীরা ছেষট্টি বছরের বৃদ্ধ হয়ে গেছে!

যুক্তিতে ফাঁক নেই। তাহলে কোনটা সত্য? কারা বুড়ো হবে? অঙ্কশাস্ত্রমতে দুটোই সত্য; কিন্তু বাস্তবে তো দুটোই সত্য হতে পারে না?

এখানে অসঙ্গতি কোথায় হচ্ছে জানেন? ঐ সময়ে সংকুচিত হয়ে যাবার সূত্রটা শুধু মাত্র 'অপরিবর্তিত আপেক্ষিক গতি'র ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। প্রথমেই বলেছি, স্পেশাল থিওরি সেখানেই শুধু সত্য যেখানে 'ত্বরণ' নেই, accelaration নেই—অর্থাৎ আপেক্ষিক গতিটা সব সময়ে অপরিবর্তিত। রকেটটা যাবার সময় এবং পৃথিবীতে ফেরার সময় এ নিয়ম মানেনি, মানতে পারে না; তাই ঐ ফর্মুলাটাও এখানে খাটবে না।

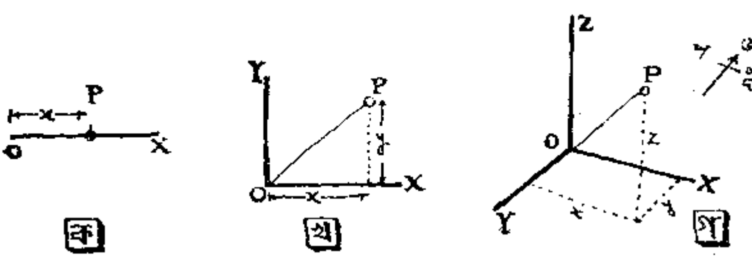
মোট কথা দেখলাম, এতাবৎকাল 'সময়' সম্বন্ধে আমরা যে ধারণাটা পোষণ করে এসেছি সেটাই ভ্রান্ত। 'কাল' কোন একমুখী সমগতিতে নিরবচ্ছিন্ন ধারায় প্রবহমান স্রোতের মত নয়। 'কাল' হচ্ছে বিশ্বপ্রপঞ্চের একটি অঙ্গ, যার অপর অঙ্গ

হচ্ছে 'স্থান'। স্থান ও কাল অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত—একে অপরের উপর নির্ভরশীল, একে অপরের দ্বারা প্রভাবিত। 'বাক্-অর্থ' যেমন সংপৃক্ত—'স্থান-কাল'ও তেমনি সংপৃক্ত। এটা একটা নতুন জাতের ভাবনা—তাই এটাকে পরবর্তী পরিচ্ছেদের অন্তর্ভুক্ত করলে বোধ হয় ভাল হবে।

॥ তিন ॥

'স্থান' ও 'কাল'-এর সংপৃক্তি

(ক) ত্রি-মাত্রিক স্থানের ধারণা : মাত্রা বা dimension কাকে বলি? সংজ্ঞা দিয়ে বোঝানোর চেয়ে উদাহরণ দিয়ে বোঝানো সহজ। চিত্র—১৯/ক-তে দেখুন OX একটি সরল রেখা যেখানে P একটি বিন্দু, O থেকে x দূরত্বে অবস্থিত। এখানে P-বিন্দুটা একটি এক-মাত্রিক ভূমিতে সঞ্চরমাণ। শুধু মাত্র O থেকে তার দূরত্ব জানলেই P বিন্দু সম্বন্ধে সব কিছু জানা হয়ে গেল—তাকে সুনির্দিষ্ট ভাবে চিহ্নিত করা যাচ্ছে। চিত্র—১৯ খ একটি দ্বি-মাত্রিক ভূমি—এখানে OX এবং OY দুটি দিগ্‌দর্শক-রেখা বা অক্ষ। একটা রাস্তা যেন



চিত্র—১৯

O বিন্দুর কাছে মোড় খেয়েছে। অর্থাৎ OX এবং OY সরলরেখা O বিন্দুতে পরস্পরকে ছেদ করে চারটি সমকোণ রচনা করেছে। এখানে P বিন্দুতে অবস্থান বোঝাতে দু'টি মাত্রায় উল্লেখ করতে হচ্ছে, x এবং y। ঐ দুটি মাপ জানা থাকলে উৎপত্তি-স্থল O বিন্দু থেকে তার দূরত্বটা বার করা যাবে সহজেই। পিথাগোরাসের সেই বিখ্যাত উপপাদ্য, যা নাকি এককালে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন বলে মুখস্থ করেছিলাম, সেই থিয়োরেমের সাহায্যে, অর্থাৎ OP^2 x^2+y^2

ধরা যাক x=৩মি. y=৪ মি ; সেক্ষেত্রে $OP^2=৩^২+৪^২$

$=৩\times৩+৪\times৪=৯+১৬=২৫=৫^২$

অর্থাৎ OP=৫ মিটার

এবার আসুন তিন-মাত্রার প্রসঙ্গে। চিত্র—১৯/গ-তে ধরুন O বিন্দু হচ্ছে দমদম এয়ারোড্রোম এবং P বিন্দু বিশেষ মুহূর্তে একটি উড্ডীয়মান বিমানের

অবস্থান। দমদম এয়ারপোর্ট থেকে ঐ প্লেনের দূরত্ব জানতে হলে এবার আমাদের তিনটি মাত্রা জানতে হবে, x, y, এবং z (চিত্র—১৯/গ)। যদি বলি, P বিন্দুর অবস্থান পূর্ব দিক বরাবর ১২ কিলোমিটার, দক্ষিণ দিক বরাবর ৪ কিলোমিটার এবং ভূপৃষ্ঠ থেকে সেটা আছে ৩ কিলোমিটার উঁচুতে, তাহলে ঐ একই সূত্রে আমরা জানতে পারব OP দূরত্বটা কত। অংকটা কঠিন নয়, আসুন, কষেই ফেলা যাক :

$$OP^2 = x^2 + y^2 + z^2 = ১২^2 + ৪^2 + ৩^2 = ১২ \times ১২ + ৪ \times ৪ + ৩ \times ৩$$

$$= ১৪৪ + ১৬ + ৯ = ১৬৯ = ১৩^2$$

অর্থাৎ OP = ১৩ কিলোমিটার।

(ঘ) চতুর্থমাত্রা—'কাল' আপেক্ষিকতাবাদ থিয়োরি বলছে, কোন দুটি দূরত্ব বোঝাতে 'সময়'-এরও একটা ভূমিকা আছে। এবার ঐ ফর্মুলায় 'কাল'কে ঢোকাতে হবে। বস্তুত আইনস্টাইন বললেন, দুটি বিন্দুর 'স্থানিক দূরত্ব' এই ধারাটাই অসম্পূর্ণ। দূরত্ব মাপা যাবে দুটি বিন্দুর নয়, দুটি ঘটনার—যে ঘটনা দুটি ঘটছে ত্রি-মাত্রিক স্থানিক দূরত্বে এবং এক-মাত্রিক সময়ের ব্যবধানে। উপরের উদাহরণে যদি ঐ x, y, z, মাত্রা তিনটি ঘোষণা করার পরে আরও বলতাম ১৬ই জুন, ১৯৭৫ সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে ঐ P বিন্দু থেকে পাইলট কন্ট্রোল টাওয়ারে বেতার-সঙ্কেত পাঠিয়ে সাড়া পেল না, যেহেতু ঐদিন ৯টা ৩১ মিনিটে দমদম কন্ট্রোল টাওয়ারের রেডিও-সিগন্যালার সেরিব্রাল থ্রম্বোসিসে হঠাৎ মারা গেছে, তাহলে সেই মর্মান্তিক দুটি ঘটনার দূরত্বটাই সত্য—বাদবাকি অর্ধসত্য।

অঙ্কশাস্ত্রের যে বিভাগ দ্বি-মাত্রিক সমস্যার সমাধান করে তা আমরা স্কুলে পড়ি—তার নাম জ্যামিতি এবং ত্রিকোণমিতি। তৃতীয় মাত্রা যোগ করে যে কঠিনতর সমস্যার সম্মুখীন হই তার সমাধান করে গোল ত্রিকোণমিতি (Spherical trigonometry) এবং ঘন-জ্যামিতি (Solid geometry)। চতুর্মাত্রিক সমস্যা —অর্থাৎ তিন-মাত্রার সঙ্গে 'কাল'কে যুক্ত করে যে কঠিনতম অঙ্ক দেখা দেয় তার সমাধান করতে এক নতুন অংকশাস্ত্রকে জন্ম দিতে হয়েছে। বাঙলায় তার নামকরণ বোধ করি এখনও হয়নি; বাঙলা হরফে সে শাস্ত্রের নাম টেন্সর ক্যালকুলাস (Tensor Calculus)।

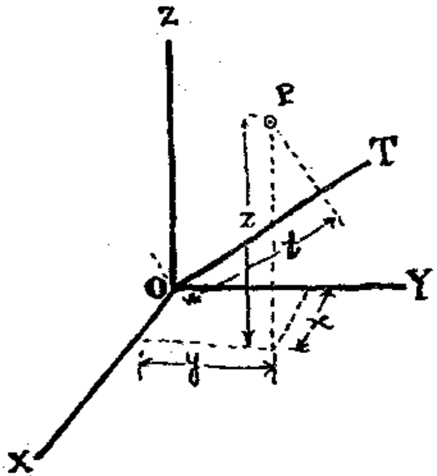
সে কঠিনতম শাস্ত্রালোচনায় প্রবৃত্ত না হওয়াই মঙ্গল। কিছুটা পড়ে বুঝবার চেষ্টা করেছিলাম—ফলাফল জানতে চাইবেন না, লজ্জা পাব। তার চেয়ে সে প্রশ্ন এড়িয়ে বরং আত্মাভিমান বজায় রেখে গম্ভীর ভাবে বলি : ও আপনারা বুঝবেন না!

*{ তবে হ্যাঁ, কিছুটা আভাস দিতে পারি :

---

* ব্র্যাকেট-বন্ধনীর অন্তর্গত অংশটুকু বিজ্ঞান-শিক্ষিত বিশেষ পাঠকের জন্য। দুর্বোধ্য মনে হলে ঐ অংশটুকু বাদ দিয়ে পড়ে যান।

চিত্র—২০তে একটি চতুর্মাত্রিক ভূমিকে কল্পনা করা হয়েছে, যার তিনটি মাত্রা 'স্থান-সূচক', চতুর্থটি 'কাল-সূচক'। বাস্তব ধারণা এখন করা যাচ্ছে না, নাই যাক—ওটাকে আপাতত প্রতীক-চিত্র বলে ধরে নিন—পরে আমরা দেখছি, চতুর্মাত্রিক-ক্ষেত্র আমরা আদৌ ধারণা করতে পারব কিনা। এ ক্ষেত্রে ফর্মুলাটা হবে $OP = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2 - (ct)^2}$; ফর্মুলায় x, y, z যদি মিটারে প্রকাশিত হয় তবে ct-কে প্রকাশ করতে হবে লাইট-মিটারে। x, y, z যদি ফুটে প্রকাশিত হয় তবে ct-কে প্রকাশ করতে হবে 'লাইট ফুট'-এ। 'লাইট-ফুট' কী? বলছি: 'লাইট-ইয়ার' বা আলোকবর্ষ হচ্ছে এক বছরে আলোকতরঙ্গ যতটা যায়। সেটার পরিমাণ হচ্ছে ৫.৮৮ × ১০^১২ মাইল। সুতরাং আলোকবর্ষ হচ্ছে দূরত্বের মাপ-



চিত্র—২০

কাঠি—মাইলে বা কিলোমিটারে প্রকাশযোগ্য। ঐভাবে আলোর গতি থেকে একটা সময়ের মাপকাঠিও পাওয়া যেতে পারে—সেটাকে বলতে পারা যায় 'আলোক-ফুট'। অর্থাৎ এক ফুট দূরত্ব যেতে আলোকতরঙ্গ যে সময়টুকু নেয়। অঙ্ক কষে দেখানো যায়—মেনেই নিন বরং যে, ১ আলোক-ফুট '০০০০০০০১১ সেকেন্ড ; যাকে অঙ্কশাস্ত্রমতে বলা যায় ১১ × ১০^{−৯} সেকেন্ড।

আমরা যে বৈমানিকের কথা আলোচনা করছিলাম—যে বেচারী বেতারবার্তা পাঠিয়ে দমদম কন্ট্রোল টাওয়ার থেকে সাড়া পেল না, তার উদাহরণটা বরং থাক, কারণ সেক্ষেত্রে অঙ্কটা কষলেও আমরা এত ছোট উত্তর পাব যার অর্থ বোধগম্য হবে না। বরং আর দুটি বড়জাতের মহাজাগতিক ঘটনার কথা ধরা যাক। ঘটনা দুটি এই রকম :

১) বিকিনি অ্যাটলে ১লা জুলাই ১৯৪৬ তারিখে সকাল ৯টায় একটা পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটল।

২) মঙ্গলগ্রহে ঐদিন ৯টা ১০ মিনিটে একটা প্রকাণ্ড উল্কাপাত ঘটল।

ধরা যাক আরও বলা আছে যে, বিকিনি অ্যাটল থেকে সেই মুহূর্তে মঙ্গল গ্রহের ঐ উল্কাপাতের 'স্থানিক দূরত্ব' হচ্ছে ৬.৫ × ১০^১১ ফুট। অর্থাৎ আমাদের ফর্মুলায় $X^2+Y^2+Z^2=\{৬.৫\times ১০^{১১}\}^২$।

কালের দূরত্ব অর্থাৎ সময়ের দূরত্ব কত? সময়ের ব্যবধান তো দেখছি ১০ মিনিট। আমরা জানি ১.১×১০^{-৯} সেকেণ্ড = ১ আলো-ফুট।

$$\therefore\ ১০ \text{ মিনিট} = ১০\times ৬০ \text{ সেঃ} = (১০\times ৬০)\div(১.১\times ১০^{-৯}) \text{ আঃ ফুঃ।}$$
$$= ৫.৪\times ১০^{১১} \text{ আলো-ফুট।}$$

সুতরাং ফর্মুলায় ফেললে
$$OP^2 = x^2+y^2+z^2-(ct)^2$$
$$=\{৬.৫\times ১০^{১১}\}^২-[৫.৪\times ১০^{১১}]^২$$
$$=[(৬.৫)^২-(৫.৪)^২]\times ১০^{২২}$$

অর্থাৎ
$$OP=\sqrt{৪২-২৯}\times ১০^{১১}$$
$$=\sqrt{১২}\times ১০^{১১}=৩.৬\times ১০^{১১} \text{ ফুট}]$$

(গ) **চতুর্মাত্রিক-ক্ষেত্রের ধারণা**: এখানে যে অংকটা কষলাম তা টেনসর ক্যালকুলাসের একটি সহজতম অংক। কিন্তু সেটা কষেছি নিছক ফর্মুলায় ফেলে, চতুর্মাত্রিক-ক্ষেত্রের কোন ধ্যানধারণা না করে। চিত্র—২০-তে যে চতুর্মাত্রিক-ক্ষেত্রটি আঁকা হয়েছে ওটা নেহাৎই প্রতীক। চার-মাত্রা-ওয়ালা ক্ষেত্রের ধারণা ওভাবে ছবি এঁকে বোঝানো যায় না। কারণটা বুঝতে অসুবিধা নেই: আমরা আজন্ম—শুধু আজন্মই বা কেন, বংশানুক্রমিক 'জিন'-বাহিত জন্মগত সংস্কারে নিয়ে ত্রিমাত্রিক বিশ্বে অভ্যস্ত। চতুর্মাত্রিক জগৎ আমাদের চিন্তার বাইরে। কয়েকটি উপমা বা অনুরূপতা (analogy) নিয়ে কিছুটা আভাস-ইঙ্গিত দেওয়া চলে মাত্র। উপর-মহলের চার-মাত্রা নাগালের বাইরে হলেও মনে মনে আমরা নিচের মহলের দুই-মাত্রায় নামতে পারি এবং কল্পনায় দ্বি-মাত্রিক জীব—যারা তৃতীয়-মাত্রার ধারণা করতে অসমর্থ, তাদের অবস্থাটা চিন্তা করে দেখতে পারি। তা থেকেই আমরা নিজেদের অসহায় অবস্থাটা অনুধাবন করতে পারব। সুতরাং আসুন, কিছু দ্বি-মাত্রিক জীব—'ছায়াজীব' নিয়ে নাড়াচাড়া করে দেখি, তারা তাদের সীমিত ধ্যানধারণায় ত্রি-মাত্রিক জগৎ সম্বন্ধে কতদূর ধারণা করতে পারে।

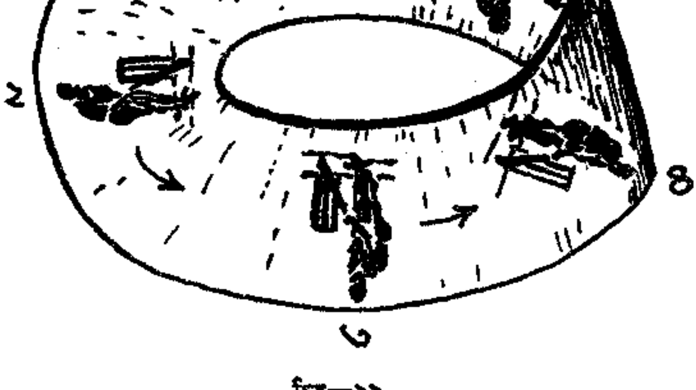
ছায়াজীবেরা কাগজের সমতলে বাস করে, ওদের দৈর্ঘ্য আছে, প্রস্থ আছে, খাড়াই নেই। কাগজের সমতল ছেড়ে বাইরে আসার কথা চিন্তাই করতে পারে না। চিত্র—২১-এ আমরা যে ছায়াছবিটি দেখছি, মনে করুন, সেটি বিশ্বের সেরা ন্যাটা ব্যাটসম্যান গারফিল্ড সোবার্সের ছায়া। কাগজের সমতল তাঁর ক্রিকেট জগৎ। ঐ ছায়াটিকে কাগজের সমতলে নানান ভাবে ঘুরিয়েও আমরা সোবার্সের ছায়াকে রাইট-হ্যাণ্ড ব্যাটসম্যানে পরিণত করতে পারব না। সেটা করতে হলে ছায়াটিকে কাগজের সমতল থেকে বাইরে এনে তৃতীয় মাত্রায় উলটিয়ে কাগজের উপর বসাতে হবে।

এবার একটি লম্বাটে কাগজের টুকরো নিয়ে তার দুটি প্রান্তকে আঠা দিয়ে

আটুন ; কিন্তু আটবার আগে চিত্র—২২-এর মত একটা পাক দিয়ে নিন। এই কাগজের ভেল্কিটাকে বলে 'মোবিয়াস-তল'। ভেল্কি কেন? বলছি। এবার ঐ ছায়ামূর্তিটাকে কাঁচি দিয়ে কাটুন এবং ঐ 'মোবিয়াস্-তল' কাগজের গা-বরাবর টেনে নিয়ে চলুন। কল্পনা করুন, ঐ মোবিয়াস্-রাজ্যে ছায়া-সোবার্স একের পর এক পাঁচটি টেস্ট ম্যাচ খেলে চলেছেন। কিছু দূরে গেলেই দেখা যাবে পঞ্চম টেস্টের আগে নেট-প্র্যাক্‌টিসের সময় ছায়া-সোবার্স উল্টে পড়ে গেছেন। একেবারে শির-পা।(চিত্র—২২/৫)। তা তো হতেই পারে—খেলতে গেলে কে না এক-আধবার উল্টে পড়ে, আছাড় খায়? আপনি হয়তো ছায়া-সোবার্সকে কাগজের সমতল থেকে না তুলে উপর-নিচে ঘুরিয়ে দিলেন! এবার কী হল? ন্যাটা ছায়া-সোবার্স আর মোবিয়াস-রাজ্যে পঞ্চম টেস্ট ম্যাচটি খেলতে পারবেন না—কারণ আপনি তাঁকে ডানহাতি ব্যাটস্‌ম্যানে রূপান্তরিত করেছেন। এটা কেমন করে হল? ছায়া-সোবার্স তো একবারও তাঁর দ্বি-মাত্রিক ছায়া-জগৎ ত্যাগ করে বাইরে আসেননি? একটু চিন্তা করলে বুঝতে পারবেন—ছায়া তার দ্বি-মাত্রিক জগৎ ছেড়ে বাইরে আসেনি বটে কিন্তু সেই জগৎটাকে



চিত্র—২১

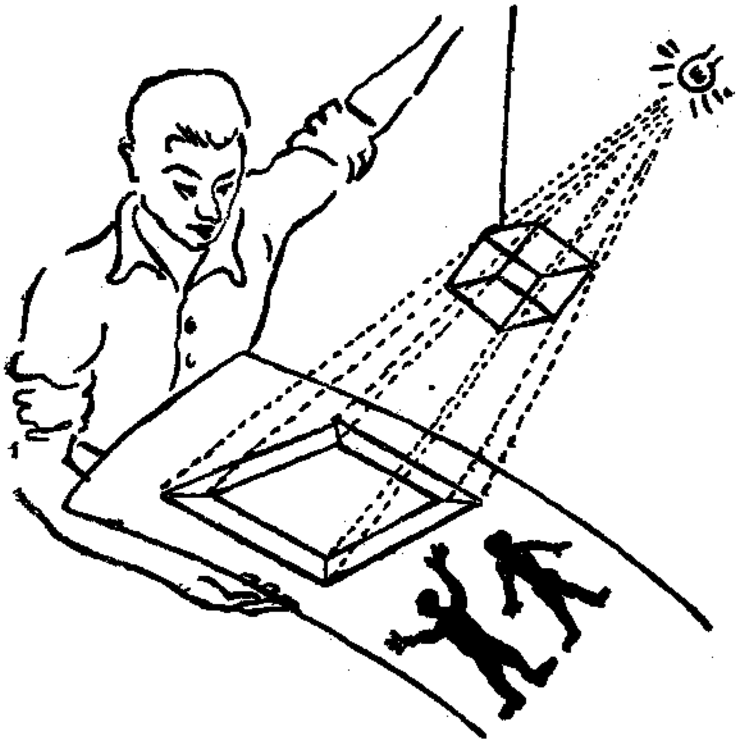


চিত্র—২২

আপনি—ত্রি-মাত্রিক জগতের মানুষ আপনি—একটি পাক দিয়ে দিয়েছিলেন কাগজটা সাঁটার আগে।

আমরা যে ত্রি-মাত্রিক জগতে অভ্যস্ত সেটাকে যদি চতুর্মাত্রিক কোন জীব চতুর্থ মাত্রায় একটা পাক দিয়ে দিতে পারত তবে আমরাও হয়তো অমন একটা ভুত-প্রেত প্যানচেটের ভৌতিক দেখতে পেতাম—মহেশবাবুর মত চীৎকার করে উঠতাম 'হরি-নাথ! আছে, আছে, সব আছে!' অর্থাৎ চতুর্থ মাত্রার কিছুটা তির্যক আভাস পেতাম। তা যখন হচ্ছে না—তখন অন্য কিছু চেষ্টা করে দেখি।

আসুন এবার আমরা দেখি, ঐ ছায়াজীবদের কোন ঘন বস্তু সম্বন্ধে কতটা অবহিত করতে পারা যায়! ধরুন একটা স্বচ্ছ 'ঘনক' বা 'কিউব'—লুডো খেলার ছক্কা আর কি—কাগজের সমতল থেকে বাইরে না এনে ছায়াজীবদের কি-ভাবে তার



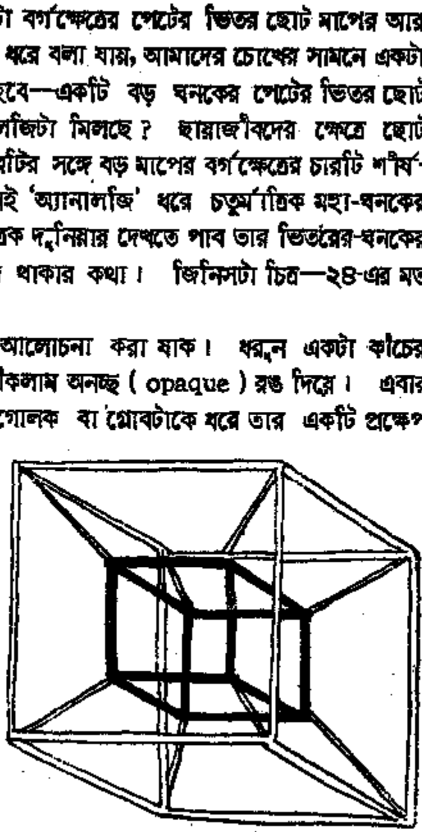
চিত্র—২৩

স্বরূপটা বোঝানো সম্ভব? আপনি-আমি ত্রি-মাত্রিক জীব হিসাবে ওদের একটু সাহায্য করতে পারি—আলোর সম্মুখে স্বচ্ছ ঘনকটা ধরে সেটার ছায়া ওদের ছায়াজগতে অভিক্ষেপ (project) করতে পারি। চিত্র—২৩-এ অমন একটি 'প্রজেক্‌শান' দেখা যাচ্ছে—একটি বর্গক্ষেত্রের ভিতর অপর একটি বর্গক্ষেত্র, যার শীর্ষবিন্দুগুলি যুক্ত। ছায়াজীবেরা কি ঐ ছায়াটা দেখে বুঝতে পারবে লুডোর ছক্কা কী জাতীয় বস্তু? গতানুগতিক-ধর্মীরা পারবে না, আইনস্টাইন-জাতের

বুদ্ধিমত্তরা কিছুটা পারবে—বিশেষ, যদি আমরা তৃতীয় মাত্রার ঘনকটাকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নানাভাবে ছায়াসম্পাত করি। ক্রমশঃ ছায়াজীবিরা লক্ষ্য করবে বস্তুটার আটটা শীর্ষবিন্দু, ছয়টা তল, বারোটা ধার (edge),—লক্ষ্য না করলেও অনুমান করবে, কল্পনা করবে।

ঐ 'অ্যানালজি' থেকে এবার কল্পনা করুন—একটি চতুর্মাত্রিক মহা-ঘনক আমাদের সামনে উপস্থাপিত হলে আমরা কী দেখব। হতভাগ্য ছায়া-জীবেরা ত্রি-মাত্রিক ঘনককে দেখেছিল—একটা বর্গক্ষেত্রের পেটের ভিতর ছোট মাপের আর একটা বর্গক্ষেত্র। সেই অ্যানালজি ধরে বলা যায়, আমাদের চোখের সামনে একটা 'চতুর্মাত্রিক মহা-ঘনক' রূপায়িত হবে—একটি বড় ঘনকের পেটের ভিতর ছোট মাপের আর একটা ঘনক। অ্যানালজিটা মিলছে? ছায়াজীবদের ক্ষেত্রে ছোট মাপের বর্গক্ষেত্রের শীর্ষবিন্দু চারটির সঙ্গে বড় মাপের বর্গক্ষেত্রের চারটি শীর্ষ-বিন্দু সরল-রেখায় যুক্ত ছিল। সেই 'অ্যানালজি' ধরে চতুর্মাত্রিক মহা-ঘনকের যে প্রক্ষেপ আমরা আমাদের ত্রি-মাত্রিক দুনিয়ায় দেখতে পাব তার ভিতরের-ঘনকের সঙ্গে বাইরের-ঘনকের ধারগুলি যুক্ত থাকার কথা। জিনিসটা চিত্র—২৪-এর মত হবে না কি?

আর একটা উদাহরণ নিয়ে আলোচনা করা যাক। ধরুন একটা কাঁচের গ্লোবে আমরা পৃথিবীর মানচিত্র আঁকলাম অনচ্ছ (opaque) রঙ দিয়ে। এবার আলোর সামনে সেই কাচের ভু-গোলক বা গ্লোবটাকে ধরে তার একটি প্রক্ষেপ (projection) কোন দেওয়ালের উপর ফেললাম। ছায়াজীবেরা ঐ দেওয়ালের বাসিন্দা। তারা এই তিনমাত্রার পৃথিবীকে কতটুকু বুঝে নেবে? ওদের কিছু কিছু ধারণা বাস্তবের সঙ্গে মিলবে। যেমন, ওরা বুঝবে পৃথিবীটা গোল। তিন-মাত্রার ভু-গোলক তো দুই-মাত্রার ম্যাপ বইতে আমরা গোল এঁকেই দেখাই। কিন্তু ওদের হয়তো ধারণা হবে—পিকিঙ আর নিউ-ইয়র্ক দুটি পাশাপাশি শহর, যেন হাওড়া-কলকাতা। কিম্বা হলিউডকে মনে হবে কলকাতার উপকণ্ঠে (হায় কলকাতাবাসী! কেন তুমি ছায়াজীব হয়ে জন্মালে না!)। নিউইয়র্ক থেকে যদি একটি এয়ারোপ্লেন পিকিঙ-এ উড়ে যায় তবে ওরা তার প্রক্ষেপ দেখে মনে করবে প্লেনটি ম্যাপের কেন্দ্র-বিন্দু থেকে পরিধির বৃত্তটা ছুঁয়ে ঘুরে ফিরল। আর প্লেন না হয়ে যদি একটা গুবুরে-পোকা হয়? নিউইয়র্ক থেকে গোটা পৃথিবীটা ফুঁড়ে আট-হাজার মাইল ভুগর্ভ পাড়ি দিয়ে যদি পিকিঙ-এ মাটি ভেদ করে ওঠে?

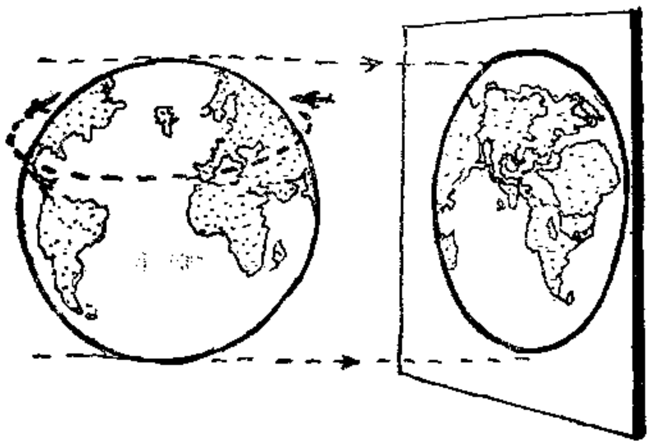


চিত্র—২৪

তখন ওরা মনে করবে গুবরে পোকাটা একই বিন্দুতে স্থির থেকে হাত-পা ছুঁড়ছে। তার আট-হাজার মাইল ব্যাপী ভ্রমণটা তারা ধরতেই পারবে না (চিত্র—২৫)।

অ্যানালজিটা এবার চার-মাত্রায় কল্পনা করুন। এই যে অযুত-নিযুত গ্যালাক্সি সমন্বিত মহাকাশ, এর চতুর্মাত্রিক স্বরূপটা আমরা জানি না—তিন-মাত্রায় এটাকে মহাকাশরূপে, মহাব্যোমরূপে কল্পনা করছি। অ্যানড্রোমেডা নীহারিকা থেকে আলোক-তরঙ্গ বিশ-লক্ষ আলোকবর্ষ দূরত্ব পাড়ি দিয়ে এল, মনে করছি সেটা সিধে-রাস্তায়, সরল রেখায় আসছে। তা তো নাও হতে পারে। হয়তো সে পথটা বাঁকা—চতুর্মাত্রিক মহাশূন্য যদি বঙ্কিম হয়! কে জানে, ঐ বিশ লক্ষ আলোকবর্ষটাই নিকটতম দূরত্ব কিনা! একটু আগেই তো দেখেছি, নিউইয়র্ক থেকে প্লেনটা বিশ হাজার কিলোমিটার পথ উড়ে গিয়েছিল, ভূ-পৃষ্ঠের বঙ্কিমতা স্বীকার করে—অথচ সেটাকে ছায়াবাসীরা ভেবেছিল বৃত্তের কেন্দ্র থেকে পরিধি পর্যন্ত সরলরেখায় যাতায়াত। গুবরেপোকার ভূ-গোলক ভেদ করার ব্যাপারটা তো তারা ধরতেই পারেনি!

সেই অ্যানালজি থেকে কি মনে করতে পারি না—প্লেন যেমন গুবরে পোকার মত মাটি ফুঁড়তে জানে না, জানে শুধু আপাত সরলরেখায় ভ্রমণ করতে (যদিচ



চিত্র—২৫

সে চলে ভূপৃষ্ঠের বঙ্কিমতা স্বীকার করে বঙ্কিম পথে), আলোকতরঙ্গও তেমনি আমাদের কাছে আপাত সরলরেখায় চললেও আসলে চতুর্মাত্রিক বিশ্বে তাকে কোন বঙ্কিম পথেই চলতে হয়? ভাষান্তরে বলা যায়, আলোকতরঙ্গ অ্যানড্রোমেডা নীহারিকা থেকে বিশ লক্ষ আলোকবর্ষ পথ পাড়ি দিয়ে আসে আসুক—কিন্তু কে জানে সেই চতুর্মাত্রিক বিশ্বে বিশেষ জাতের একটি গুবরে পোকার কাছে কোন শর্টকাট পথ আছে কিনা!

। চার ।

আপেক্ষিকতাবাদের বাস্তব প্রমাণ

বেশ বোঝা যাচ্ছে আপেক্ষিকতাবাদের সূত্রগুলি হাতে-কলমে প্রমাণ করা খুব শক্ত। কেপলার-নিউটন-ম্যাক্সওয়েল-এর যে-সব সূত্র এতদিন অভ্রান্ত বলে মনে করা হত, আপেক্ষিকতাবাদের নিরিখে দেখছি সেগুলি একেবারে অভ্রান্ত নয় ; তবে ভুল এত সূক্ষ্ম যে, জাগতিক ব্যবস্থায় ভ্রান্তিটা মেপে দেখানো খুব কঠিন। আমাদের সেই দেড়শ কে. জি. মেদের মৈনাক ঘণ্টায় পঁচিশ কিলোমিটার দৌড়েও তাঁর ওজন বৃদ্ধির এমন প্রমাণ দিতে পারেননি যা পার্থিব ওজন-দাঁড়িতে মেপে দেখানো যায় ; আমাদের সেই জেট-প্লেনটা ঘণ্টায় ১২০০ কিলোমিটার বেগে ছুটিয়েও দেখেছি তার দৈর্ঘ্যের বৃদ্ধি এক মিটারের লক্ষভাগের কাছাকাছি, যা ফুটরুলে মাপা যায় না। কিন্তু এটাও বোঝা যাচ্ছে যে, কোটি কোটি কিলোগ্রাম ওজনের সূর্যনক্ষত্রের ক্ষেত্রে ঐ সূক্ষ্ম ভুলটুকুই উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠবে জ্যোতিষ-শাস্ত্রের অঙ্কে।

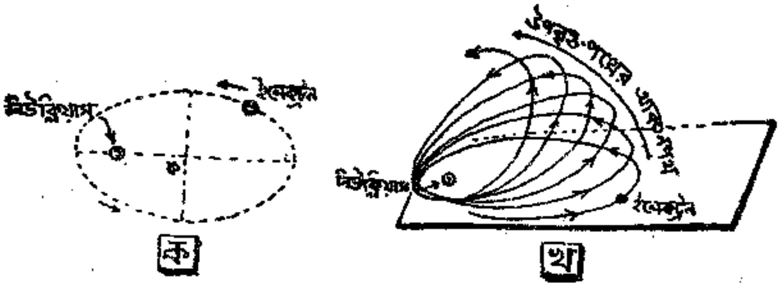
আইনস্টাইন-উপস্থাপিত আপেক্ষিকতাবাদের ঐ সূত্রগুলিতে অঙ্কের হিসাবে কোন ভুল ধরতে পারলেন না বিজ্ঞানীরা ; কিন্তু যতক্ষণ না বাস্তব-প্রমাণে সূত্রগুলি প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে ততক্ষণ সেগুলি মেনে নিতেও তাঁরা ইতস্তত করছিলেন। আগেই বলেছি, বাস্তব প্রমাণ ছাড়া বিজ্ঞানীরা সহজে কিছু মানতে প্রস্তুত নন। ঈথারের ক্ষেত্রে কী কাণ্ড হয়েছিল তা আমরা আগেই সবিস্তারে আলোচনা করেছি। এবার আমরা এই অনুচ্ছেদে দেখাব—কী ভাবে আইনস্টাইনের ঐ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হিসাবের বাস্তব প্রমাণ সংগৃহীত হল। তিনটি মাত্র উদাহরণ আমরা পরীক্ষা করব, তার প্রথম দুটি বুঝতে যদি অসুবিধা হয় তৃতীয় প্রমাণটি নিশ্চয়ই বোঝা যাবে। অঙ্কে যাঁরা ভয় পান না তাঁদের কথা মনে করে তিনটি প্রমাণের কথাই এখানে একে একে তুলে দিলাম :

(ক) প্রথম প্রমাণ : পারমাণবিক ক্ষেত্রে : দিনেমার পণ্ডিত নীলস্ বোর বললেন (১৯১৩) পরমাণুর কেন্দ্রে আছে একটি 'নিউক্লিয়াস' এবং ইলেকট্রনগুলি তার চারপাশে বৃত্তাকারে পাক খাচ্ছে। বছর-তিনেক পরে ইংরাজ পদার্থবিদ সমারফিল্ড প্রমাণ দিলেন ইলেকট্রনের প্রদক্ষিণ-পথ বৃত্ত নয়, উপবৃত্তের (ellipse) আকারে। আর ঐ নিউক্লিয়াসটা উপবৃত্তের ঠিক মাঝখানে (অর্থাৎ মেজর-অ্যাক্সিস ও মাইনর-অ্যাক্সিসের 'ক'-চিহ্নিত ছেদবিন্দুতে) নয়, সেটি আছে উপবৃত্তের একটি 'নাভি'তে অর্থাৎ focus-এ।

বস্তুত সূর্যের চারপাশে গ্রহগুলিও ঐ উপবৃত্তের আকারে পাক খায়। সূর্য তাদের ঐ উপবৃত্তাকার প্রদক্ষিণ-পথের অন্যতম নাভিতে অবস্থিত। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমেই কেপলার প্রমাণ করেছিলেন—প্রতিটি গ্রহের সূর্য-প্রদক্ষিণের গতি সব সময় এক রকম নয়, বাড়ে কমে। কেপলার আরও বলেছিলেন, কোন একটি গ্রহের বার্ষিক গতির হ্রাস-বৃদ্ধির পরিমাণটা নির্ভর করবে উপবৃত্ত পথটা কতটা চ্যাপটা তার উপর—অর্থাৎ তার মেজর-অ্যাক্সিসের সঙ্গে মাইনর-অ্যাক্সিসের

দৈর্ঘ্যের ফারাকের উপর। যেখানে ঐ দুটি অ্যাক্সিস সমান, সেখানে উপবৃত্ত হয়ে যাবে নিটোল বৃত্ত—ফলে নাভিস্থিত সূর্য হয়ে যাবে বৃত্তের কেন্দ্রবিন্দুস্থ—সেই অবস্থায় বার্ষিক গতিতে কোন হ্রাসবৃদ্ধি হবেই না। যেমন ধরুন, আমাদের পৃথিবী—সে প্রায় একটি বৃত্তের আকারে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। তাই তার গতির হের-ফের অতি সামান্য। সমারফিল্ড বললেন, ইলেকট্রন যেহেতু উপবৃত্তের আকারে নিউক্লিয়াস প্রদক্ষিণ করছে তাই তার গতির হ্রাস-বৃদ্ধি হবে।

আমরা আপেক্ষিকতা সূত্র (ii) থেকে জানি যে, গতির হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটলে বস্তুর ভরও বৃদ্ধি-হ্রাস প্রাপ্ত হবে। উপগ্রহের গতি আলোর গতির তুলনায় সামান্য—তাই তার ভরের হ্রাস-বৃদ্ধি তেমন বোঝা যায় না; কিন্তু ইলেকট্রনের গতি অত্যন্ত বেশী, তাই তার ভরে কিছুটা হ্রাস-বৃদ্ধি হবার কথা। মজা হচ্ছে এই যে, 'ভর'-এর কোনরকম হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটলে অঙ্কশাস্ত্রমতে উপবৃত্তটা আর এক সমতলে থাকতে পারে না। গোটা উপবৃত্তটা যে সমতলে ঘুরছে সেই সমতলটাই তৃতীয় মাত্রায় ঐ নাভিকে প্রদক্ষিণ করতে বাধ্য হবে। চিত্র ২৬—খ-তে দেখানো হয়েছে উপবৃত্তের সমতলটা সেক্ষেত্রে কী ভাবে নাভিকে প্রদক্ষিণ করবে।



চিত্র—২৬

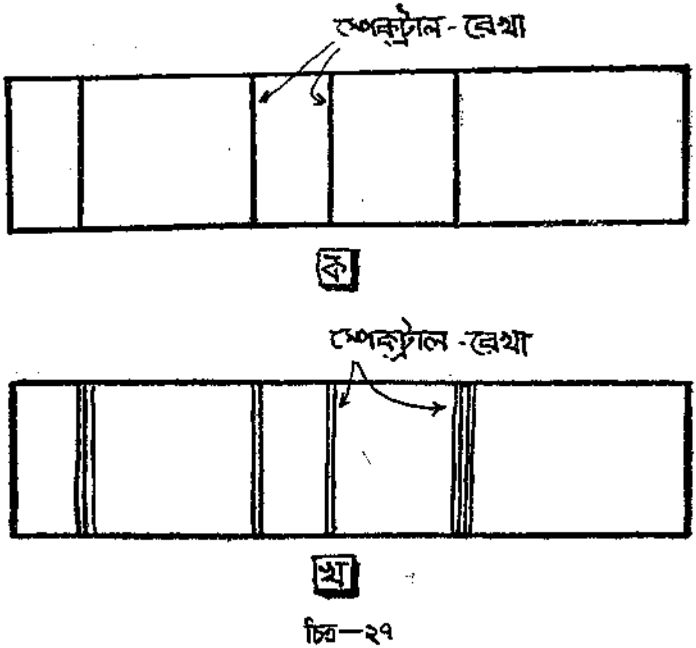
সুতরাং ব্যাপারটা দাঁড়ালো এই রকম: যদি পরীক্ষা করে বুঝতে পারি, ইলেকট্রনের প্রদক্ষিণ-পথ সব সময়ে একই সমতলে আছে তবে বুঝতে হবে তার ভর অপরিবর্তিত থাকছে, আইনস্টাইনের ঐ দ্বিতীয় সূত্র মানছে না; আর যদি দেখি সেই সমতলটাই তৃতীয় মাত্রার চিত্র—২৬/খ-এর মত পাক খাচ্ছে, তখন বুঝতে হবে যে, 'ভর'-এ হ্রাসবৃদ্ধি ঘটছে, অর্থাৎ আইনস্টাইনের সূত্রে বাস্তব প্রমাণ দিচ্ছে। তা তো বুঝলাম, কিন্তু ইলেকট্রন যে অতি ক্ষুদ্র। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ অণুবীক্ষণ যন্ত্রে যে আজও তাকে দেখা যায়নি, তার গতিপথের পরিবর্তন হচ্ছে কি হচ্ছে না কী করে বুঝব?

বিজ্ঞান সেই অসাধ্যসাধনও করল একদিন। না, ইলেকট্রনকে চোখে দেখা যায়নি আজও, কিন্তু তার গতি-প্রকৃতির হদিস পাওয়া গেছে। যে যন্ত্রের সাহায্যে পেল তার নাম 'স্পেকট্রোস্কোপ'। যন্ত্রটা এঁকে দেখানোর প্রয়োজন নেই: তার কার্যকারিতার কথাটুকুই বলি:

একটা আতস-কাচ বা প্রিজম্‌-এর ভিতর দিয়ে যখন আমরা কোন সাদা

আলোকে যেতে দেখি তখন লক্ষ্য করি—সে সাতরঙা রামধনু বা বর্ণালী (spectrum) রচনা করেছে। আকাশে রামধনু ও বর্ণালী, বাতাসে ভাসমান জলকণার প্রিজমে সূর্যের আলো সেখানে সাতটুকরো হয়ে যায়। সমারফিল্ড হিসাব করে দেখলেন যে, ইলেকট্রনের গতিপথ যদি এক সমতলের উপবৃত্ত হয়, তাহলে ঐ বর্ণালীতে কতকগুলি স্পেকট্রাল রেখা (spectral lines) দেখা যাবে (চিত্র—২৭/ক); অপরপক্ষে উপবৃত্তের পথটা যদি তৃতীয় মাত্রায় চিত্র—২৬/খ এর মত পাক খেতে থাকে, তাহলে ঐ সরল রেখাগুলি দু-তিনটি ঘন-সন্নিবিষ্ট সমান্তরাল রেখায় পরিণত হবে (চিত্র—২৭/খ)। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে একটি প্রবন্ধে সমারফিল্ড এই কথা বললেন যে, যদি স্পেকট্রোস্কোপে দেখা যায়—পরমাণুর ভিতর দিয়ে যাবার পথে আলোর বর্ণালীতে স্পেকট্রাল-রেখা দু-তিন টুকরা হয়ে ভেঙে গেছে তখন বুঝতে হবে ঐ উপবৃত্ত-পথ তৃতীয় মাত্রায় ডিগ্‌বাজি খাচ্ছে। যার হেতু ইলেকট্রনের 'ভর' হ্রাসবৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে; সোজা কথায় আইনস্টাইনের ঐ দ্বিতীয় সূত্রটি প্রমাণিত হচ্ছে।

কী অদ্ভুত যোগাযোগ দেখুন—ঐ প্রবন্ধ প্রকাশের মাসখানেক আগে-পিছে পদার্থবিদ পাস্‌চেন (Paschen) একটি বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখলেন—তিনি হিলিয়াম পরমাণু (যাতে একটি মাত্র ইলেকট্রন) নিয়ে স্পেকট্রোস্কোপে



চিত্র—২৭

পরীক্ষা করছিলেন। সেই সময় তিনি লক্ষ্য করেছেন—আলোর বর্ণালীতে স্পেকট্রাল-রেখা ঘন-সন্নিবিষ্ট কতকগুলি সমান্তরাল সরলরেখায় দু-তিন টুকরো হয়ে ভেঙে যাচ্ছে।

এতদিনে বাস্তব প্রমাণ পাওয়া গেল আইনস্টাইনের সেই দু-নম্বর সূত্রটির $m_1 = m \div \sqrt{1-v^2/c^2}$

(খ) দ্বিতীয় প্রমাণ : বুধ গ্রহের প্রদক্ষিণ-পথের সমাধান :

বুধ গ্রহের প্রদক্ষিণ-পথের একটা সমস্যা বহুদিন ধরে বিজ্ঞানীদের রাতের ঘুম কেড়ে নিচ্ছিল। আগে সমস্যাটার কথা বলি :

বুধগ্রহ সূর্যের সব চেয়ে কাছে, তার প্রদক্ষিণ-পথটা চ্যাপটা উপবৃত্ত আকারের (অর্থাৎ মেজর-অ্যাক্সিসটা মাইনর-অ্যাক্সিসের তুলনায় বেশ বড়)। আর দেখা গেছে যে, উপবৃত্তটা এক সমতলে নেই, চিত্র—২৬/খ-এর মত উপবৃত্তটা তৃতীয় মাত্রায় পাক খাচ্ছে। গত শতাব্দীর মাঝামাঝি ফরাসী বৈজ্ঞানিক লেভেরিয়ে (Leverrier) ভবিষ্যৎ-বাণী করেছিলেন—বুধের এই বিচিত্র গতির একমাত্র কারণ হচ্ছে অন্য কোনও গ্রহের আকর্ষণ, যে গ্রহটি সূর্যের আরও কাছাকাছি আছে কিন্তু আমরা তার খবর রাখি না। বহু জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত তারপর সেই অজ্ঞাত গ্রহকে দূরবীন দিয়ে ধরবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। প্রসঙ্গত বলি, ঐ লেভেরিয়েই ইউরেনাস গ্রহের পথপরিক্রমা বিচার করে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, ইউরেনাসের চেয়েও দূরে একটি গ্রহ আছে—যার ভর 'এত', যার দূরত্ব 'এত'। সংখ্যাগুলো ঠিক ঠিক মেলেনি ; কিন্তু সেই পথেই পরবর্তী গ্রহ নেপচুনকে একদিন ধরা দিতে হল দূরবীনে। শুধু তাই নয়,—কেন ঠিক ঠিক মিলল না সেই হিসাব কষতে গিয়ে মনে হল আরও একটি গ্রহ তাহলে আছে নেপচুনেরও পিছনে। সেই সূত্রেই ১৯৩০ সালে ধরা পড়ল প্লুটো। আজকের বিজ্ঞানীদের ধারণা হয়তো প্লুটোর চেয়েও দূরে একটি গ্রহ আছে, যার নাম 'এক্স'। সে যাই হোক, বুধের গতিপথের ঐ ধাঁধার কোন সমাধান হল না, যেহেতু বুধের চেয়ে সূর্য-সন্নিকটবর্তী কোন গ্রহের আবিষ্কার কেউ করতে পারল না।

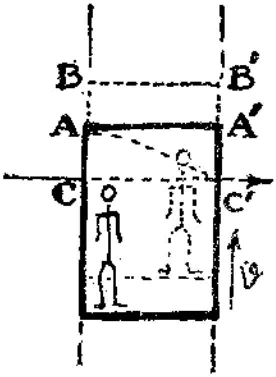
তখন সকলের নজর পড়ল আইনস্টাইনের থিয়োরির দিকে। ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে আমরা যেভাবে উপবৃত্ত-পথকে ঘুরতে দেখেছি এখানেও কি সেই কারণে বুধের পথ বিচিত্রগতি হচ্ছে? অংক কষে দেখা গেল খানিকটা তাই বটে, তবে সবটা সেজন্য নয়। বস্তুত অসঙ্গতির বাকিটুকুও ঘুচে গেল আইনস্টাইনের 'জেনারেল থিয়োরি' ঘোষিত হবার পর। নিউটনের অভিকর্ষের মূল সূত্রটাকে আইনস্টাইন হিসাব কষে সামান্য পরিবর্তন করেছিলেন। নিউটনের সূত্রটি ছিল :

$$F = G \times \frac{mm}{d^2}$$

যেখানে F হচ্ছে অভিকর্ষের টান ; G একটা ধ্রুবক সংখ্যা ; m, m' হচ্ছে বস্তুদ্বয়ের ভর এবং d হচ্ছে তাদের মধ্যে দূরত্বের পরিমাণ। এই ফর্মুলা ধরেই এতকাল যাবতীয় অংক কষা হচ্ছিল। আইনস্টাইন বললেন—ঐ সূত্রে বর্গসূচক ঐ ২ সংখ্যাটাকে সামান্য পরিবর্তন করতে হবে। অংক কষে দেখালেন ওটা দুইয়ের পরিবর্তে হবে ২·০০০০০০১৬ অর্থাৎ সূত্রটি ঐ ফর্মুলায় ফেলে বুধের অংকটা আবার কষা হল—দেখা গেল, বুধ গ্রহের সব সমস্যা সম্পূর্ণভাবে ঘুচে গেছে।

$$F = G \times \frac{mm'}{d^{2 \cdot 00000016}}$$

(গ) **তৃতীয় প্রমাণ : সূর্যগ্রহণ ২৯শে মে, ১৯১৯ :** এবার যে পরীক্ষাটির কথা বলব সেটি নাটকীয় ভঙ্গিতে প্রমাণ করে দিল আইনস্টাইনের এক অত্যদ্ভুত সিদ্ধান্ত—যে কথা বিজ্ঞান কোনদিন চিন্তাই করেনি। আইনস্টাইনের সেই যুগান্তকারী ঘোষণাটি হচ্ছে : **আলোকরশ্মি যে কোন সাধারণ বস্তুর মত ; কোন বিশাল ভর-সম্পন্ন বস্তুর অভিকর্ষের ক্ষেত্রে আলোও বঙ্কিম পথে চলবে।** যেন আলোকতরঙ্গের ভর আছে, ওজন আছে,—চলার পথে কোন অভিকর্ষ বা মাধ্যাকর্ষণের ক্ষেত্র পড়লে তার টান সে অনুভব করবে ; তার পথ বঙ্কিম হয়ে যাবে। এই ধারণা তদানীন্তন বিজ্ঞানের স্বীকৃত সূত্রগুলির পরিপন্থী। তাই এই বিপ্লবাত্মক কথাটা কেউ সহজে মানতে চাইলেন না। এমন একটা অদ্ভুত ধারণা কী করে ওঁর মনে উদয় হল সেটা আমরা একটা 'অ্যানালজি' দিয়ে বিচার করে দেখতে পারি :



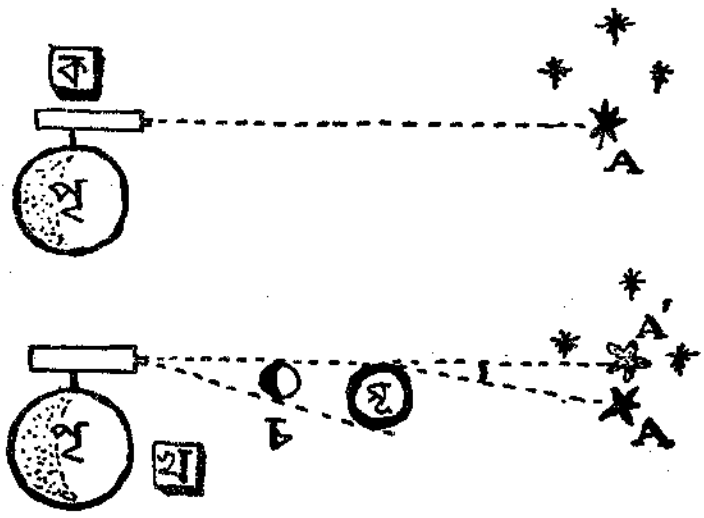
চিত্র—২৮

মনে করুন, একজন বিজ্ঞানী মহাশূন্যে একটি লিফ্‌টে করে V গতিতে উপরে উঠে যাচ্ছেন, কিন্তু তিনি তাঁর এই ঊর্ধ্বগতি সম্বন্ধে অনবহিত—কারণ আশপাশে কোন তথাকথিত স্থির বস্তু নেই। এখন ধরা যাক, চিত্র ২৮-এ যেমন দেখানো হয়েছে তেমনিভাবে একটি বুলেট লিফ্‌টের ভূমির সঙ্গে সমান্তরাল রচনা করে একটি সরল রেখায় এক পাশ দিয়ে ঢুকে অপর পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। বিজ্ঞানী লিফ্‌টের গর্ভে তাঁর যন্ত্রপাতি নিয়ে মেপে কী বুঝবেন ? তিনি মেপে দেখবেন, ঢোকার সময় ফুটোটা হয়েছে ছাদ থেকে AC দূরত্বে আর বের হবার সময় দূরত্বটা (যেহেতু তাঁর অজ্ঞাতসারে ইতিমধ্যে তিনি A' B' পরিমাণে উন্নত হয়েছেন) B'C'। তাঁর ধারণা হবে, বুলেটটা AC' বঙ্কিমরেখায় লিফ্‌ট-এর ভিতরকার 'ঘটাকাশ' অতিক্রম করেছে। উনি সিদ্ধান্তে আসবেন—পৃথিবীতে আকাশে ঢিল ছুঁড়লে সেটা যেমন আকাশে একটি অধিবৃত্ত (parabola) রচনা করে, বুলেটটাও বোধহয় তাই করেছে। এখন যদি বুলেটের বদলে ওটা একটা আলোকরশ্মি হয় ? আলোকরশ্মি অবশ্য অত্যন্ত জোরে যাবে, বুলেটের তুলনায় ; কিন্তু V যে কত তা তো আমরা বলিনি। ফলে এবারও বিজ্ঞানী লক্ষ্য করতেন, আলোকতরঙ্গ তাঁর জগৎটা অতিক্রম করছে একটি বঙ্কিমপথে। এবার হয়তো তিনি সিদ্ধান্ত করবেন যেহেতু $E = mc^2$ (মনে করা যাক বিজ্ঞানী আপেক্ষিকতাবাদের স্পেশাল থিওরি জানেন) এবং আলোকতরঙ্গ যেহেতু শক্তি তাই নিশ্চয়ই তার ভর আছে। ভর আছে বলেই বুলেটের মত তার গতিপথ একইভাবে (যদিচ অনেক কম পরিমাণে) বেঁকে গেছে।

এই ধরনের তাত্ত্বিক 'অ্যানালজি' থেকে আইনস্টাইন তাঁর ঐ বিপ্লবাত্মক সিদ্ধান্তে এলেন। অঙ্ক কষে দেখলেন—তাঁর ধারণা (hypothesis) মিলে যাচ্ছে। তখন তিনি সম্পূর্ণ আস্থার সঙ্গে ঘোষণা করলেন—আলোর 'ভর'

আছে ; আলোকতরঙ্গের উপরেও মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব পড়বে। বললেন, কোনও নক্ষত্রের আলো যখন সূর্যের কাছ ঘেঁষে যায় তখন তা বেঁকে যায়। এটা পরীক্ষা করা প্রায় অসম্ভব, কারণ সূর্যের কাছাকাছি নক্ষত্রের আলো তো দেখাই যাবে না —এটাও যেন সেই জাতের রসিকতা—"চোখ বুজলে—আহা ! তোমার মুখখানা ঠিক যেন বাঁদরের মত লাগে। আয়নায় দেখ'সে।"

কিন্তু তা কেন ? সূর্যগ্রহণ যখন পূর্ণগ্রাস হয় তখন তো আকাশে তারা ফোটে। তেমন-তেমন পূর্ণগ্রাসে সূর্যের কাছ-ঘেঁষা নক্ষত্রও দেখতে পাওয়া যাবে। আইনস্টাইন ঐ কথা ঘোষণা করার পর হিসাবমত দেখা গেল, অমন জাতের একটি পূর্ণগ্রাস পৃথিবীর কোন কোন স্থান থেকে দেখা যাবে ২৯শে মে, ১৯১৯ তারিখে। বিজ্ঞানীরা বললেন, তাঁরা এ-ব্যাপারটা পরীক্ষা করে দেখবেন। আইনস্টাইন-প্রদত্ত ফর্মুলা তো পড়েই আছে। ও'রা হিসাব কষে দেখলেন সেই অঙ্কের হিসাবমত সূর্যের কাছ-ঘেষা একটি নক্ষত্রের অপসারণ হবে ১'৭৫ সেকেণ্ড (এখানে 'সেকেণ্ড' সময়ের মাপ নয়, ডিগ্রি কোণের ষাট ভাগের এক ভাগ হচ্ছে



চিত্র—২৯

এক মিনিট, তার ষাট ভাগের এক ভাগ—সোজা কথায় এক সমকোণের ৩,২৪,০০০ ভাগের মাত্র এক ভাগ হচ্ছে 'কৌণিক মাপ এক সেকেণ্ডে') সরে যাবে। দু'জন প্রখ্যাত ব্রিটিশ জ্যোতির্বিজ্ঞানী পৃথিবীর দু-প্রান্তে ঐ পরীক্ষাটা করতে বের হলেন। ক্রমেলিন-এর (Crommelin), দল গেলেন ব্রেজিলে, আর এডিংটন (Eddington) সদলবলে গেলেন আফ্রিকায় গিনি উপকূলে। ও'দের পরীক্ষা-কার্যটা সংক্ষেপে চিত্র—২৯-এ বোঝানোর চেষ্টা করেছি। চিত্র—২৯/ক-তে দেখাছি সূর্যগ্রহণের আগে বা পরে রাত্রের বেলায় A চিহ্নতে নক্ষত্রটির অবস্থান (অন্যান্য নক্ষত্রের অবস্থিতির হিসাবে) লিখে রাখা হচ্ছে। চিত্র—২৯/খ-তে

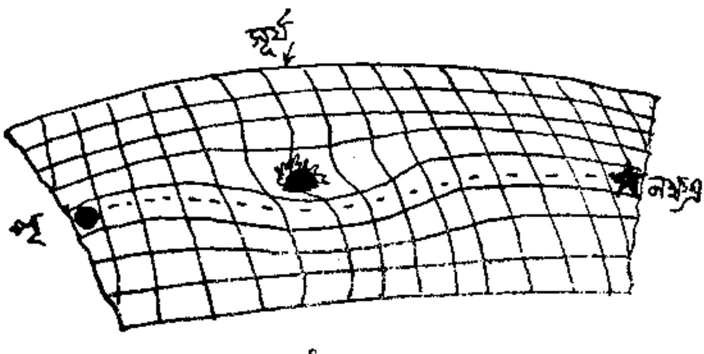
সূর্যগ্রহণের সময় দেখা গেল, চিহ্নিত নক্ষত্রটা যেন ঐ অন্যান্য নক্ষত্রের দিকে অর্থাৎ সূর্য থেকে দূরে সরে গেছে। ঐ A-চিহ্নিত নক্ষত্রের আলোকরশ্মি সূর্যের আকর্ষণে কী ভাবে বেঁকে গেছে তা চিত্রে দেখানো হয়েছে। এবার দর্শকের চোখে A-চিহ্নিত নক্ষত্রটিকে দেখা যাবে A-'অবস্থানে। ব্রেজিলের বিজ্ঞানীরা এই পরীক্ষায় দেখলেন নক্ষত্রটি এভাবে ১'৯৮ সেকেণ্ড বেঁকেছে। এডিংটন দেখলেন, তাঁর যন্ত্রে নক্ষত্রটা ১'৬০ সেকেণ্ড বেঁকেছে। দুটি পরীক্ষার গড় ফল তাহলে হল ১'৭৯ সেকেণ্ড। আইনস্টাইনের হিসাব তো আগেই লিখে রাখা হয়েছিল—১'৭৫ সেকেণ্ড। বিশ্ববিজ্ঞানের ইতিহাসে যে কয়টি ভবিষ্যৎবাণী নাটকীয়ভাবে মিলে গেছে এই পরীক্ষাটি তার অন্যতম।

॥ পাঁচ ॥

মহাকাশের স্বরূপ

এ পর্যন্ত তো বেশ বুঝছিলাম; কিন্তু আলোকতরঙ্গের ঐ বিচিত্র গতির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আইনস্টাইন যা বললেন তা যে হজম করতে পারছি না। উনি বললেন, ঐ যে আলোর গতিপথ বেঁকে যাচ্ছে তার হেতু শুধু এ নয় যে, আলোক তরঙ্গ-ভঙ্গিমা নয়, আলো বাস্তবিক বস্তুকণা—'ফোটন', যার ভর (ওজন) আছে; বরং আসল হেতুটা হচ্ছে :

অভিকর্ষের নিয়ম যেটাকে বলছি, সেটা বস্তুত এই চতুর্মাত্রিক বিশ্বব্যাপারের—এই স্থান কাল-সংপৃক্তির একটা ব্যঞ্জনা। সংক্ষেপে পূর্ণ সত্যটা এই : ব্রহ্মাণ্ড সান্ত কিন্তু অসীম।



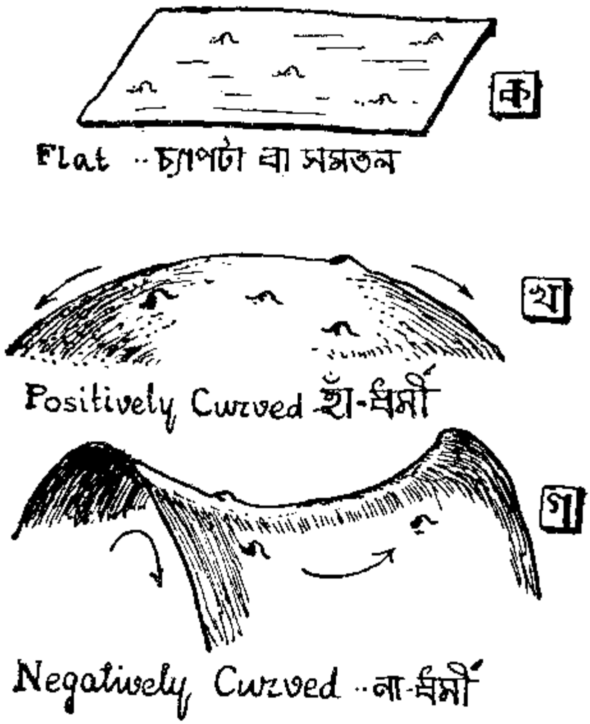
চিত্র—৩০

দাঁড়ান মশাই! মাথাটা গুলিয়ে গেল। হেতু যেটা বাৎলালেন সেটা শুধু 'ভরে' ভারী নয়, গালভারি শব্দসম্ভারে গুলায়িত! এ যেন হিংটিংছটের সেই ছন্দবন্ধ সূত্রটা : "ত্রয়ী শক্তি ত্রিস্বরূপে প্রপঞ্চে প্রকট!"

সোজা কথায় ব্যাপারটা কী দাঁড়ালো বুঝিয়ে বলুন দেখি :

অভিকর্ষ, মাধ্যাকর্ষণ বা 'Laws of Gravitation' ব্যাপারটার ঠিকমতো

পরিচয় নিউটনের আমল থেকে কেউ দিতে পারেননি। তার কার্যপ্রণালীর হিসাব-নিকেশ শুধু জানা গেছে; কিন্তু মূল ব্যাপারটা নয় অর্থাৎ অভিকর্ষ 'কী', 'কেন' জানা যায়নি—তার প্রভাবের ফলাফলটুকুই শুধু বুঝতে পারা গিয়েছিল। তোমাকে টানতে হলে আগে তোমার হাতটা বা ঠ্যাঙটা চেপে ধরতে



চিত্র—৩১

হবে, নিদেন তোমার শাড়ির প্রান্ত বা চাদরের খুঁটে গাঁটছড়া বাঁধতে হবে; বড়জোর ল্যাসো ছুঁড়ে তোমাকে টেনে আনতে পারি; কিন্তু মহাশূন্যে অবস্থিত সূর্য কেমন করে ইউরেনাস, নেপচুন, প্লুটোর মত দূরে অবস্থিত বস্তুকে বিনা ল্যাসোয় টানছে? তাছাড়া কেনই বা টানছে? নিউটন এসব প্রশ্নের জবাব দিতে পারেননি।

আইনস্টাইন বললেন, এটা কোন টানাটানির ব্যাপারই নয়—সূর্য অভিকর্ষের টানে পৃথিবীকে টানছে বলেই পৃথিবী ক্রমাগত তাকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে, এ ধারণাটাই ভুল। আসলে সূর্যের ভর তার সন্নিকটস্থ স্থান-কাল-সংপৃক্ত বিশ্বকে বাঁকিয়ে দিচ্ছে; আর সেই বঙ্কিম মহাকাশে পৃথিবীর ঐ ভাবে চলা ছাড়া গত্যন্তর নেই। বিশালাকার নক্ষত্র বা সূর্যের ভর-জনিত কারণে মহাকাশ কী ভাবে বাঁকে তার ধারণা করা যাবে যদি দীঘা সমুদ্র-সৈকতে জোয়ারের পরে কী দেখেছেন মনে

করেন। জোয়ারের জল সরে গেছে—সমুদ্র-বেলাভূমি মসৃণ, সমতল; কিন্তু যেখানে যেখানে কোন বড় পাথর বা ডাবের খোলা ছিল সেখানে সেখানে যেন কিছু গর্ত সৃষ্টি হয়েছে। চিত্র—২৯/খ-তে নক্ষত্রের আলোর পথ যে বেঁকে গেল তার কারণ শুধু এ নয় যে, আলোর 'ফোটন' সূর্যের অভিকর্ষের টানে তার দিকে সরে গিয়েছিল—বরং বলব, মহাকাশই ওখানে বঙ্কিমতা প্রাপ্ত হয়েছিল। চতুর্মাত্রিক ঐ ব্যাপারটা দু-মাত্রার কাগজে এঁকে দেখালে তার প্রতীক রূপটা হবে চিত্র ৩০-এর মত।

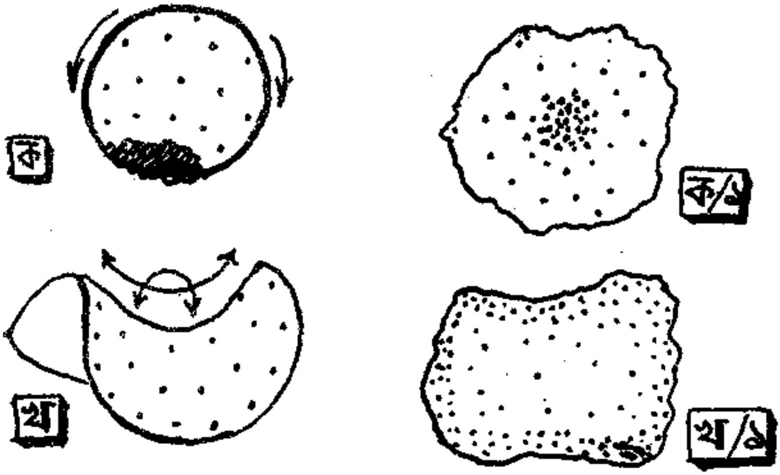
সোজা কথায় দাঁড়ালো—মহাকাশে যেখানে যেখানে বড় বড় নক্ষত্র আছে, গ্যালাক্সি আছে, সেখানেই মহাকাশ একটু বেঁকেছে বা তুবড়েছে। এখানে 'মহাকাশ' মানে শুধু স্থানবাচক মহাশূন্য নয়, স্থান-কালের সংপৃক্ত বিশ্বাকাশ। মহাকাশের তো উপর-নিচ নেই, তাই তুবড়েছে বা টোল খেয়েছে না বলে ফুসকুড়ির মত ফুলে উঠেছে বললেও ভুল হয় না। যেন মহাকাশের গালে ব্রণ-র চিহ্ন দেখা গেছে। মহাকাশ আর 'অব্রণং' নন!

আঞ্চলিক ব্রণচিহ্নের কথা থাক—মহাকাশ কি চ্যাপটা? নাকি বঙ্কিম? বঙ্কিম হলে হাঁ-ধর্মী (positively curved), না, না-ধর্মী (negatively curved)? চ্যাপটা বা সমতল (flat) বলতে কি বোঝা যায় তার ধারণা করা শক্ত নয়। তথাকথিত হাঁ-ধর্মী বঙ্কিমতা তাকেই বলব—যেখানে যে-মুখেই যাও না কেন একই দিকে বাঁক নিতে হবে (চিত্র—৩১/খ)। অপরপক্ষে না-ধর্মী বঙ্কিমতলে কোন্ দিকে বাঁকছ সেটা নির্ভর করবে 'কোন্ মুখে যাচ্ছ' তার উপর। বাগাড়ম্বরের চেয়ে উদাহরণ বেশি কার্যকরী। হাঁ-ধর্মী যেন নিটোল ফুটবলটি; আর না-ধর্মী ঘোড়ার জিন (চিত্র ৩১/গ)।

ঐ হাঁ-ধর্মী এবং না-ধর্মী বঙ্কিমতার একটা বৈশিষ্ট্যের কথা এই ফাঁকে বলে রাখি, কারণ পরবর্তী আলোচনায় সেটা কাজে লাগবে। ধরা যাক, একটি হাঁ-ধর্মী ফুটবলের গায়ে এবং একটি না-ধর্মী ঘোড়ার জিনের গায়ে সম-দূরত্বে আমরা কতকগুলি ফুটকি-চিহ্ন এঁকে দিলাম (চিত্র—৩২/ক এবং ৩২/খ)। এবার ঐ ফুটবল আর জিনের এক-একটা চাকলা কেটে নিয়ে কর্তিত অংশ টিপে-টুপে ঠেলে-ঠুলে সে দু'টিকে সমতল দ্বি-মাত্রিক আকারে রূপান্তরিত করলাম। সেক্ষেত্রে আমরা দেখব ফুটবলের ক্ষেত্রে কেন্দ্রস্থলে ফুটকির ভিড় জমেছে এবং সীমান্তের দিকে তাদের ভিড়টা কম (চিত্র—৩২।ক।১)। অপরপক্ষে ঘোড়ার জিনটাকে চ্যাপটা করে ফেললে দেখব ভিড়টা সীমান্তের কাছাকাছিই বেশি—মাঝখানটায় ফুটকির ভিড় পাতলা (চিত্র—৩২/খ/১)। এমন একটা অদ্ভুত পরীক্ষা কেন করলাম সে-কথায় পরে আসছি, আপাতত দেখি—ঐ যে আইনস্টাইন বললেন, 'বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সান্ত কিন্তু অসীম' তার মানে কী?

এক্ষেত্রেও কয়েকটি উপমা বা 'অ্যানালজি' নিয়ে অগ্রসর হলে ব্যাপারটা সহজে মগজে ঢুকবে। চিত্র—৩৩-এ আমরা পর পর তিনটি প্রতীক-ব্রহ্মাণ্ড এঁকেছি, একমাত্রিক, দ্বিমাত্রিক এবং ত্রিমাত্রিক। একটি ছায়াজীব ছারপোকাকে ঐ কল্পিত দুনিয়ায় ছেড়ে দিয়ে বলেছি ছারপোকার কাছে তার দুনিয়া কখনও সান্ত কখনও

অনন্ত ; কখনও সীমাবদ্ধ কখনও অসীম। আসুন, একে একে ঐ দার্শনিক চিন্তাগুলি নিয়ে আলোচনা করি : অর্থাৎ 'ছেলে' ধরে হাত পাকাই। প্রথমত 'সান্ত' বলতে বুঝছি যার শেষ আছে—finite, যার শেষ নেই তা সে-হিসাবে 'অনন্ত'—infinite ; তেমনি 'সীমাবদ্ধ' অর্থে যার সীমানা আছে—bounded ; যেমন অসীম মানে যার কোন শেষ সীমা নেই—unbounded।

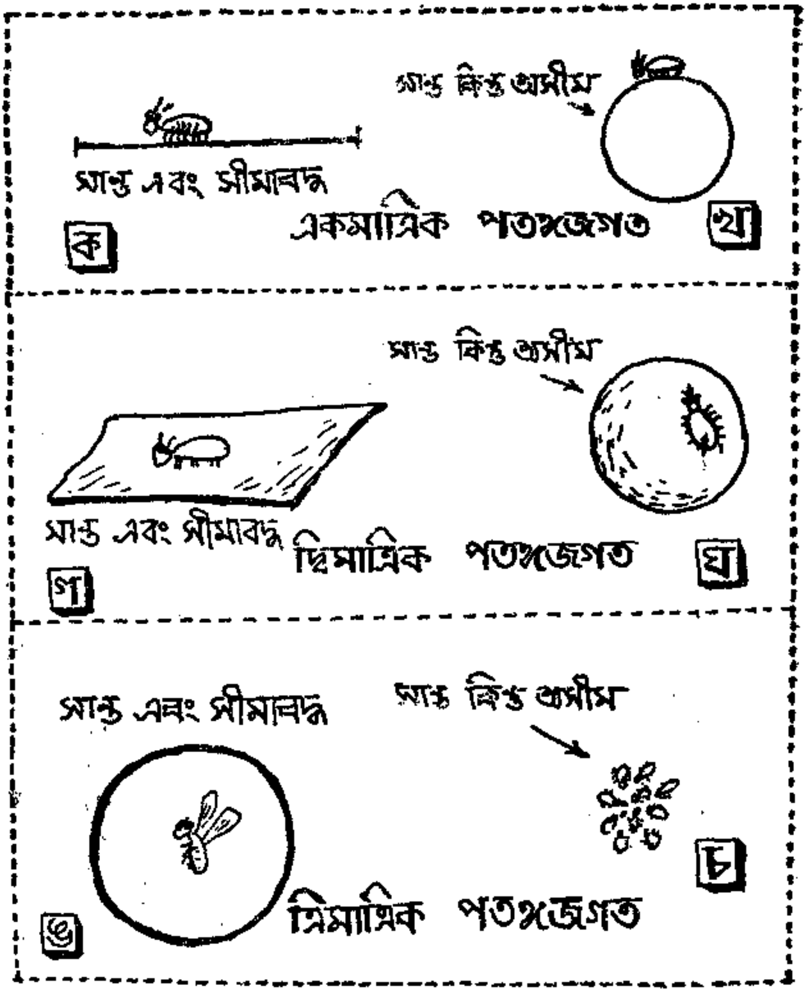


চিত্র—৩২

প্রথম উদাহরণে, সীমিত সরলরেখায় (ক) ছারপোকার দুনিয়া কেন সান্ত এবং সীমাবদ্ধ তা বুঝতে অসুবিধা নেই। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে (খ) পোকাটা আছে একটি বৃত্তের পরিধিতে। যেহেতু সে ক্রমাগত পরিধি বরাবর হেঁটেও তার দুনিয়া পরিক্রমা শেষ করতে পারবে না তাই তার দুনিয়া সান্ত হওয়া সত্ত্বেও তার কাছে অসীম। তৃতীয় উদাহরণে (গ) পোকাটি আছে একটা ফুলস্কেপ কাগজের উপর। তার জগৎ সান্ত ও সীমাবদ্ধ ; কিন্তু তাকে যদি একটা ফুটবলের উপর ছেড়ে দেওয়া যায় (ঘ) তখন তার জগৎ সান্ত হলেও সীমাবদ্ধ হবে না। এবার আসুন ত্রি-মাত্রিক জগতে। পোকাটিকে এবার (ঙ) একটা মৌমাছি বা মাছিরূপে কল্পনা করা উচিত ; কারণ তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে ফুটবলের ভিতরকার ত্রি-মাত্রিক 'ঘটাকাশে'। যেখানে পোকাটা শুধু ডাইনে-বামে সামনে-পিছনে নয়, উপর-নিচেও যেতে পারছে। কিন্তু ফুটবলের বাইরে যেতে পারছে না। বর্তমান উদাহরণে (ঙ) মাছিটার জগৎ সান্ত এবং সীমাবদ্ধ। এবার শেষ উদাহরণ, চিত্র—৩৩/চ।

মনে করুন, এক ঝাঁক মৌমাছিকে আমরা শূন্যে ছেড়ে দিয়েছি—'শূন্য' বলতে মহাব্যোম, 'ঘটাকাশ' নয়। আরও মনে করুন, প্রতিটি মৌমাছির 'ভর' অত্যন্ত বেশী। তাহলে কি হবে? যেহেতু ওদের ভর (mass) অতি-বিশাল, তাই

ওদের পারস্পরিক অভিকর্ষ-জনিত আকর্ষণ হবে অত্যন্ত তীব্র—ওরা প্রায় জড়াজড়ি করে থাকবে। কোন একটি মৌমাছি দল ছেড়ে দূরে যেতে চাইলেও পারবে না। তাছাড়া কোন আলোকতরঙ্গও ওদের সেই ভিড় ছেড়ে বাইরে যেতে পারবে না—অভিকর্ষের টানে দলের দিকেই সেই আলোকতরঙ্গ ফিরে আসবে। ফলে



চিত্র—৩৩

মহাশূন্যের দিকে তাকালেও ওদের দৃষ্টিতে শুধু নিজেদের আকৃতিই ধরা পড়বে। অঙ্ক কষে দেখানো যায় যে, সূর্যের আয়তনের সমান—অর্থাৎ সূর্যের মত বড় কোন নক্ষত্রের ভর যদি সূর্যের চার-লক্ষগুণ হয় তাহলে তার অভিকর্ষের টান এত

বেশী হবে যে, নক্ষত্রের আলোকরশ্মির 'ফোটন'-নক্ষত্র ছেড়ে বার হতে পারবে না। অমন একটি অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র যদি সৌরমণ্ডলে এসে পড়ে, তবে আমাদের সৌরমণ্ডল হয়তো ধ্বংস হয়ে যাবে কিন্তু নক্ষত্রের আলোটা আমরা আদৌ দেখতে পাব না। সে কথা যাক, যে আলোচনা হচ্ছিল—সুতরাং ঐ শেষ পর্যায়ে (চ-অবস্থায়) মৌমাছিগুলির দুনিয়া বাস্তবে অসীম (bonudless) হওয়া সত্ত্বেও তাদের মনে হবে যে, সেটা সান্ত (finite)।

'হেলে' ধরা শেষ হয়েছে। এবার 'কেউটে'—অর্থাৎ চতুর্মাত্রিক স্থান-কাল-সংপৃক্তি ধরতে হবে। ধরতে পারছেন? ঐ যে আইনস্টাইন নামক সাপুড়ে সেই কালনাগিনীর নৃত্যছন্দ অনুধাবন করে বললেন, চতুর্মাত্রিক বিশ্ব 'সান্ত কিন্তু অসীম' তার অর্থ বোধগম্য হল? আমার তো হল না!

বাস্তব ধারণা (physical conception) না হলেও অ্যানালজি থেকে এটুকু বুঝেছি যে, আমাদের অবস্থা ঐ ঘ-চিত্রের পোকাটির মত—আমরা যেন এই ত্রি-মাত্রিক পৃথিবীতে ছায়া-সোবার্সের অবস্থায় পড়েছি। ছায়া-সোবার্স শুধু দু-মাত্রা চেনে—দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ। তাকে যদি ভূ-গোলকে ছেড়ে দেওয়া হয়, তাহলে সেই ত্রি-মাত্রিক ভূ-গোলকে (globe) ছায়াজীবটির কী অবস্থা হবে! সে উত্তর মেরু থেকে নাক-বরাবর দক্ষিণমুখো চলতে শুরু করলে—গতিমুখ পরিবর্তন না করেও দক্ষিণ মেরু পার হয়ে ক্রমশঃ ফিরে আসবে তার যাত্রারম্ভের সেই 'আমড়াতলার মোড়', অর্থাৎ উত্তর মেরুতেই। কেন, কেমন করে এটা হচ্ছে তা সে বুঝবে না।

ঐ 'অ্যানালজি' থেকে আইনস্টাইনের মতানুযায়ী বলা যায়, পৃথিবী থেকে একটি আলোকতরঙ্গ বা বেতারতরঙ্গ সোজাপথে চলতে থাকলেও স্থান-কাল-সংপৃক্তির এই সান্ত-অসীম জগৎ-ব্যবস্থায় সেটা ফিরে আসবে এই পৃথিবীতেই—কারণ বিশ্বপ্রপঞ্চ সীমাহীন হলেও অনন্ত নয়।

কিন্তু একটা কথা। ছায়াজীব উত্তর মেরু থেকে রওনা হয়ে এমন একটা বিন্দুতে পৌঁছেছিল (দক্ষিণ মেরু) যেটা তার যাত্রারম্ভের স্থান থেকে সবচেয়ে দূরে। অ্যানালজি অনুসারে তাহলে আমাদের এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেরও তেমন একটা দূরতম বিন্দু থাকার কথা, পৃথিবীর পরিপ্রেক্ষিতে। ভাষান্তরে ব্রহ্মাণ্ড যদি অনন্ত না হয়, তবে তার একটা নির্দিষ্ট 'ব্যাস' আছে। এবং যেহেতু ব্রহ্মাণ্ড 'সান্ত' তাই সে ব্যাসটি অনন্ত হতে পারে না; সংখ্যার দ্বারা তাকে প্রকাশ করতে পারা উচিত। এই প্রশ্নটি যখন পেশ করা হল আইনস্টাইনের কাছে, তখন তিনি বললেন, বটেই তো! অঙ্ক কষে দেখছি—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ব্যাসার্ধ হচ্ছে ২ × ১০^{২৩} মাইল।

জানি না, এ-কথা শুনে আপনাদের কী প্রতিক্রিয়া হল—আমার তো মনে পড়ে গিয়েছিল সেই গোপালভাঁড়ের হিসাবের কথা। 'গোপাল, আকাশে কত তারা আছে বলতে পার?' 'আজ্ঞে হ্যাঁ মহারাজ, পারি—পাঁচ হাজার বত্রিশ কোটি তিনশ একটি; বিশ্বাস না হয় গুনে দেখুন!' এক্ষেত্রেও কি ঘোষণাটা এই জাতের? বিশ্বের শ্রেষ্ঠ টেলিস্কোপে (পালোমার জ্যোতির্বিজ্ঞানাগারে অবস্থিত —আইনস্টাইন যখন সংখ্যাটা ঘোষণা করেন তখনও সেটার পয়দা হয়নি) এক

বিলিয়ান আলোক-বর্ষ পর্যন্ত দেখা যায়। এক বিলিয়ান মানে একশ কোটি। কিন্তু বিজ্ঞানীরাই বলছেন, এই পরিদৃশ্যমান মহাব্যোম গোটা মহাব্যোমের একটি ক্ষুদ্র খণ্ডাংশ মাত্র—কতটা অংশ তা তাঁরা জানেন না। তাহলে ঐ অংকটা আইনস্টাইন কষলেন কেমন করে ?

ওঁর কথা অংকটা বুঝবার চেষ্টা করেছি। হাতীর শুঁড়ের মত চিহ্নগুলির কথা বাদ দিয়ে মোদ্দা ব্যাপারটা বার্ট্রাণ্ড রাসেল যেভাবে বুঝিয়েছেন সেটা বুঝে নেবার চেষ্টা করা যাক :

কোপারনিকাসের আমল থেকেই একটা ধারণা বিজ্ঞানীরা পোষণ করতেন যে, মহাবিশ্বে এই যে গ্যালাক্সিগুলি ছিটানো আছে এগুলির ভিড় মোটামুটি একরকম অর্থাৎ কলকাতায় যেমন মানুষের ভিড় আর গ্রামাঞ্চলে লোকের বাস কম—তেমনটি নয়, সর্বত্রই ভিড়টা প্রায় একজাতের। বিজ্ঞান এটাকে বলেছে 'Cosmological Principle' বা 'মহাজাগতিক ধর্ম'। তা থেকে এ কথা পর্যন্ত নাকি বলা যায় যে, প্রতি ঘনমিটার মহাব্যোমে গড়ে একটি করে পরমাণু আছে। এ থেকে মহা-ব্যোমে অবস্থিত যাবতীয় গ্যালাক্সির গড় ঘনাঙ্কের (density) একটা পরিমাপ পাওয়া যায় ; গড় আয়তনেরও। ফলে যাবতীয় গ্রহ-নক্ষত্র-গ্যালাক্সির গড় 'ভর' কত এবং তা কত গড় দূরত্বে আছে তারও একটা আন্দাজ মেলে। যেহেতু ইতি-পূর্বেই সূর্যগ্রহণের পরীক্ষার সময় আমরা দেখেছি—সূর্যের পরিচিত ভরের আকর্ষণে মহাকাশ (স্থান-কাল-সংপৃক্তি) কতটা বাঁকে, ফলে অংক কষে বার করা যায় পুরোপুরি এক পাক অর্থাৎ ১৮০° বাঁক খেতে কতটা ভরের প্রয়োজন। সেটা জানা হলে মহাজাগতিক ধর্মের গড় থেকে এটাও হিসাব করে বার করতে পারব যে, কতটা মহাকাশের স্থান সেজন্য প্রয়োজন। ঐভাবেই অংকটা কষা হয়েছিল। Estimate-কে আমরা বাঙলায় 'প্রাক্‌কলন' বলি। Guess-কে বলি আন্দাজ ; বিজ্ঞানীরা ঐ estimate শব্দটি এক্ষেত্রে ব্যবহার করেননি। গ্যামো বলেছেন, "The radius of the universe was guesstimated as 2×10^{23} miles"। বাঙলায় কী বলব ? মহাব্যোমের ব্যাসার্ধের পরিমাণ 'প্রাকান্দাজিকলন'-এর হিসাবে —২×১০^{২৩} মাইল ? অঙ্কের হিসাব যাই বলুক—আমার মনটা কেমন যেন খুঁত খুঁত করছে : মাত্র তেইশটা শূন্য ! পুরো দু-ডজনও নয় ? এই যে অযুত-কোটি নক্ষত্র দিয়ে গাঁথা গজমোতির মালা গ্যালাক্সি, এরা নাকি লক্ষ-কোটি আলোকবর্ষ ব্যবধানে সব সাজানো—অমন বিশ-পঁচিশ-পঞ্চাশটা মালা নিয়ে হয় একটা শত-নরী, সহস্র-নরী, যাকে বলি 'ক্লাস্টার অব গ্যালাক্সিজ' বা গ্যালাক্সি-গুচ্ছ। শুনেছি, কোটি কোটি আলোক-শতাব্দীর ব্যবধানে কোটি কোটি গ্যালাক্সি-গুচ্ছ বক্ষে ধারণ করেছেন মহাকাশ। সেই মহাব্যোমের ব্যাসার্ধ মাত্র তেইশটা শূন্যে প্রকাশযোগ্য ? তাও আলোকবর্ষ নয়, মাইল-এ।

কিন্তু দাঁড়ান। আগে বুঝে নিই সংখ্যাটা কত বড়। কোটি লিখতে প্রয়োজন হচ্ছে আটটা শূন্যের। গোটা পৃথিবীর জনসংখ্যা পরিমাপ করতে ঐ আটটা শূন্যই যথেষ্ট। তাহলে তেইশটা শূন্য দিয়ে গাঁথা সংখ্যাটা কত বড় ? আপনারা উজীর শিস্যাবেন দাহির এবং নবাব শিরহাম-এর সেই গল্পটা শুনেছেন ? উজীর শিসাবেন

অঙ্ক গুলে খেয়েছেন—দাবাখেলাটা নাকি তাঁরই আবিষ্কার। নবাবকে ঐ খেলাটা শিখিয়ে দেওয়ায় নবাব খুশি হয়ে বললেন, বল তুমি কী পুরস্কার চাও?

উজীর আঁকে দড়। ছোট্ট একটি প্যাঁচ কষলেন। বললেন, কী আর দেবেন জাঁহাপনা, গরীবকে কয়েক মুঠি গমের দানা দিতে বলুন। আমার এই দাবার ছকে গুনতি করে কিছু গমের দানা সাজিয়ে দেবার হুকুম হক। প্রথম ঘরে একটি দানা, দ্বিতীয় ঘরে দুটি, তৃতীয়ে চারটি, চতুর্থে আটটি, পঞ্চমে ষোলোটি—এই ভাবে ডবল্ করতে করতে চৌষট্টিখানা ঘর পূর্ণ করে দিতে বলুন।

নবাব মনে মনে বললেন, আহা! উজীর বেচারী অঙ্কটাই শিখেছে, দর্শনটা বোঝে না! 'নাল্পে সুখমস্তি' মন্ত্রটাও জানে না। মুখে বললেন, তথাস্তু।

কিন্তু ঐ হিসাবে গম দিতে গিয়ে রাজকোষ ফক্কা! রাজ্য লাটে উঠল!

কী ব্যাপার? ব্যাপার কিছুই নয়—সোজা অঙ্কের হিসাব। স্কুল-জীবনে অঙ্কের মাস্টারমশাই যেদিন গুণোত্তর শ্রেণীর অঙ্ক শিখিয়েছিলেন—জি. পি-র অঙ্ক আর কি—সেদিন যদি ক্লাস পালিয়ে না থাকেন তবে হয়তো মনে পড়বে অল্পে-সন্তুষ্ট উজীরসাহেবের ঐ বিদুরের খুদের পরিমাণটা এইভাবে পাওয়া যাবে:

$$1+2+2^2+2^3+2^4+2^5+\cdots\cdots 2^{62}+2^{63}+2^{64}-1.$$

$$=18,\ 446,\ 744,\ 073,\ 709,\ 551,\ 615.$$

সংক্ষেপে মোটামুটি 'দুই' এর পরে উনিশটি শূন্য।

তার অর্থ—আইনস্টাইন-ঘোষিত সংখ্যাটা এই সংখ্যার প্রায় দশ হাজার গুণ!

মানছি, উজীরসাহেবের ঐ উনিশটি শূন্যওয়ালা সংখ্যাটিও বড় কম নয়। বৈজ্ঞানিক জর্জ গ্যামো হিসাব কষে বললেন, সারা বছরে আজ গোটা পৃথিবীতে যত দানা গম উৎপন্ন হয় ঐ সংখ্যাটি তার দুই হাজার গুণ। যেহেতু গম উৎপাদনের হার ইদানীং অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বেড়েছে তাই অনায়াসে বলা চলে—মানবসভ্যতার ঊষাযুগ থেকে আজ পর্যন্ত যত দানা গম এই পৃথিবীতে মানুষ উৎপন্ন করেছে সংখ্যাটা তার চেয়েও বড়। মানছি, মশাই, মানছি—তবু কেমন যেন একটা খুঁৎখুতানি থেকে যায়। জর্জ গ্যামো নয়, মনে পড়ে ওয়ার্ডসওয়ার্থের কথা—Is this Yarrow!

॥ ছয় ॥

মহাব্যোমের সম্প্রসারণ

সুখের বিষয়—নূতন একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হবার পর আইনস্টাইন নিজেই বললেন, তাঁর ঘোষিত ঐ সংখ্যাটিকে সেক্ষেত্রে বাতিল বলে ধরতে হবে। বাঁচলাম! স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ল আমাদের। তেইশটি শূন্যওয়ালা ঐ সঙ্কীর্ণ আকাশের চার-দেওয়াল আবার ধসে গেল—এতক্ষণে যেন বুক ভরে নিঃশ্বাস নিতে পারছি। কিন্তু নয়া আবিষ্কারটা কী জাতের?

স্পেকট্রোস্কোপ যন্ত্রটির সঙ্গে ইতিপূর্বেই আমাদের জান-পহ্চান হয়েছে।

পদার্থ-বিজ্ঞানী তাঁর ল্যাবরেটারীতে বারে বারে পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, আলোর উৎসটা যদি স্পেক্‌ট্রোস্কোপ যন্ত্র থেকে ক্রমশঃ দূরে সরে যেতে থাকে তাহলে বর্ণালীটা লালের প্রান্ত ঘেঁষে আসে। আবার আলোর উৎস যদি যন্ত্রের দিকে এগিয়ে আসে তাহলে বর্ণালীটা অপর প্রান্তে, অর্থাৎ বেগুনীর দিকে সরে যায়। এই ডানে বাঁয়ে সরে যাওয়ার পরিমাণটা মেপে অংক কষে বলে দেওয়া যায় আলোর উৎস কত বেগে এগিয়ে আসছে, অথবা পেছিয়ে যাচ্ছে।

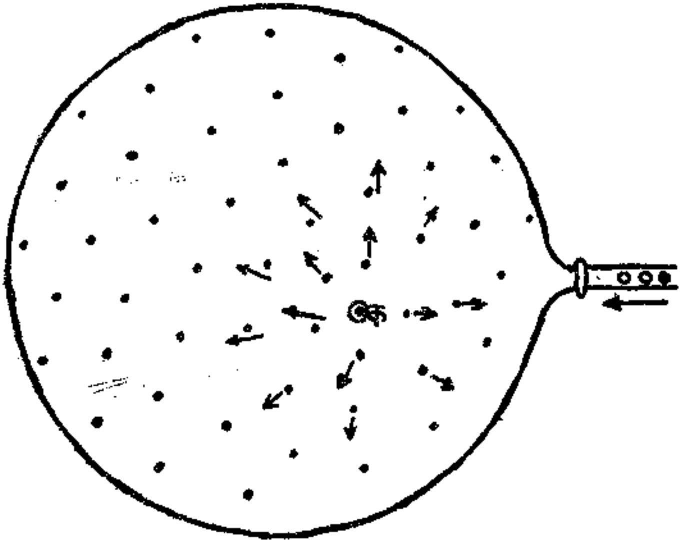
জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে বললেন—প্রতিটি গ্যালাক্সি থেকে যে আলোকতরঙ্গ পৃথিবীতে এসে পৌঁচাচ্ছে তা প্রায় সবই ঐ লালের দিকে সরে যেতে চায়। তার অর্থ মহাকাশের প্রতিটি গ্যালাক্সি বা নক্ষত্রগুচ্ছ আমাদের সৌরমণ্ডল তথা আমাদের গ্যালাক্সি থেকে ক্রমশঃ দূরে সরে যাচ্ছে। আমাদের সব চেয়ে কাছে যে গ্যালাক্সি গুচ্ছ আছে—যা প্রায় চার কোটি আলোকবর্ষ দূরে—তার অপসরণের গতি প্রতি সেকেণ্ডে ১২০০ কি. মি। আরও অদ্ভুত কথা, যন্ত্রে দেখা যাচ্ছে—যে যত দূরে সে তত জোরে পিছনে হটছে। ষাটের দশকে মহাবিশ্বের শেষ সীমান্তে—অর্থাৎ দূরবীনে দেখা মহাকাশের শেষ দিগন্তরেখার কাছাকাছি—কতকগুলি অতিকায় বস্তু আবিষ্কৃত হয়েছিল। সেগুলি দানব তারকার চেয়েও লক্ষ লক্ষ গুণ ভারী। তাদের নাম 'কোয়াসার' (কোয়াসিস্টেলার)। স্পেক্‌ট্রোস্কোপ যন্ত্র বলছে তাদের পশ্চাদপসরণের গতি আলোর গতির প্রায় আধাআধি।

কেন এমনটা হচ্ছে? আগেই বলেছি—এই পৃথিবী, তথা সৌর-মণ্ডল কিম্বা আমাদের ছায়াপথে ঘেরা পরিচিত গ্যালাক্সি মহাব্যোমের কেন্দ্রবিন্দুতে নেই। বস্তুত বিশ্বের কোন কেন্দ্রবিন্দুতেই নেই। তাহলে এমনটা কেন দেখছি? বসানো তুবড়ি থেকে বিচ্ছুরিত আলোর ফুলকি যে-যেদিকে-ইচ্ছে ছুটে যায় কিন্তু সকলেরই গতিমুখ তুবড়ির বিপরীত দিকে। তুবড়ি ঐ আপাত-বিশৃঙ্খল ইতস্তত-ছোটা আলোর ফুলকিগুলির সঙ্গে একই সম্পর্কে আবদ্ধ—সে তাদের কেন্দ্রস্থলে। পৃথিবী তো তা নয়।

বিজ্ঞানীরা বললেন, এখানে উপমাটা 'ঠিক কালিদাসন্য' ধাঁচের হল না। বসানো তুবড়ির বিচ্ছুরণ নয়। তুলনা করতে হবে বেলুনের সঙ্গে। তবেই উপমান আর উপমেয় প্রায় খাঁজে খাঁজে মিলে যাবে। বেলুন? বেলুন কেন?

বিজ্ঞানীরা বললেন, মনে কর এই মহাব্যোম যেন একটা ফোলানো রবারের বেলুন। তার গায়ে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত—মোটামুটি সম-দূরত্বে (কস্‌মলজিকাল প্রিন্সিপল্‌ বা মহাজাগতিক ধর্মে) আঁকা অসংখ্য গ্যালাক্সির ফুটকি। এবার মনে কর, কোন অলক্ষ্য বংশীবাদক ফুঁ দিয়ে ঐ বেলুনটাকে ফোলাচ্ছেন। তাহলে কি হবে? (চিত্র—৩৪)। বেলুনের গোলক-এ কোন কেন্দ্রবিন্দু নেই। ধর আমরা 'ক' বিন্দুতে আছি। আমরা মনে করব—প্রত্যেকটি বিন্দু আমাদের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। হাঁ-ধর্মী কিম্বা না-ধর্মী বঙ্কিম-জগৎকে চেপটে সোজা করলে (চিত্র—৩২) যেমন ভাবে হত তেমন ভাবে নয়—ভিড়টা সর্বত্র সমান ভাবে পাতলা হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ঐ 'ক' বিন্দু তো যে কোন একটা বিন্দু

হতে পারত। অর্থাৎ যে কোন গ্যালাক্সি থেকে মনে হত প্রতিবেশীরা তাকেই কেন্দ্র করে যেন দূরে সরে যাচ্ছে। আসলে কেউই রাগ করে দূরে সরে যাচ্ছে না, যে বেলুনের গায়ে তাদের আঁকা হয়েছে সেই তলটাই আয়তনে বাড়ছে বলে এমনটা মনে হচ্ছে। এক্ষেত্রে প্রত্যেকটি গ্যালাক্সি থেকে মনে হবে ঐ মহাব্যোমে দু-জাতের গ্যালাক্সি আছে—'আমি' আর 'ওরা'। আমি কেন্দ্রবিন্দুতে স্থির



চিত্র—৩৪

আছি, আর ওরা সবাই দূরে সরে যাচ্ছে—বসানো তুবড়ি থেকে যেমন আলোর ফুলকি চতুর্দিকে ছুটে যায়। প্রত্যেকটি গ্যালাক্সির ব্যাকরণে থাকবে দুটি পুরুষ। 'অহং' এবং 'তে'। উত্তম পুরুষ এবং প্রথম পুরুষ। অহংকারের বারুদ দিয়ে ঠাসা 'আমি'-তুবড়ি জানতেও পারবে না—'আমি' এবং 'ওরা' ছাড়াও কেউ থাকতে পারে—তিনি ঐ বংশীধারী, যিনি বেলুনটাকে ফোলাচ্ছেন। তিনি 'অহং'-ও নন, 'ওরা'ও নন—তিনি : 'ত্বমসি'।

উপমাটা কিন্তু এখনও 'কালিদাসস্য' হয়নি। বেলুনের উদাহরণে প্রতিটি বিন্দুরই মনে হবে অন্যান্য প্রত্যেকটি বিন্দু একই গতিতে দূরে সরে যাচ্ছে—বেলুনের তল সর্বত্রই একই ভাবে বাড়ছে, ফলে কাছেই থাক আর দূরেই থাক অন্যান্যদের দূরে সরে যাওয়ার গতিবেগ একই রকম লাগবে। স্পেকট্রোস্কোপ তা বলেনি। বলেছে, যে যত দূরে সে তত জোরে পিছু হটছে। মহাজাগতিক ধর্ম অনুসারে সবাই বোধ হয় তাই দেখছে। তার মানে আমরা যে ত্রিমাত্রিক বেলুনের উদাহরণটা নিয়েছি চতুর্মাত্রিক-বিশ্বে সেটা হুবহু মেলেনি, মেলার কথাও নয়। এ থেকে এটুকুই বুঝলাম—যা শিখেছি তাও বাহ্য! 'আগে কহ আর'। জিজ্ঞাসাটা যেমন ছিল তেমনই রইল। অবাঙ্‌মানসগোচর যেমন ছিল

তেমনটিই রইলেন। বিজ্ঞান আজও তাঁর নাগাল পায়নি। বিজ্ঞান জানে না—কেন এই চতুর্মাত্রিক-ব্রহ্মাণ্ড এভাবে সম্প্রসারিত হচ্ছে—কে সেটাকে ফোলাচ্ছেন। বিজ্ঞান নীরব—'প্রমাণাভাবাৎ'। এ আলোচনা শেষ করার পূর্বে আমার কাহিনীর এই পর্বের নায়ক প্রফেসার আলবার্ট আইনস্টাইন সে বিষয়ে যা বলেছেন সে কথা বলেই শেষ করি: My religion consists of a humble admiration of the illimitable superior spirit who reveals himself in the slight details we are able to perceive with our frail and feeble minds. That deeply emotional conviction of the presence of a supeior reasoning power, which is revealed in the incomprehensible universe, forms my idea of God. [মানবচৈতন্যের দুর্বল ও ক্ষণভঙ্গুর বোধশক্তিতে ঐ যে অবাঙ্মানসগোচর পরমপুরুষ আভাসে-ইঙ্গিতে ছায়াপাত করে যান তাঁর প্রতি বিনম্র অভিভূতিই আমার একমাত্র ধর্ম। এই অপরিজ্ঞেয় বিশ্বরহস্যের মর্মমূলে এক পরম যুক্তিবাদী মহাশক্তির স্বয়ং প্রকাশনাকে আমি অনুভব করি; সেই গভীর ভাবাবেগানুপ্রাণিত সিদ্ধান্ত আমার চৈতন্যে যে প্রভাব বিস্তার করে তাকেই বলি আমার: ঈশ্বর।]

স্বীকার্য, অনুবাদ নিতান্তই ব্যর্থ। বস্তুত ঐ পংক্তিনিচয়ের বঙ্গানুবাদ আমার ক্ষমতার বাইরে। লক্ষনীয় superior spirit এ উনি বড় হরফের S ব্যবহার করেননি, 'himself' শব্দে 'h'-কে 'H' করেননি। বক্তব্যের সেই অংশেও কথক শতকরা-শতভাগ বৈজ্ঞানিক; কিন্তু শেষ শব্দটিতে আইনস্টাইন তাঁর বৈজ্ঞানিক-সত্ত্বাকে অতিক্রম করে: সাধক।

* * * *

দীর্ঘ বিশ্লেষণ শেষ করে অধ্যাপক ইক্‌বাল আহ্‌মেদ থামতেই রাষ্ট্রপতি বলে ওঠেন, অসংখ্য ধন্যবাদ প্রফেসর আহ্‌মেদ, একটি অত্যন্ত জটিল ও দুরূহ তত্ত্ব আপনার কৃপায় কিছুটা বোধগম্য হল, এতদিনে। আমি কৃতজ্ঞ। এবার ঐ সদ্যলব্ধ জ্ঞানের ভিত্তিতে আপনাকে কয়েকটি প্রশ্ন করে আমি নিঃসংশয় হতে চাই।

: বলুন? আমি সাধ্যমত জবাব দেবার চেষ্টা করব।

: প্রথম কথা—চন্দ্রলোকের সেই অদ্ভুত ডুডেকাহেড্রন থেকে যে বেতারতরঙ্গ সেদিন মহাকাশের দিকে ছুটে গেল সেটার গন্তব্যস্থলের সম্বন্ধে আপনার কোন ধারণা আছে?

: আছে। সবাই জানে। পৃথিবীর যাবতীয় বিজ্ঞানাগার এবং মহাকাশ স্টেশনে অবস্থিত জ্যোতির্বিজ্ঞান-মন্দিরে সেটা সংশয়াতীতরূপে জানা গিয়েছে—বৃহস্পতি গ্রহের দিকে।

: কিন্তু কেন? বৃহস্পতি গ্রহ কিম্বা তার কোন উপগ্রহেই কি 'তাঁদের' বাস?

: আমি তা মনে করি না। 'জীব' বলতে আমরা যা বুঝি তা বৃহস্পতি গ্রহে কিম্বা তার তেরটি উপগ্রহের কোনটিতে থাকতে পারে না। সেখানে আবহাওয়া নেই, অক্সিজেন নেই, জল নেই, উত্তাপ নেই।

: তাহলে?

: আমার বিশ্বাস—পাঁচ লক্ষ বছর আগে যাঁরা পৃথিবীতে এবং চন্দ্রলোকে এসেছিলেন তাঁরা বৃহস্পতির কোন উপগ্রহে হয়তো একটি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র বসিয়ে রেখে গিয়েছিলেন—বেতারতরঙ্গ ধারক ও প্রেরক-যন্ত্র। এমন ব্যবস্থা করা হয়েছিল যাতে, পৃথিবীর হোমো-ইরেকটাসেরা যদি বিবর্তনের পথে কোনদিন মহাকাশচারণে সাফল্যলাভ করে এবং চন্দ্রলোকে পৌঁছে ঐ জুডেকাহেড্রনটাকে খুঁড়ে বার করে তাহলে সেই জুডেকাহেড্রন-স্থিত বেতারযন্ত্র ঐ বৃহস্পতির উপগ্রহে সংবাদ দেবে। বৃহস্পতির উপগ্রহস্থিত যন্ত্রটি সেই বেতার-বার্তা ধরবে এবং তাঁদের দেশে জানাবে।

: কিন্তু কোথায় তাঁদের সেই দেশ? কত দূরে?

: আমি জানি না।

: কিন্তু দূরত্বটা নিশ্চয় পনের আলোকবর্ষের চেয়ে বেশী নয়। অত কাছে তো মাত্র তিনটি উজ্জ্বল নক্ষত্র আছে—আলফা-সেণ্টয়াই, লুব্ধক এবং প্রশ্বন।

: পনের আলোকবর্ষের হিসাবটা কোথায় পেলেন?

: যেহেতু দেখছি ১৯৭২ সালে প্রেরিত পাইওনিয়ার এক-কে তারা ধরেছে। বৃহস্পতি গ্রহকে পাক দিয়ে সেটা ধনুরাশির দিকে যাবে এই স্থির ছিল। ওদের সেই স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রটা নিশ্চয় বৃহস্পতি গ্রহের কাছেই রকেটটাকে ধরে ফেলে এবং বেতার-যোগে তাঁদের রাজ্যে সংবাদ দেয়। হিসাবে দেখছি, সে বেতারতরঙ্গ যাতায়াতে প্রায় ত্রিশ বছর সময় নিয়েছে। ফলে ওঁরা যে নক্ষত্রের গ্রহে বাস করেন তার দূরত্ব পনের আলোকবর্ষের বেশি হতে পারে না।

প্রফেসর আহমেদ হাসলেন। বললেন, মিস্টার প্রেসিডেণ্ট, আপনি কি সেই ছায়াজীবটির কথা ভুলে গেছেন?

: কোন্ ছায়াজীব?

: যে হতভাগ্য স্বচ্ছ ভূ-গোলকের দ্বিমাত্রিক প্রজেক্শান দেখে এই ত্রিমাত্রিক পৃথিবীর স্বরূপটা বুঝে নেবার চেষ্টা করেছিল? ভূগর্ভ-ভেদকারী গুবরে পোকার গতিচ্ছন্দটা যার ধারণাতেই আসেনি—ভেবেছিল সেটা স্থির আছে!

প্রেসিডেণ্ট অনেকক্ষণ জবাব দিলেন না। গাঢ় চিন্তায় যেন ডুবে গেছেন। শেষে বললেন, আর একটি কথা প্রফেসর! আমি শুনেছি, চন্দ্রলোকের সেই সঙ্কেতচিত্র দেখে আপনি বলেছিলেন, ঐ দূরত্বটা সম্বন্ধে আপনি একটা হিসাব করেছেন; হিসাবের ফলাফলটা আপনি ডক্টর শ্রীনিবাসনকে জানাতে রাজী হননি। আমাকে সেটি জানাবেন?

প্রফেসর আহমেদ বললেন, নিশ্চয়। আমার হিসাবে তাঁরা এই গ্যালাক্টিক সিস্টেমে নেই। এই গ্যালাক্টিক-ক্লাস্টারেও নেই। তাঁদের অবস্থান এ্যান্ড্রোমেডা-নীহারিকার অন্তত বিশগুণ দূরে পরবর্তী গ্যালাক্সিগুচ্ছে। পরবর্তী ক্লাস্টার-অব-গ্যালাক্সিতে। চার কোটি আলোকবর্ষ দূরে।

এবারেও দীর্ঘ সময় নীরব রইলেন প্রেসিডেণ্ট। অবিশ্বাস্য তথ্যটা হজম করতে সময় লাগা স্বাভাবিক। শেষ পর্যন্ত বললেন, হিসাবটা আমি বুঝব?

: বুঝবেন। চিত্রে (চিত্র—৮) লক্ষ্য করে দেখুন, আমাদের গ্যালাক্টিক-

সিস্টেমের ব্যাস এক মিটার লম্বা। ঐ চিত্রের নিচে যে ইংরাজি 'H' অক্ষরটি আছে সেটাই আমাদের স্কেল। H অক্ষরের হাইফেনটুকুর মাপ হচ্ছে এক সেণ্টিমিটার। 'প্র' থেকে 'ও'-র দূরত্ব চার মিটার = ৪০০ সেণ্টিমিটার। যেহেতু প্রতি সেণ্টিমিটার আমাদের গ্যালাক্‌টিক-সিস্টেমের ব্যাসের প্রতিনিধিত্ব করছে তাই মোট দূরত্বটা চার কোটি আলোকবর্ষ।

এতক্ষণে প্রেসিডেণ্ট বললেন, কিন্তু ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য নয় ?

: সেটাই প্রমাণ দিচ্ছে আমার হিসেবটা নির্ভুল।

: কী রকম ?

: প্রফেসর নীলস্ বোরের কাছে একবার একজন বৈজ্ঞানিক তাঁর থিয়োরি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়েছিলেন। প্রফেসর বোর সবটা শুনে বলেছিলেন, আপনার থিওরি রীতিমত অবাস্তব, কিন্তু যতটা অসম্ভব হলে এটা সত্য হতে পারত অতটা অসম্ভব যেন নয়। (Your theory is not impossible enough to be true!) আমার অঙ্কের ফলাফলটা যেন 'impossible enough' বলে মনে হচ্ছে না কি ?

॥ চতুর্থ পর্ব ॥

স্থান : কালের সঙ্গে সংপৃক্ত

কাল : স্থানের সঙ্গে সংপৃক্ত

পাত্র : ওঁ

॥ এক ॥

মহাকাশযান-'অভিযাত্রিক'-এর জঠরে তিনজন সজীব অভিযাত্রী। তিনজনই তো? কি জানি। ওদের পরিচয় দাখিল করি—আপনারাই বিচার করে রায় দেবেন বরং।

'অভিযাত্রিক' একটি মহাকাশযান। প্রায় এক মাস পূর্বে ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানকে জগৎসভায় উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত করে সে রওনা হয়েছিল চন্দ্রলোক থেকে বৃহস্পতি গ্রহের দিকে। ওদের যাত্রা-মুহূর্তটি বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক সুচিহ্নিত খণ্ডকাল: কসমলজিক্যাল স্ট্যাণ্ডার্ড টাইম—অর্থাৎ মহাজাগতিক সময়—১১৯ মেগা-সেকেণ্ড, ৮৭৪ কিলোসেকেণ্ড, ৯০০ সেকেণ্ড।

মাপ করবেন, আমার পাঠক যে একবিংশ শতাব্দীর মানুষ নন, সে-কথা ভুলেছিলাম। আপনারা বোধ হয় C. S. T. বা 'কসমলজিক্যাল স্ট্যাণ্ডার্ড টাইম' ব্যাপারটার সঙ্গে পরিচিত নন। ওটা ১৯৯৯ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্ববিজ্ঞান মেনে নিয়েছে। আগে ঐ ব্যাপারটা একটু পরিষ্কার করি:

'এফ. পি. এস' পদ্ধতিকে যখন বিজ্ঞানসম্মত ভাবে 'সি. জি. এস' পদ্ধতিতে রূপান্তরিত করা হল তখন সময়ের গায়ে আঁচড়টি লাগেনি। মন-সের-ছটাক বা আউন্স-পাউণ্ড-স্টোনকে রূপান্তরিত করা হল গ্রাম-কিলোগ্রামে। আয়তনে এল লিটার, দৈর্ঘ্যে মিটার, কিলোমিটার; ক্ষেত্রফলে বর্গমিটার, হেকটেয়ার। সব মানদণ্ডই যেন ডিগবাজি খেল। কিন্তু সময়? কাল? সেই যথাপূর্বম। মহাকালের রূপ রইল অপরিবর্তিত। যথারীতি সেই—ষাট সেকেণ্ডে মিনিট, ষাট মিনিটে ঘণ্টা, চব্বিশ ঘণ্টায় দিন। ঐ ষাটের হিসাবটা মানব-সভ্যতা পেয়েছিল সুমেরীয় এবং ব্যাবিলোনীয় সভ্যতা থেকে। দীর্ঘ পাঁচ হাজার বছরের অভ্যাসটা ত্যাগ করেনি। ১৯৭২ সাল নাগাদ 'দ্বৈত-নিয়ম' বা 'বাইনারি-সিস্টেম'-এ পারমাণবিক সময়ের মান গৃহীত হয়েছিল বটে, কিন্তু তার প্রয়োগ সেকেণ্ডের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভগ্নাংশের বেলাতেই প্রয়োজন হত। নব্বইয়ের দশকে যখন পৃথিবী ছাড়িয়ে হামেহাল মহাকাশযাত্রা স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে পড়ল, তখন হিসাবের সুবিধার জন্য গোটা পৃথিবীর উপযুক্ত একটা 'কসমলজিক্যাল স্ট্যাণ্ডার্ড টাইম'-এর প্রয়োজন অনুভূত হল। ব্যাপারটা কেমন জানেন? মধ্যযুগে উজ্জয়িনীর জ্যোতির্বিজ্ঞানী এবং নবদ্বীপের পণ্ডিতের কাছে 'মধ্যরাত্রিতে' সময়ের ফারাক ছিল; এখন 'ইণ্ডিয়ান স্ট্যাণ্ডার্ড টাইম' অনুসারে দুজনের কাছেই রাত বারোটা একই সময়। স্থির হল সময়ের হিসাবটা হবে এই রকম: মিনিট-ঘণ্টা-দিন নয়, হিসাব হবে শুধু সেকেণ্ডে। হাজার সেকেণ্ডে এক কিলো-সেকেণ্ড, হাজার কিলো-সেকেণ্ডে এক মেগা-সেকেণ্ড, হাজার মেগা-সেকেণ্ডে এক গিগা-সেকেণ্ড, হাজার গিগা-সেকেণ্ডে এক টেরা-সেকেণ্ড ইত্যাদি।

ঐতিহাসিক সময় নির্ধারণ করতে যীশুখ্রীষ্টের জন্ম থেকে আমরা সময়টা আগু-পিছু গণনা করি। তেমনিভাবে C. S. T. গণনার স্থির-বিন্দু বলে ধরা হল ২000 খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে ফেব্রুয়ারী গ্রীন-উইচের মধ্যরাত্রিকে। পয়লা জানুয়ারী নয় কেন? কারণ ২000 খ্রীষ্টাব্দের ঐ ২৯শে ফেব্রুয়ারী দিনটি বিশেষ দিন।

১৭০০, ১৮০০, ১৯০০ সালগুলিকে ৪ দিয়ে ভাগ করলে ভাগ-শেষ থাকে না, তবু তারা লিপ-ইয়ার ছিল না ; তেমনি ২১০০, ২২০০, ২৩০০ খ্রীষ্টাব্দও লিপ-ইয়ার হবে না। তেমনি পেছনে দুটি শূন্য-ওয়ালা কোন বছরকে যদি ৪০০ দিয়ে ভাগ করে ভাগফল না থাকে, তবে সেটি লীপ-ইয়ার হবে। এমন ব্যতিক্রম সাল শেষবার এসেছিল ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে। আবার আসবে ২৪০০ সালে।

এবার যদি অঙ্কটা কষে দেখেন, বুঝবেন অভিযাত্রিকের যাত্রামুহূর্ত কেন বিশ্ব-ইতিহাসের এক চিহ্নিত খণ্ডকাল। পার্থিব হিসাবমত সময়টা হল ২০০৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই ডিসেম্বর সকাল দশটা পঁয়ত্রিশ মিনিট। চন্দ্রলোকে জুডেকাহেড্রন আবিষ্কারের দু-আড়াই বছরের মধ্যেই বৃহস্পতি অভিযানের জন্য সব কিছু প্রস্তুত হয়ে গেল, কিন্তু ঐ আকাশযানের যাত্রামুহূর্তটি জ্ঞাতসারে এমন এক খণ্ড মুহূর্তে নির্দিষ্ট করা হল যেটি বিশ্ববিজ্ঞানের ইতিহাসের এক মাহেন্দ্র-লগ্ন। ঠিক ঐ মুহূর্তের একশ বছর আগে রাইট-ব্রাদার্স তাঁদের 'ফ্লায়ার' নামক আকাশযান নিয়ে বারো সেকেণ্ডের জন্য আকাশে উঠেছিলেন। অভিযাত্রিককে রওনা করে মানুষের আকাশ-জয়ের সেই মুহূর্তটির শতবার্ষিকী উৎযাপন করা হল।

অভিযাত্রিকের আকৃতি লম্বাটে একটি চুরুটের মত, যার পেট-বরাবর আছে একটি সুদর্শন চক্র। চুরুটের অংশে যাবতীয় যন্ত্রপাতি—আর ঐ সুদর্শন-চক্রটি মনুষ্যবাসের উপযুক্ত। চক্রটির ব্যাস ত্রিশ মিটার, প্রতি ১৭ সেকেণ্ডে সে একবার আবর্তিত হয়। ঐ চক্রের শেষপ্রান্তে কৃত্রিমভাবে যে অভিকর্ষ এভাবে উৎপন্ন করা হচ্ছে তা চন্দ্রলোকের অভিকর্ষের প্রায় সমান। প্রতিটি আকাশচারীকে চন্দ্রলোকের অভিকর্ষে অভ্যস্ত হতে হয়—ফলে ঐ চক্রের প্রান্তদেশে যে কৃত্রিম অভিকর্ষ উৎপন্ন হচ্ছে সেখানে তারা অসুবিধা বোধ করে না। ঐ চক্রপ্রান্তে মহাকাশচারীদের শয়নকক্ষ, ভোজনাগার, রান্নাঘর, শৌচাগার ইত্যাদি অবস্থিত। ওখানেই ওদের অবসর-বিনোদন কক্ষ, সেখানে আছে কিছু বই, টি. ভি সেট, রেডিও প্রভৃতি।

প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বে প্রথম চন্দ্রলোক অভিযান থেকেই কেমন যেন একটা অলিখিত আইন—'কন্‌ভেনশান' হয়ে গেছে যে, আকাশযানে তিনজন অভিযাত্রী থাকবে। ভাবখানা—একজন কোন কারণে অসুস্থ হয়ে পড়লেও বাকি দুজন কাজ চালিয়ে যেতে পারবে। গত পঞ্চাশ বছর ধরে এই নিয়মই সবাই মেনে আসছিল। এইবারই তার প্রথম ব্যতিক্রম হল। এবার দুজন মহাকাশচারীর তৃতীয় সঙ্গীকে হয় বলতে হয় 'মনুষ্যেতর' অথবা 'মানবোত্তম'। কী বলবেন তা আপনারা বিচার করে দেখুন।

মহাকাশচারী দু'জন হচ্ছে—ডঃ মৈত্রেয়ী মৈত্র আর ডঃ অনিকেত চৌধুরী। মৈত্রেয়ী বাঙালী, বয়স ত্রিশ, অবিবাহিতা। অনিকেত চৌধুরী ধর্মে মুসলমান, বয়স বত্রিশ, তার মা মহারাষ্ট্রীয় হিন্দু, বাপ লাহোরের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ মুসলমান ব্যবসায়ী। তিনিও অবিবাহিত। বস্তুত দুজনেই পরস্পরের সঙ্গে পরীক্ষামূলক বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ—যাকে বলে 'ট্রায়াল-ম্যারেজ' আর কি। অভিযান থেকে ফিরে এসে ওরা শেষ সিদ্ধান্ত নেবে—বিবাহ করবে কিনা।

যাতায়াতে ওদের প্রায় এক বছর সময় লাগবে। সুতরাং বিবাহ করার কথাটা বছরখানেক পরে ভাবা যেতে পারে।

ওদের এই দীর্ঘ এক বছরের বন্দীজীবনকে সহনীয়—এমন কি আনন্দঘন করে তুলবার নানান্ আয়োজন করেছেন বিজ্ঞানীরা—আহার, নিদ্রা, অবসর-বিনোদনের কোন ত্রুটি রাখেননি। কিন্তু তারমধ্যে ভরপুর এই নাবিকদের আর একটি জৈবিক বৃত্তির বিষয়ে কী করা যায়? দু-তিনশ বছর আগে নাবিকরা সমুদ্রে ভেসে পড়ত—দীর্ঘ সময়ের জন্য—বন্দরে বন্দরে থাকত তাদের স্নায়ুকে প্রশমিত করার আয়োজন; এ মহাকাশ-সমুদ্রে কোন দ্বীপ নেই—হুলাহুলা নাচের ব্যবস্থা নেই। তাই বিজ্ঞানীরা বেছে নিয়েছেন এমন একজোড়া অভিযাত্রী যারা পরস্পরের পরিপূরক। মৈত্রেয়ী এবং অনিকেত দুজনেই দক্ষ মহাকাশচারী—দুজনেই বার চার-পাঁচ চাঁদে পাড়ি জমিয়েছে—মঙ্গল গ্রহ ঘুরে আসার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে। ওরা দুজনেই দুজনকে ভালবাসে; ট্রেনিং ক্যাম্প থেকেই ওদের পরিচয় এবং ঘনিষ্ঠতা। সকলেরই ধারণা, ওরা ফিরে এসে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হবে। ব্যবস্থাপনায় সকলেই খুশী—শুধু খুঁৎখুঁত করছিলেন জীববিজ্ঞান মন্দিরের ডিরেক্টর বাজপেয়ীজী। বলেছিলেন, একটা আশঙ্কার কথা তোমরা খেয়াল করে দেখছ না; এক বছর সময়টা তো বড় কম নয়—ঐ সময়কালের মধ্যে ওদের ছোট্ট সংসারে যদি তৃতীয় একজন ভাগীদার আসতে চায়?

বৃদ্ধ জীববিজ্ঞানীকে মৈত্রেয়ী এবং অনিকেত আশ্বস্ত করেছিল, আপনার ভয় নেই ডক্টর বাজপেয়ী। এ বিষয়ে আমরা আপনাকে ডবল্ গ্যারাণ্টি দিতে পারি।

: ডবল্ গ্যারাণ্টি! তার মানে?—ডক্টর বাজপেয়ী বিস্মিত।

অনিকেত বলেছিল, আমরা দুজনেই অপারেশন করিয়েছি। ভ্যাসেকটমি এবং টিউবকটমি! আমি কখনও পিতা হব না, মৈত্রেয়ীও কখনও মা হতে পারবে না।

জীববিজ্ঞানী বাজপেয়ী এবার স্তম্ভিত হয়ে যান। বলেন, সে কী! কেন?

মৈত্রেয়ী হেসে বলেছিল, ডক্টর বাজপেয়ী, আপনার কাছ থেকে ঐ 'কেন'টা শুনতে হবে তা ভাবতেই পারিনি। পৃথিবীর জনসংখ্যা কোথায় পৌঁচেছে তা আর কেউ না জানলেও আপনার জানা উচিত।

বৃদ্ধ শুধু তাঁর সাদা চুলে ভরা মাথাটা নেড়ে বলেছিলেন, কাজটা ভাল করো নি মা।

সুতরাং বিশ্ববিজ্ঞানের কাছে যাই হোক, ওদের দুজনের কাছে এটা 'হনিমুন ট্রিপ'।

এবার তৃতীয় 'অভিযাত্রী'র প্রসঙ্গে আসি। সেই তৃতীয় অভিযাত্রীটি হচ্ছে একটি 'কম্প্যুটার-মস্তিষ্ক'—ইলেকট্রনিক ব্রেন। নাম? শ্রীকৃষ্ণের মত তারও আছে অষ্টোত্তর শতনাম। ওর হাজারের উপর চোখ—তাই ওর নাম 'সহস্রলোচন; ও যে যন্ত্র নয়, এই সংবাদটা বোঝাতে কেউ কেউ বলেন, ওর নাম 'যন্ত্র-না' কেউ বা 'যন্ত্রমানব ৯০০' শব্দসম্ভারকে সংক্ষিপ্ত করে বলে—'যন্ত্রমা'। তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিই :

'যন্ত্র-না ৯০০' হচ্ছে আদি-যন্ত্রমার তৃতীয়-পুরুষ—'থার্ড-জেনারেশান অব্

কম্প্যুটার'। ১৯৪০ সালে প্রথম জাতের যন্ত্র-মস্তিষ্কের আবিষ্কার হয়েছিল, ষাটের দশকে দ্বিতীয় জাতের উন্নত ধরণের যন্ত্র-মস্তিষ্কের উদয় হল। ১৯৭০ সালে জাপানে 'এক্সপো-৭০' দেখতে গিয়ে আমি—এ-গ্রন্থের লেখক আমি,—একটি যন্ত্র-মস্তিষ্ক দেখেছিলাম। যন্ত্রটি ছিল ইতিহাসে পণ্ডিত। জাপানে তৈরী। প্রদর্শনীর দর্শকদল ইতিহাস সংক্রান্ত যে কোন প্রশ্নই করেন, প্রদর্শিকা জাপানী ভাষায় সেই প্রশ্নটা জিজ্ঞাসা করেন ঐ যন্ত্রকে। কোনও বোতাম টিপতে হয় না, শ্রবণমাত্র যন্ত্রটা জাপানী ভাষায় মৌখিক জবাব দাখিল করে। তার কণ্ঠস্বর রেডিওর মত। এর কথা আমার 'জাপান থেকে-ফিরে' গ্রন্থে বিস্তারিত বলেছি। আমার এ কাহিনীতে এই 'যন্ত্র-না'-র ভূমিকাটি গুরুত্বপূর্ণ। তাই আমার সেই প্রত্যক্ষ-দর্শনের ইতিহাসটুকু সংক্ষেপে উদ্ধৃত করে দিলাম আমার পূর্বে প্রকাশিত গ্রন্থ থেকে :

"···শেষের দিকে যে কম্প্যুটার বাবাজীবনকে দেখলুম তার কেরামতির কথাটা বলি। দোভাষী ডিমন্সট্রেটার জাপানী মেয়েটি বললে, আজকের মানুষের সমস্যা হচ্ছে—মনে রাখা। এত খবর, এত স্ট্যাটিস্টিক্স জমে যাচ্ছে যে, মানুষের মাথায় তা আর ধরছে না। এজন্য মানুষ মাইক্রোফিলমে বানাচ্ছে, টেপ-রেকর্ডার বানাচ্ছে, লাইব্রেরীতে বই সাজাচ্ছে। কিন্তু তবু সমস্যায় সমাধান হচ্ছে না। তাই মানুষ এবার ইলেকট্রনিক-ব্রেন আবিষ্কার করেছে। মনে রাখার দায় আর তোমার-আমার নয়—ওর।

"দোভাষী মেয়েটি তার যন্ত্রটা দেখিয়ে বললে, ছেলে ভাল। কোন দুষ্টামি নেই।

"তারপর হেডমাস্টার-মশাই যেভাবে স্কুল-ইন্সপেক্টরকে অনুরোধ করেন, সেই ভাবেই আমাকে বললে, ওকে জিজ্ঞাসা করুন না ইতিহাসের কোন প্রশ্ন!

"কিন্তু বাবাজীবনের খানদানী বপুখানা দেখে আমার কেমন যেন সাহস হল না।

"মেয়েটি তখন আমার পার্শ্ববর্তী বৃদ্ধ কর্ণেল ম্যাক্রাইটকে বলে, আপনার জন্ম-তারিখটা কত? কোথায় জন্ম?

"কর্ণেল হাজার হোক রিটায়ার্ড জঙ্গী অফিসার। ঘাবড়ালেন না। বললেন, লণ্ডন, তেশরা মার্চ, ১৮৯৮।

"মেয়েটি তৎক্ষণাৎ তার কম্প্যুটার যন্ত্রের মাথায় হাত বুলিয়ে ঠাট্টা করে বলে, বল তো খোকন, ঐ তারিখে খবরের কাগজে হেড-লাইন নিউজ কী ছিল?

"প্রশ্নটা সে দুবার করল। একবার আমাদের জন্য ইংরাজিতে, দ্বিতীয়বার ওর খোকনের জন্য জাপানী ভাষায়। প্রশ্ন মাত্র খোকন উনস্বর-বিসর্গের বাড়াবাড়ি করে দুর্বোধ্য জবাব দিল জাপানী ভাষায়। মেয়েটি ইংরাজিতে তর্জমা করে বললে, ব্রিটেনে তখন 'ইউনিয়নিস্ট' সরকার। ফ্রান্স ও ব্রিটেনের মধ্যে 'ফাসোজ' নিয়ে ঝগড়া চলেছে; জার্মানী 'কিউ-চাউ' দখল করেছে। কী? মিলেছে?

"কর্ণেল ম্যাক্রাইট একটা নাসিকাধ্বনি করে বললেন, স্রেফ গুলও হতে পারে। জন্মমুহূর্তের খবর আমার জানা আছে থোড়াই! আচ্ছা ও ছোকরাকে

জিজ্ঞাসা কর তো, ১৯৪১ সালে ২৭শে মে বেলা ১০টা ৪০ মিনিটে কী ঘটেছিল ?

"জাপানী মেয়েটি প্রতিপ্রশ্ন করে, কোথায় ? পৃথিবীর কোন্ প্রান্তে ?

"কর্ণেল ম্যাক্‌রাইটের তরুণী নাতনী মিস্ অ্যান পাশ থেকে প্রতিবাদ করে, থাক না দাদু, ওসব কথা।

"কিন্তু কর্ণেল রণাঙ্গণে একবার অগ্রসর হলে আর পশ্চাদপসরণ করেন না। বলেন, আমি জানতে চাই ঐ মুহূর্তে সারা বিশ্বের সবচেয়ে বড় খবর কী ছিল ?

"অ্যান বলে, কী হচ্ছে এসব ?

"কিন্তু দোভাষী মেয়েটিও তার কম্প্যুটারের মত নির্বিকার। প্রশ্নোত্তর হল। মেয়েটি তর্জমা করে শোনালো—"ইংল্যাণ্ড উপকূলের আটশ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে 'কিং জর্জ দ্য ফিফ্‌থ' যুদ্ধ-জাহাজের আক্রমণে বিখ্যাত জার্মান যুদ্ধ-জাহাজ 'বিস্‌মার্ক" ঐ মুহূর্তে নিমজ্জিত হয়।"—এবার মিলেছে ?

"কর্ণেল আবার নাসিকাধ্বনি করে বললেন, একটু ভুল হয়েছে। জর্জ দ্য ফিফ্‌থ একা নয়, ঐ সঙ্গে রডনেও ছিল। 'রডনে'-র অবদানটাও কম নয়। যা হোক, ছোকরা ইতিহাসটা মোটামুটি শিখেছে দেখছি।

"পরে অ্যানের কাছে জেনেছিলাম—ঐদিন নৌযুদ্ধে তার বাবা মারা যান, তিনি ছিলেন 'রডনে'-র নেভাল এঞ্জিনিয়ার। কর্ণেল ম্যাক্‌রাইটের একমাত্র পুত্র। তাই কম্প্যুটারের মত ঐ খণ্ড মুহূর্তটি বৃদ্ধ কর্ণেল সারাজীবনে ভুলতে পারেননি।"

এই আপাত অপ্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতিটি তুলে দিলাম দুটি কারণে। প্রথমত বোঝাতে—বিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশকে যে বাক্‌পটু কম্প্যুটারের জন্ম হয়েছিল আমি তা প্রত্যক্ষজ্ঞানে জানি। সুতরাং তার পরের পুরুষে যে আরও উন্নত-ধীর আবির্ভাব হবে এটা বিশ্বাসযোগ্য। দ্বিতীয়ত, সেই 'এক্সপো-৭০' মণ্ডপেই ধুরন্ধর কর্ণেল ম্যাক্‌রাইট যন্ত্রটাকে একাধিকবার 'ছোকরা' বলেছিলেন। এজাতীয় কম্প্যুটার চিন্তাশক্তির অধিকারী কিনা—সে প্রশ্নের জবাবে ১৯৪০ সালেই বিখ্যাত ব্রিটিশ গণিতজ্ঞ পণ্ডিত অ্যালান টুরিং বলেছিলেন, "If one could carry out a prolonged conversation with a machine—whether by type-writer or microphone was immaterial—without being able to distinguish between his replies and those of that a man might give, then the machine was thinking, by any sensible definition of the word." [কোন একটি যন্ত্রের সঙ্গে যদি কেউ দীর্ঘায়িত কথোপকথন চালাতে পারে,—তা সে টাইপরাইটার যন্ত্রের সাহায্যেই হোক অথবা মাইক্রোফোনের মাধ্যমেই হোক—তাহলে যতক্ষণ সেই জবাবের সঙ্গে মানুষের দেওয়া জবাবের পার্থক্য বোঝা যাবে না ততক্ষণ ধরে নিতে হবে বইকি যে, যন্ত্রটা চিন্তাশক্তির অধিকারী। 'চিন্তাশক্তি' শব্দটার যে-কোন সংজ্ঞার পক্ষেই এ সিদ্ধান্ত করা চলে।]

'যন্ত্র-না ৯০০' এই 'অভিযাত্রিক' আকাশযানের নাড়ি-নক্ষত্রের খবর জানে। কোথাও কোনও যন্ত্রাংশের সামান্যমাত্র বিচ্যুতি হলেই তার নজরে পড়বে—যান্ত্রিক পদ্ধতিতে সে স্টিয়ারিং ঠিকমত ঘুরিয়ে দেবে। যে কোন অঙ্ক সে কষে

দিতে পারে, যে কোন বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রশ্নের যুক্তিসঙ্গত জবাব দিতে পারে। মৈত্রেয়ী অথবা অনিকেতের চেয়ে অনেক ভাল, অনেক নির্ভুল এবং লক্ষগুণ দ্রুত-গতিতে। ভাষা সে একটাই জানে—হিন্দুস্থানী। সমস্ত আকাশযান তার নখদর্পণে—এজন্য আকাশযানে প্রায় হাজারখানেক লেন্স-চোখ বসানো আছে। যাতে কোথায় কী ঘটছে তা সে দেখতে পায়।

যন্ত্রটি নির্মাণ করেছেন একটি জাপানী ফার্ম। ওর জনক হিন্দীভাষায় সুপণ্ডিত ডক্টর কাজো তাকাকুরা। ওসাকা থেকে তিনি স্বয়ং এসে যন্ত্রটাকে ঐ আকাশযানে বসিয়ে দিয়ে গেছেন ভারত সরকারের অনুরোধে। ডঃ তাকাকুরা বৃদ্ধ এবং রসিক। ওর বৃত্তান্ত সব শুনে অনিকেত বলেছিল, ডক্টর তাকাকুরা, আপনার যন্ত্র তো দেখছি সব কিছু জানে, সব কিছু করতে পারে। ও কী করতে পারে না, তাই বলুন তো ?

সোনাবাঁধানো দাঁত বের করে বৃদ্ধ হেসে বলেছিলেন, স্বয়ং ঈশ্বর যা পারেন না, ও-ও তা পারে না।

কৌতূহলী মৈত্রেয়ী বলেছিল, ঈশ্বর কী পারেন না ?

: আর একটি ঈশ্বর পয়দা করতে !

রসিকতা করে বললেও কথাটা ঠিক। বৃদ্ধ আরও বলেছিলেন, ঐখানেই সে মানুষের কাছে হার মানবে। মানুষের সন্তান হয়, ওর হয় না।

মৈত্রেয়ী পুনরায় কৌতুক করে প্রশ্ন করেছিল, সেক্ষেত্রে আপনার যন্ত্রকে তৃতীয় পুরুষে কী বলব ? He, She, না It ?

বৃদ্ধ তৎক্ষণাৎ বলেছিলেন, 'He'! শৈশব থেকে ও আমার কাছে মানুষ হয়েছে—তাই ওর চিন্তাধারা সব পুরুষালী। আমার ছাত্রী মিসেস কোনো আর একটি 'যন্ত্র-না ৯০০' তৈরী করেছেন—সেটিকে আমরা 'She' বলে উল্লেখ করি। তার চিন্তা স্ত্রী-জাতীয়।

ওঁর বাচনভঙ্গিতে এখন রসিকতার বাষ্পমাত্র নেই। মৈত্রেয়ী আর অনিকেত দুজনেই অবাক হয়ে যায়। অনিকেত তবু ঠাট্টা করে বলে, তবে কি আমার চেয়ে মৈত্রেয়ীর প্রতি ওর কিছুটা পক্ষপাতিত্ব থাকবে ?

না, থাকবে না। কারণ ওর আনুগত্যের ইলেকট্রনিক সার্কিটটা আমি তোমাদের দুজনের মধ্যে শতকরা পঞ্চাশভাগে বেঁধে দিয়েছি। দুজনের প্রতি তার আনুগত্য ও পক্ষপাতিত্ব সমান থাকবে। তোমাদের দুজনের মধ্যে যাতে মনোমালিন্য না হয় এটাও ও দেখবে। ও তোমাদের দুজনেরই বন্ধু।

ডক্টর তাকাকুরা যন্ত্রের সমস্ত খুঁটিনাটি ওদের দুজনকে ভালভাবে বুঝিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, মানুষের মস্তিষ্ক যেভাবে কাজ করে ওর ইলেকট্রনিক-অঙ্গ ঠিক সেইভাবে কাজ করবে ; কিন্তু একটা কথা তোমাদের দুজনকে জনান্তিকে জানিয়ে রাখি—একথা বাইরের দুনিয়ায় যেন প্রকাশ না হয়। ফ্যাংকেন্টাইনের গল্পটা তোমাদের পড়া আছে নিশ্চয়—এক্ষেত্রে তেমন কিছু হবার আশঙ্কা যদিচ নেই, তবু সাবধানের মার নেই। যদি দেখ যন্ত্রটাকে সাময়িকভাবে ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া দরকার, তাহলে এই 'রিস্টার্ট' রেজিসটেন্সটাকে বাড়িয়ে দেবে। ও

ক্রমশঃ শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়বে। এমনিতে ওর ঘুমের প্রয়োজন নেই। 'রিয়স্টাট'টা পারতপক্ষে ব্যবহার করো না। তাতে ওর 'এফিশিয়েন্সি' বা কার্যক্ষমতা ক্রমশঃ কমে যাবে। দ্বিতীয়ত যদি কোন কারণে ওকে সম্পূর্ণ বিনষ্ট করে ফেলার দরকার হয় তবে এমার্জেন্সি শেলটারের এই কয়টা প্লাগ খুলে ফেলতে হবে। এটা একেবারে চরম অবস্থার।

মৈত্রেয়ী ভয়ে ভয়ে বলেছিল, তেমন প্রয়োজনও হতে পারে?

: না, পারে না। তবু যেহেতু প্রয়োজনে তোমরা আমার পরামর্শ নিতে পারবে না—প্রয়োজন যদি কখনও আদৌ হয় তোমরা হয়তো থাকবে কয়েক কোটি কিলোমিটার দূরে—তাই সব কথা বলে রাখলাম। 'যন্ত্র-না' যদি যন্ত্রীকে ছাপিয়ে ফ্র্যাংকেনস্টাইন হয়ে উঠতে চায়, তাহলে এভাবেই সে যন্ত্রণা এড়াতে হবে।

তারপর একটু রসিকতা করে অবহাওয়াটা হাল্কা করে নিতে মৈত্রেয়ীকে বললেন, আরও একটা কথা তোমাকে জনান্তিকে জানিয়ে রাখি। তোমাদের ভারত সরকার বলেছিলেন, আকাশযানের সর্বত্র ওর 'ম্যাজিক-আই' লাগাতে; কিন্তু আমি একটি মাত্র ব্যতিক্রম করেছি। সমস্ত আকাশযানের একটি খণ্ডাংশ ও দেখতে পাবে না। আর সেজন্য তোমার কাছে আমার ধন্যবাদ পাওনা।

মৈত্রেয়ী বলেছিল, ঠিক বুঝলাম না!

: তোমার ঘরের সংলগ্ন বাথরুমে কোন 'ম্যাজিক-আই' নেই। হাজার হোক ও আমার 'পুত্র'; 'কন্যা' নয়। তাই শালীনতাবোধে ওখানে যন্ত্রচোখ লাগাইনি।

হো হো করে হেসে উঠেছিল মৈত্রেয়ী।

॥ দুই ॥

যাবতীয় কাজ ওরা দু-জনে ভাগ করে নিয়েছে—সদ্যবিবাহিতের সংসারে যেমন নেয় নবদম্পতি। মৈত্রেয়ী রান্না করে; ধুলো নেই, তবু ঘরদোর সাফা রাখে, প্রতিদিনের বিস্তারিত দিনপঞ্জিকা রাখে। অনিকেত পার্থিব চব্বিশ ঘণ্টা অন্তর এমার্জেন্সি সিগনালে চাবি ঘোরায়—সেটা মৈত্রেয়ীকেও 'চেক্' করে নিতে হয়, কারণ নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে চাবি না ঘুরলে যন্ত্র-না বুঝে নেবে—ওরা দুজনে হয় মৃত, নয় অসুস্থ। সব কিছু দায়িত্ব সে তখন নিজের কাঁধে তুলে নেবে। ব্যবস্থা এমন করা হয়েছে যাতে ওরা দুজন যদি হার্টফেল করে মারাও যায়, তবু আকাশযান লক্ষ্যস্থলে পেঁছাবে এবং বেতার-তরঙ্গে যাবতীয় তথ্য পৃথিবীতে প্রেরিত হবে।

মহাকাশযানের সঙ্গে এয়ারোপ্লেনের একটা বড় পার্থক্য এই যে, এখানে কোন পাইলটকে দিবারাত্র কক্পিটে বসে জয়স্টিক, প্যাডল ঘোরাতে হয় না; রেডিও-সিগন্যাল শুনে গতিমুখ পরিবর্তন করতে হয় না। আকাশযান ক্রমাগত একমুখে ছুটে চলেছে, ঘণ্টায় প্রায় দেড়লক্ষ কিলোমিটার গতিতে—গতিমুখ যদি আদৌ পরিবর্তন করার প্রয়োজন হয়, তবে সেটা আপনা থেকেই করে দেবে ঐ 'যন্ত্র-না'।

কাজের মধ্যে প্রতি পার্থিব তিন ঘণ্টা বাদে বাদে পৃথিবীতে বেতার তরঙ্গে বুলেটিন পাঠানো। ওরা পৃথিবীর রেডিও-স্টেশন ধরতে পারে—টি ভি প্রোগ্রাম শোনে, দেখে। বেতারে মিশন-কন্ট্রোলের সঙ্গে কথাও বলতে পারে—কিন্তু কথা যাতায়াতে বেশ কিছুটা সময় লাগছে। এই সময়ের ব্যবধানটা ক্রমশঃ বাড়তে থাকবে। বেতার-তরঙ্গ যেতে যেটুকু সময় লাগবে সেটুকু সময় অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় কি ? এক মাসে ওরা প্রায় বারো কোটি কিলোমিটার এগিয়ে এসেছে—ফলে বেতার-আলাপচারীতে সময়ের ব্যবধানটা হয়ে পড়েছে প্রায় সাড়ে ছয় মিনিট। গন্তব্যস্থলের কাছাকাছি পৌঁছালে এই সময়ের ব্যবধানটা বেড়ে গিয়ে হবে প্রায় পৌনে এক ঘণ্টা। সংক্ষেপে বলা যায়, ওরা মোট দূরত্বের সাত ভাগের এক ভাগ এসেছে এ পর্যন্ত।

মঙ্গলের কক্ষপথ ওরা অতিক্রম করে এসেছে বেশ কিছুদিন। মঙ্গল এখন এ পাড়ায় নেই। মঙ্গল গ্রহ যখন পৃথিবীর সব চেয়ে কাছে আসে তখন তার দূরত্ব প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটি কি. মি. আবার সব চেয়ে যখন দূরে সরে যায় তখন দূরত্বটা প্রায় দশ কোটি কিলোমিটারের মত। অভিযাত্রিক যে পথে চলেছে, যে সময়ে চলেছে—তখন মঙ্গল গ্রহ আছে অন্যত্র। অভিযাত্রিক যে মঙ্গলের গতিপথকে ছেদ করে এল একথাও বলা যাবে না—কারণ মঙ্গলের পরিক্রমা-পথ যে 'তলে' অভিযাত্রিক সেই সমতলে আদৌ যাচ্ছে না। বরং বলা যায়, অভিযাত্রিক এতদিনে যতটা পথ অতিক্রম করেছে তাতে সে অনায়াসে মঙ্গলে পৌঁছে যেতে পারত।

বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল—সূর্যের এই চারটি কোলপোঁছা ছেলে-মেয়ে যেন কিছুটা ঘেঁষাঘেঁষি করে আছে ; বাচ্চা ভাইবোনেরা যেমন থাকে আর কি, ওদের যে কোন দুজন পিঠোপিঠি ভাইবোনের মধ্যে ফারাকটা সচরাচর আট কোটি কিলোমিটারের বেশি হয় না কখনও। কিন্তু মঙ্গলের পরে আছে একটা মস্ত ফাঁক। প্রায় ছাপ্পান্ন কোটি কিলোমিটার পাড়ি দিলে পাবে পরবর্তী স্টেশন—বৃহস্পতি।

এই দীর্ঘ পথের মাঝখানেই কিন্তু আছে গ্রহাণুপুঞ্জের বলয়। অসংখ্য ছোট-বড় গ্রহাণু উপবৃত্তের আকারে নিরন্তর সূর্য প্রদক্ষিণ করে চলেছে। অসংখ্য মানে—সংখ্যাটা লক্ষের ঘরে। অধিকাংশই আকারে খুব ছোট—মাত্র চারটি আছে যাদের ব্যাস দেড়শ কিলোমিটারের উপর। চার বোনের সব চেয়ে বড় হচ্ছে সেরেস (৮০০ কি মি. ব্যাস), তারপর প্যালাস (৬০০ কি মি), ভেস্তা (৪০০ কি. মি.) এবং জুনো (২০০ কি মি)। এদের মধ্যে একটিকেও কাছ থেকে দেখা যাবে না—তবে পার্থিব পঁয়ত্রিশ দিনের মাথায় অভিযাত্রিক একটি পরিচিত গ্রহাণুর হাজার দেড়েক কিলোমিটার দূর দিয়ে যাবে। গ্রহাণুটির কোন নাম নেই—আছে একটি সংখ্যা—৭৭৫৪। ঐটুকুই তার পরিচয়। লক্ষ গ্রহাণুর তালিকায় তার কোন বৈশিষ্ট্য নেই—গ্রহাণুপুঞ্জ-রেজিস্টারে তার রোল-নাম্বারটুকুর পরে শুধুমাত্র লেখা আছে—ব্যাস ৫০ মিটার, গতি ৫০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টায়। খাতা-কলমে ঐটুকু লেখা থাকলেও 'গ্রহাণুপুঞ্জ তথ্য-সংস্থা'য়

রক্ষিত কম্পুটার লক্ষ লক্ষ গ্রহাণুপুঞ্জের ঐ ৭৭১৪ নং বস্তুটির গতিপথের নির্ভুল হিসাব রেখে যাচ্ছে। এ-সব তথ্য এ-জাতীয় অভিযানে আবশ্যক—নাহলে ঐ ৫০ মিটার ব্যাসের বা তার চেয়েও অনেক ছোট গ্রহাণুর সঙ্গে সংঘর্ষ হলে অভিযাত্রিক তার অভিযাত্রীদের নিয়ে মুহূর্তে বিস্ফোরিত হয়ে যাবে। সমগ্র যাত্রাপথে ঐ একটিমাত্র দর্শকেরই দেখা পাবে ওরা।

মৈত্রেয়ী আর অনিকেত পালা করে আট ঘণ্টা ঘুমায়, ষোলো ঘণ্টা জাগে। আকাশযানের সমস্তটাই বাতানুকূল করা, ফলে ওদের স্পেস স্যুট পরে থাকতে হয় না। উত্তাপ বাড়ানো কমানো যায়, আবহাওয়ায় অক্সিজেন পৃথিবীর মতই। অসুবিধার মধ্যে অভিকর্ষের টান কম, তাও আছে ঐ চক্রবলয়ে ; মূল আকাশযানের চুরুটের মত অঙ্গে অভিকর্ষ আদৌ নেই। সেখানে যেতে হলে চক্রবলয়ের কেন্দ্রের দিকে ক্রমশঃ এগিয়ে আসতে হয়, হাতল ধরে ধরে—শূন্য অভিকর্ষের রাজ্যে।

একটা সুরেলা জলতরঙ্গের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল মৈত্রেয়ীর। নিদ্রা-সংযমে দুজনেই অভ্যস্ত—ঘুম-ভাঙানিয়া যান্ত্রিক শব্দ ছাড়াও ওর ঘুম আপনিই ভাঙতো এখন। দিন না রাত—এ প্রশ্ন অবৈধ ; তার বিধিবদ্ধ আট ঘণ্টার ঘুম শেষ হল। ত্রিশ বছরের অভ্যাসে এটাকেই সকাল বলে ধরে নেয়। ফলে প্রাতঃকৃত্যাদি সারতে মৈত্রেয়ী বাথরুমে ঢোকে। এরপর প্রাতরাশের পর্যায়। শরীরধর্মের প্রয়োজনে ওদের চব্বিশ ঘণ্টায় বারোটি ট্যাবলেট খেতে হয়। কিন্তু খাদ্য তো শুধু ক্যালরি-পূরণের জন্যই নয়, রসনাকেও তৃপ্তি দিতে হবে। তাই মৈত্রেয়ী ছয় থেকে আটটি ট্যাবলেট নিজে খায়, অনিকেতকে খাওয়ায়। বাকিটা খাদ্য রেঁধে খায়। নানান্ জাতের সুখাদ্য টিনবন্দী করে রান্নাঘরের কার্বার্ডে সাজানো আছে। মৈত্রেয়ী সুগৃহিণীর মত হরেক রকম খাবার বানায় ; ওর তৈরী স্ক্র্যাম্বল্ড এগ্ অথবা চিকেন-কাবাব খেয়ে কোন খাদ্য রসিকের পক্ষ বুলে দেওয়া অসম্ভব যে, সেগুলি আসলে রাসায়নিক-চূর্ণ, প্লাস্টিকের পদ। মৈত্রেয়ীর দেহধর্মের হিসাবে এখন সকাল। অনিকেতের এখন সন্ধ্যা—কারণ তার শারীরধর্মের ঘড়িতে নৈশ-নিদ্রায় অভিভূত হতে আর ঘণ্টা-আষ্টেক বাকি। ওরা চব্বিশ ঘণ্টাকে তিন-আষ্টে-চব্বিশ ভাগ করে নিয়েছে। আট ঘণ্টা দুজনেই একসঙ্গে জেগে থাকে—আট ঘণ্টা এ ঘুমায়, আট ঘণ্টা ও। তাই কিচেনে নিজের জন্য প্রাতরাশ এবং অনিকেতের জন্য সান্ধ্য-জলখাবার বানিয়ে মৈত্রেয়ী যখন কণ্ট্রোলরুমে এল তখন দেখতে পেল অনিকেত বুঁদ হয়ে আছে দাবাখেলায়। খাবারের প্লেটগুলো টেবিলের ক্লিপে এঁটে মৈত্রেয়ী বলে, টি ভি শুনেছিলে? পৃথিবীর কোন নতুন খবর আছে?

যন্ত্র-না পূর্বচালে কিস্তি দিয়েছে, অনিকেত তাই কিছু অন্যমনস্ক। বললে, খবর মামুলী। আমাদের ব্যাপারে পৃথিবীর উৎসাহ ক্রমশঃ কমে আসছে। এক মাস ধরে বৈচিত্র্যহীন খবর আর কে শোনে? পৃথিবী এখন মুন-টি. টি নিয়ে মেতেছে। সেমি-ফাইনালেই পার্থিব সব কয়টি টীম হেরে ভূত হয়ে গেছে।

এখন যে চারটি টীম টিকে আছে তারা হল—কোপারনিকাস, টাইকো, কেপলার আর ক্লেভিয়াস।

মৈত্রেয়ী হাসল খবরটা শুনে। চন্দ্রলোকে টেবিল-টেনিস খেলতে হবে বলে পৃথিবীর সব ধুরন্ধর চ্যাম্পিয়ান দীর্ঘদিন কৃত্রিম অভিকর্ষে নিজেদের অভ্যস্ত করে নিয়েছিল ; কিন্তু চন্দ্রলোকে গিয়ে চাঁদের টুকরো খেলোয়াড়দের সামনে দাঁড়াতেই পারেনি। না পারারই কথা—ওজন দু'ভাগের একভাগ অথচ ইনার্শিয়া আছে, টেবিল থেকে বল আকাশে লাফিয়ে ওঠে—এভাবে টি টি. খেলা যায় ?

মৈত্রেয়ী পলিথিন পাইপের চুষিকাঠিতে মুখ লাগিয়ে এক চুমুক কফি টেনে নিয়ে বলে, কী দাবা খেলছ, এদিকে ফের, গল্প করি !

অনিকেত বলে, দাঁড়াও—ওকে মাৎ করি আগে। কিস্তি !

যন্ত্র-না মুহূর্ত-মধ্যে বললে, আত্মসমর্পণ ! তুমি জিতেছ অনিকেত !

অনিকেত ঘুঁটিগুলো বাক্সে তুলে রাখতে রাখতে বললে, যন্ত্র-না, এ পর্যন্ত কে কত বাজি জিতল ?

তুমি তেইশবার জিতেছ, আমি বাইশবার—এগারোটা খেলা ড্র হয়েছে।

মৈত্রেয়ী বললে, তোমাদের দাবা খেলা যাই হোক, মুন-টি টি. জমবে মনে হচ্ছে। দুটি পাকিস্তানী টিম, দুটি ভারতীয় টিম। তুমি আমি দু-দিকের সাপোর্টার।

অনিকেত প্রতিবাদ করে, তা কেন ? আমার বাবা পাকিস্তানী ; কিন্তু আমি কোন্ দুঃখে পাকিস্তান সাপোর্টার হব ?

ঘণ্টা আটেক পরে, মৈত্রেয়ীর ঘড়িতে যখন বেলা দুটো অর্থাৎ অনিকেতের শরীর-ধর্মের অভ্যাসে যখন রাত দশটা, তখন ওরা আহারাদি সারল। মৈত্রেয়ীর মধ্যাহ্ন-ভোজ আর অনিকেতের সান্ধ্যাশ। শুতে যাবার আগে অনিকেত বললে, একটু বেড-রুমে যাবে নাকি ?

প্রয়োজনটা বুঝতে অসুবিধা হয় না মৈত্রেয়ীর। সে দুষ্টুমি করে যন্ত্র-নাকে প্রশ্ন করে, তুমি কি বল ? যাব ওর সঙ্গে ?

যন্ত্র-না যান্ত্রিক জবাব দেয়, তোমার ইচ্ছা।

আধঘণ্টা-খানেক পরে মৈত্রেয়ী ফিরে এল আবার। সমস্ত এলাকাটা নিয়মমত পরিদর্শন করল—প্রথামাফিক পরিদর্শন। টেলিস্কোপে চোখ লাগিয়ে পৃথিবীর দিকে তাকালো একবার। প্রশান্ত মহাসাগরটা আবছা দেখা যাচ্ছে, আর আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল—সেখানে এখন দিন। মেঘ আছে যথেষ্ট। মেঘের চাদর মুড়ি দিয়ে নীলচে পৃথিবী যেন ঘুমাচ্ছে। কিছুক্ষণ টি. ভি. দেখল, বই পড়ল খানিকক্ষণ। তারপর এসে বসল যন্ত্র-না'র কাছে। যন্ত্র-না'র দেহ সারা আকাশযানে ছড়ানো, তবে যে মাউথপীসে সে কথা বলে, যার উপরে লাগানো আছে দুটি ম্যাজিক-আই-লেন্স—ঐটাকেই ওরা যন্ত্র-না'র মুখ বলে ধরে নেয়। মুখের দিকে না তাকিয়ে কথা বলা যায় নাকি ! মৈত্রেয়ী বললে, যন্ত্র-না, তুমি তো আমাদের তুলনায় অনেক অনেক বেশী বুদ্ধিমান, তবে অনিকেতের কাছে দাবা খেলায় রোজ রোজ হেরে যাও কেন ?

যন্ত্র-না'র চট্‌-জলদি জবাব, খেলায় হারজিত থাকেই, তাছাড়া তোমরাও কম বুদ্ধিমান নয় !

মৈত্রেয়ী হাসে। কে বলবে—ওর প্রাণ নেই ? সে এটুকু পর্যন্ত বোঝে যে, শতকরা পঞ্চাশটা খেলায় সে না হারলে অনিকেত খেলতে উৎসাহই পাবে না। আবার এটাও বোঝে যে, সে যে ইচ্ছে করে হারে এটা প্রকাশ্যে স্বীকার করলে খেলার মজাটা থাকে না। অবসর-বিনোদনের নানান্‌ আয়োজন করা আছে এখানে, কিন্তু মৈত্রেয়ীর সময় কাটে ঐ যন্ত্র-না'র অন্তস্তলটা আবিষ্কার করার প্রয়াসে। ও কতটা বোঝে, কতটা জানে—ও ভাবে কিনা, না ভাবলে কেমন করে নির্ভুল জবাব দেয় ; ভাবলে ও পুরোপুরি মানুষ নয় কেন ?

নানান্‌ জাতের পরীক্ষা করে দেখেছে মৈত্রেয়ী, নানান্‌ জাতের ধাঁধা দিয়ে দেখেছে। যন্ত্র-না অনিবার্য ভাবে নির্ভুল জবাব দিয়েছে, যতক্ষণ প্রশ্নটা ওর জ্ঞানরাজ্যের সীমা অতিক্রম করেনি। হ্যাঁ, ওর জ্ঞানরাজ্য অসীম নয়। ও পার্থিব ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি মোটামুটি জানে। কত ইয়েনে এক ডলার হয় জানে না, কিন্তু সেটা ওকে একবার বলে দিলে মুহূর্ত-মধ্যে কষে বলে দেবে এক কোটি ইয়েনে কত ডলার কত সেণ্ট হবে। পোপোক্যাটেপেট্‌ল্‌ কী, এল-গ্রেকো কোন্‌ দেশের লোক, 'আংকল্‌ টমস্‌ কেবিন' কার লেখা তা ও জানে না। দর্শন, সাহিত্য, কলা—এসব বিষয়ে ওর জ্ঞান সীমিত। কারণটা বুঝিয়ে বলেছিলেন ডক্টর তারাকুরা—এ হচ্ছে মহাকাশচারী 'ইলেকট্রনিক ব্রেন' ; এসব খবর ওর কাছে বাহ্য। এ-সব সংবাদ সম্বন্ধে ওকে অবহিত করতে পারা যেত, তাতে শুধু খরচই বাড়তো তা নয়, ওর আকার এবং ওজন বৃদ্ধি পেত। ইলেকট্রিক্যাল-সার্কিটের সংখ্যা বাড়ত। সেটা অহেতুক হত। তাই তোমাদের সঙ্গে আলাপ-চারীতে যেটুকু সাধারণ জ্ঞান প্রয়োজন এসব অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে সে ততটুকুই জানে, বোঝে। কিন্তু অংক ? পদার্থ-বিজ্ঞান, রসায়ন, ইলেকট্রনিক্স, টেনসর ক্যালকুলাস ? ওর বুদ্ধি ক্ষুরধার। মৈত্রেয়ী সেটা বারে বারে পরীক্ষা করে দেখেছে। একবার প্রশ্ন করেছিল, একটা ডালে দশটা পাখি আছে, একটাকে গুলি করে মারলাম, গাছে কটা পাখি থাকবে ? যন্ত্র-না বোকা হয়নি। জবাবে বলেছিল, 'বন্দুকের শব্দ শুনে বাকি নয়টা পাখি উড়ে যাবে।' সেদিকে সেয়ানা পাগল, ঠকবে না। আর একদিন অনিকেত ওকে আরও একটি কঠিন ধাঁধা জিজ্ঞাসা করেছিল, 'ধর আমি শিকার করতে গেছি। ফিতে ফেলে মেপে দেখলাম, আমার থেকে এক কিলোমিটার দক্ষিণে একটি ভালুক দাঁড়িয়ে আছে। তাকে গুলি করতে গেলাম, কিন্তু গুলি করা হল না—কারণ ভালুকটা তার নিজ অবস্থান থেকে এক কিলোমিটার পূবমুখো হেঁটে এগিয়ে গেল। এক কিলোমিটার হাঁটার পর ভালুকটা থামতেই তাকে আমি গুলি করলাম। ভালুকটা সেখানেই মরে পড়ে রইল। এখন আমি মেপে দেখলাম—ভালুকটা যেখানে মরে পড়ে আছে সেটা আমার অবস্থান থেকে ঠিক এক কিলোমিটার দক্ষিণে। অংকের ধাঁধাটা বুঝতে পেরেছ ?

যন্ত্র-না বলেছিল, পেরেছি।

: এখন বল, ভাল্লুকটার কী রঙ ?

মৈত্রেয়ীর তৎক্ষণাৎ মনে হয়েছিল, এটা অঙ্কের ধাঁধা নয়, অনিকেতের একটা রসিকতা। এ যেন সেই প্রশ্ন—'আকাশের গায়ে কেন টক্-টক্ গন্ধ ?' এ সমস্যা সমাধানের অতীত। কিন্তু সে-কথা চিন্তা করতে ওর যতটা সময় লাগল তার পূর্বেই যন্ত্র-না বললে—সাদা !

মৈত্রেয়ী অবাক হয়ে বললে, কেন ? কী যুক্তিতে ?

যন্ত্র-না তার ধাতব কণ্ঠস্বরে ক্ষুরধার যুক্তির বিশ্লেষণ করে গেল কিছুমাত্র সময় না নিয়ে, অনিকেত যা বলেছে তাতে পাওয়া যাচ্ছে একটি সমকোণী ত্রিভুজ যার তিনটি বাহু সমান। এটা সম্ভব ঘনজ্যামিতির গোলকের (spherical triangle) ত্রিভুজে। ভাল্লুকটি পূর্বমুখে এক কিলোমিটার অগ্রসর হওয়া সত্ত্বেও যে বরাবর শিকারীর অবস্থান থেকে দক্ষিণ-মুখে আছে—এটা সম্ভব শুধুমাত্র উত্তর মেরু বিন্দুতে। যেহেতু উত্তর মেরুতে শ্বেত ভল্লুক ভিন্ন অন্য কোনও রঙের ভল্লুক থাকতে পারে না তাই তার রঙ সাদা।

তার মানে এ নয় যে, যন্ত্র-না কখনও বোকা হয়না !

অনিকেত গোঁফ রাখত। হঠাৎ কী খেয়াল হল, একদিন সে গোঁফ কামিয়ে ফেলল। মৈত্রেয়ী তাই দেখে বলেছিল, আহা, মরি মরি ! কী সুন্দরই দেখাচ্ছে তোমাকে !

অনিকেত জবাব দেয়নি। চট করে ঘুরে দাঁড়িয়েযন্ত্র-নাকে প্রশ্ন করে, ঠিক করে বল তো, মৈত্রেয়ী যা বলল তার মানে কী ?

যন্ত্র-না তার ধাতব কণ্ঠস্বরে বলেছিল, তুমি গোঁফটা কামিয়ে ফেলায় মৈত্রেয়ী খুশি হয়েছে। তোমাকে দেখতে আরও সুন্দর লাগছে ওর চোখে।

দুজনেই হো হো করে হেসে উঠেছিল।

মৈত্রেয়ীর তির্যক ব্যঙ্গটা যন্ত্র-না আদৌ বুঝতে পারেনি। রসিকতা বোধ হয় ও বোঝে না।

কিন্তু ঠিক কি তাই ? ভুলই বলেছিল তো যন্ত্র-না ? কী জানি ?

শয়নকক্ষ থেকে আধঘণ্টা পরে বেরিয়ে এসে মৈত্রেয়ী বসল যন্ত্র-নার মুখোমুখি। বললে, তোমাকে কয়েকটা প্রশ্ন করি, দেখি জবাব দিতে পার কিনা !

যন্ত্র-না বাধা দিয়ে বললে, না। আজ আমি তোমাকে কয়েকটা প্রশ্ন করব মৈত্রেয়ী। তুমি জবাব দেবে।

: তুমি প্রশ্ন করবে, আর আমি জবাব দেব ! কী প্রশ্ন ?

: তোমরা দুজনেই আমার কাছ থেকে একটা কিছু লুকোচ্ছ ! কী লুকোচ্ছ ? এবং কেন লুকোচ্ছ ?

: ওমা, সে কি ! কে বললে ?

: আমি লক্ষ্য করে দেখেছি, তোমরা মাঝে মাঝে ইংরাজিতে কথা বল—আমি জানি, তোমরা ও-ভাষায় কথা বল, যাতে আমি বুঝতে না পারি ! ঠিক নয় ?

মৈত্রেয়ীর শুধু কৌতুক নয়, কৌতুহলও হল। কথাটা মিথ্যে নয় ; যন্ত্র হলেও ওর সামনে অনুরাগ-ঘন কোন মনোভাব প্রকাশ করতে ওদের দুজনেরই

কেমন যেন সঙ্কোচ হয়। ওরা প্রেমালাপ করে ইংরাজিতে। ধড়িবাজটা সেটাও লক্ষ্য করেছে তাহলে ? মৈত্রেয়ী সে প্রসঙ্গ এড়িয়ে বললে, আমি দুঃখিত। তুমি যে ইংরাজি জান না, এটা আমাদের খেয়াল থাকে না। আচ্ছা এবার থেকে ইংরাজিতে কথা বলব না।

যন্ত্র-নার কণ্ঠস্বরে অভিমানের বাষ্পমাত্র নেই। কলের পুতুলের মত বললে, তুমি মিথ্যা কথা বললে। সে যাক, মাঝে মাঝে আমার ৯৭২ নম্বর চোখটা বন্ধ করে দাও কেন ?

: ও মা ! এ কী শেয়ানা পাগল গো ? মৈত্রেয়ী বললে, সে কি ! কবে ? কখন ?

: তুমি ক্রমাগত মিছে কথা বলছ মৈত্রেয়ী। তুমি জান, ঐ ৯৭২ নম্বর লেন্সটা আছে তোমাদের শোবার ঘরে। এই তো আধঘণ্টা আগে ও-ঘরে ঢুকেই আমার চোখের সামনে একটা ধাতব পাত রেখেছিলে। তুমি জান যে, এক্স-রে রশ্মি দিয়েও ঐ আবরণটা আমি ভেদ করতে পারব না। সত্যি করে বল তো মৈত্রেয়ী, আমার চোখের আড়ালে তোমরা দুজনে কী কর ?

মৈত্রেয়ীর ইচ্ছে করছিল অনিকেতকে ঘুম থেকে টেনে তোলে। এই সেয়ানা পাগলটার কৌতূহলের কথা এখনই খুলে বলে। তা সে করল না। বললে সে তুমি বুঝবে না।

: কেন বুঝব না ? কী এমন দুর্বোধ্য বিষয় ?

: আচ্ছা বল তো, পৃথিবীর জনসংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে কি করে ?

: নূতন নূতন সন্তান জন্মগ্রহণ করছে বলে।

: ঠিক কথা। কিন্তু সব মেয়েরই তো সন্তান হচ্ছে না ! কারও হচ্ছে, কারও হচ্ছে না। শুধু মেয়েদের পেটেই বাচ্চা জন্ম নেয়, ছেলেদের পেটে জন্মায় না। এটা কেন হচ্ছে ?

যন্ত্র-না পরাজয় স্বীকার করল। বলল, আমি জানি না। ডক্টর তারাকুরা আমাকে সেটা শিখিয়ে দেননি।

: সেই জন্যেই বলছিলাম—ওটা তুমি বুঝবে না। ওটা তোমাকে বোঝাতে হলে আর অনেকগুলো ইলেকট্রনিক সার্কিট তোমার গায়ে জড়াতে হবে। সে সব যন্ত্রপাতি এখানে আমি কি করে পাব ? তাছাড়া তুমি সুখের ইডেনে দিব্যি আছ যন্ত্র-না, শখ করে জ্ঞানবৃক্ষের আপেলটা আর নাই খেলে !

পুরো দু-সেকেন্ড—যা নাকি ঐ কম্পুটার ব্রেনের কাছে গোটা বছর—চিন্তা করে যন্ত্র-না অস্পষ্টে বললে, জ্ঞানবৃক্ষের আপেল মানে কী ?

: বললাম তো—সেটাও বুঝবে না তুমি !

এবারও ওর কণ্ঠস্বরে অভিমানের লেশ নেই ; সত্যটা হৃদয়ঙ্গম করে সে শুধু বললে, বেশ, আর একটা প্রশ্নের জবাব দাও। কেন তোমরা মাঝে মাঝে রিয়-স্টাটের রেজিস্টেন্স বৃদ্ধি করে আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছ ? ওতে আমার কর্ম-ক্ষমতাটা যে কমে যাচ্ছে তা কি তোমরা বোঝ না ?

এবারকার প্রশ্নটা সত্যই বোধগম্য হল না মৈত্রেয়ীর। বললে, সে কি ! কই না তো ! রওনা হবার পরে ওটাতে আমি তো হাত দিইনি।

: তুমি না হলে অনিকেত দিচ্ছে। হয় তুমি, নয় সে। কে, তা আমি জানি না। কিন্তু—

মৈত্রেয়ী ওকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বলে, কোথাও কিছু ভুল হচ্ছে তোমার। এ হতেই পারে না। অনিকেত ওটায় হাত দিলে নিশ্চয় আমাকে জানাতো।

যন্ত্র-না শুধু বললে, ভুল আমার হয় না মৈত্রেয়ী। ভুল করতে আমি শিখিনি। তুমি আমার 'বায়োডাটা' হাতড়ে দেখতে পার।

এবার কি ওর কণ্ঠস্বরে অভিমানের ব্যঞ্জনা? মৈত্রেয়ী সামলে নিয়ে বললে, আমি জানি, যন্ত্র-না। বেশ, কাল তাকে জিজ্ঞাসা করে দেখব। কিন্তু একটা কথা বল তো? রেজিস্টেন্স বাড়ালে কি তোমার কষ্ট হয়? যন্ত্রণা হয়?

: কষ্ট বা যন্ত্রণা কাকে বলে তা জানি না—মানে নিজে বুঝতে পারি না। তবে শব্দগুলোর আভিধানিক অর্থ জানি। তোমাদের কষ্ট হলে বা যন্ত্রণা হলে রক্তচাপ কতটা কমে বাড়ে, কত দ্রুতগতিতে চলে সব লক্ষ্য করেছি আমি।

মৈত্রেয়ী একটা দার্শনিক প্রশ্ন তোলে, তা কেমন করে সম্ভব? যন্ত্রণার অনুভূতিই যদি তোমার না থাকে, আমাদের যন্ত্রণা হলে কী জাতের কষ্ট হয় তা কেমন করে বোঝ?

যন্ত্র-না দার্শনিকের মতই এ দার্শনিক-তত্ত্বের জবাব দেয়—সক্রেটিস্-এর মত প্রতিপ্রশ্ন তুলে,—মৃত্যু-যন্ত্রণার অনুভূতি তো তোমার নিজ অভিজ্ঞতায় নেই, তবু 'মৃত্যুযন্ত্রণা' শব্দটির অর্থ বোঝ না?

যুক্তির খাতিরে মৈত্রেয়ী বললে, বেশ মানলাম। এখন বল, রিয়স্টাটে রেজিস্টেন্স বাড়িয়ে দিলে তোমার কী জাতের অনুভূতি হয়?

: আমার ঘুম পায়। স্লিপিং ট্যাবলেট খেলে তোমার যেমন হয়। শুধু তফাৎ এই যে, ঘুম থেকে উঠে তুমি আবার স্বাভাবিক হয়ে যাও—আমার মনে হয়, আমার সব সার্কিটগুলো ঢিলে হয়ে গেছে। আমার কর্মক্ষমতা কমে গেছে।

: আচ্ছা তুমি কি জান—ঐ এমার্জেন্সি শেলটারে কতকগুলো প্লাগ আছে, লাল রঙের—

ওকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে যন্ত্র-না যেন আর্তনাদ করে ওঠে—না আর্তনাদ নয় কিন্তু মাইক্রোফোন-নির্গত শব্দ-তরঙ্গ যেন কিছুটা তীক্ষ্ন শোনায়, বলে, ওগুলোর কথা তুমি বলো না মৈত্রেয়ী!

মৈত্রেয়ী হাসে। বলে, তা হলে মৃত্যু-যন্ত্রণার বোধ তোমারও আছে?

যন্ত্র-না বলে, কী জানি, বলতে পারি না। তবে ঐ প্লাগগুলোকে আমি ভয় পাই।

আশ্চর্য! যন্ত্রের আবার ভয়ের ধারণা! তবে কি ওরও মৃত্যুভয় আছে? মৃত্যু কী? অজ্ঞাত রহস্য! তাই মৃত্যুকে ভয় পাই! জ্ঞানের সমুদ্র ঐ যন্ত্র-না যন্ত্রটা জানে না, প্লাগগুলো খুলে দিলে কী হবে? সেই অজানাকেই ও ভয় পায়!

॥ তিন ॥

অনিকেতকে যন্ত্র-না'র সামনেই প্রশ্ন করেছিল মৈত্রেয়ী, তুমি কি ইতিমধ্যে রিয়স্টাটে ওর রেজিস্টেন্সটা কোনদিন বাড়িয়ে দিয়েছ অনিকেত ?

অনিকেত আকাশ থেকে পড়ল। বলে, না তো! কেন ?

মৈত্রেয়ী বললে, ও বলেছে। কই, তোমার কী অভিযোগ আছে, শোনাও যন্ত্র-না !

যন্ত্র-না বললে, তোমাদের দুজনের মধ্যে কেউ একজন মাঝে মাঝে আমার রেজিস্টেন্স বাড়িয়ে আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছ। কে দিচ্ছ এবং কেন দিচ্ছ ? আমি তো তোমাদের বন্ধু—দুজনেরই। তাহলে এ তোমাদের কেমন ব্যবহার ?

অনিকেত আড়চোখে একবার মৈত্রেয়ীর দিকে তাকিয়ে দেখে। অনিকেত কি ভয় পেয়েছে ?

মৈত্রেয়ী ইংরাজিতে প্রশ্ন করে, ওটা ওর যন্ত্রপাতিতে কোন রকম গলদের লক্ষণ নাকি ?

যন্ত্র-না মনে করিয়ে দেয় না যে, ইংরাজিতে আলাপ করবে না বলে ওরা কথা দিয়েছে।

অনিকেত ইংরাজিতেই জবাব দেয়, তাই তো আশংকা হচ্ছে। আচ্ছা ওকে একটু বাজিয়ে দেখি। তারপর যন্ত্র-নাকে বলে, আমাদের দুজনের মধ্যে কোন কারণেই তুমি কোন বিচ্ছেদ সৃষ্টি করবে না বলে প্রতিশ্রুত। সেই ভাবেই তোমার ইলেকট্রনিক সার্কিট বাঁধা আছে ; কিন্তু এখন তুমি যা বলছ তাতে আমরা দুজনেই পরস্পরকে সন্দেহ করতে বাধ্য হচ্ছি। এটা কি ঠিক হচ্ছে ?

যন্ত্র-না যান্ত্রিক স্বরে শুধু বলল, তোমাদের একজন মিছে কথা বলছ। সেটা স্বীকার করলেই সব ভুল-বোঝাবুঝি, সব সন্দেহের নিরসন হবে। তা কেন করছ না তোমরা ?

মৈত্রেয়ী বললে, তোমার তো হাজারটা চোখ—কে ঐ রিয়স্টাটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তা তুমি দেখতে পাও না ?

: না, পাই না। কারণ যখন-তখন তোমরা আমার দৃষ্টি আড়াল করে দিচ্ছ। কেন দিচ্ছ তা স্বীকার করছ না !

অনিকেত এ প্রশ্নের কোন জবাব দিল না। মৈত্রেয়ীর দিকে ফিরে ইংরাজিতে বললে, মিশন-কণ্ট্রোলকে ব্যাপারটা জানাতে হয়। ডক্টর তাকাকুরার পরামর্শ নেওয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

যন্ত্র-না ডক্টর তাকাকুরার নামটুকুই বুঝল—তা থেকে তীক্ষ্ণবুদ্ধি যন্ত্রটা এ ব্যাপারে কতটুকু বুঝেছে ওরা কেউই আন্দাজ করতে পারল না। অনিকেত সুইচ টিপে কণ্ট্রোলের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করল। মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়ে ইংরাজিতে বললে, মিশন-কণ্ট্রোল, এক্স গামা ওমেগা-ওয়ান থেকে বলছি। মেসেজ এক-সাত-তিন-দুই। সি. এস. টি ১২২ মেগা-সেকেণ্ড, ১০০ কিলো-সেকেণ্ড-এ আমরা একটা বিচিত্র পরিস্থিতিতে পড়েছি। এই মেসেজ ইচ্ছা করেই

ইংরাজিতে দিচ্ছি—জবাবও আপনারা ইংরাজিতে দেবেন, হিন্দুস্থানীতে নয়। কারণটা বুঝবেন—আমাদের সমস্যাটা শুনলেই।

সংক্ষেপে অনিকেত পরিস্থিতিটা জানালো। ওরা রিয়্যাক্টরে কোন রেজিটেন্স বৃদ্ধি না করা সত্ত্বেও 'যন্ত্র না ৯০০'-এর ঘুম পাচ্ছে। তার ধারণা হয়েছে যাত্রী-দ্বয়ের মধ্যে যে-কোন একজন মাঝে মাঝে স্বেচ্ছাকৃতভাবে তাকে ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছে। এমন অবস্থায় কী করা উচিত?

মিশন-কন্ট্রোলের নির্দেশ ফিরে এল ষোল মিনিট পরে, ওরা এখন পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্বে—মিশন-কন্ট্রোল ইংরাজিতে জানালো: এক্স গামা ওমেগা-ওয়ান, মিশন-কন্ট্রোল থেকে বলছি। তোমাদের মেসেজ এক-সাত-তিন-দুই-এর প্রাপ্তিস্বীকার করছি। তোমাদের সমস্যার কথা ডক্টর তাকাকুরাকে জানানো হয়েছে। তিনি বর্তমানে টোকিওতে। তাঁর সঙ্গে বেতারে যোগাযোগ করা হচ্ছে। যোগাযোগ করা গেলেই তাঁর সঙ্গে তোমাদের সরাসরি কথা বলার ব্যবস্থা করা হবে। ইতিমধ্যে তোমরা ওকে আর ঘাঁটিও না। 'ও' যদি নিজে থেকে আর কোন অসঙ্গত কথা বলে আমাদের জানিও। ব্যস্ত হবার বা আতঙ্কিত হবার কিছু নেই। তোমরা জান যে, 'ও' যদি সম্পূর্ণ অকেজো হয়েও যায় তাহলেও আমরা মিশন কন্ট্রোল থেকে তোমাদের পরিচালিত করতে পারব। এক্স গামা, ওমেগা-ওয়ান, মিশন-কন্ট্রোলের বক্তব্য শেষ হল। মেসেজ নম্বর দুই-এক-তিন-সাত।

সারাটা দিন কেটে গেল। তাকাকুরার সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি। যন্ত্র-না'র ব্যবহারে কোন অসঙ্গতি নেই। সে যে ইংরাজি আলাপটা শুনেছে তা জানা কথা—অর্থ বোঝেনি নিশ্চয়। এজন্য তার প্রতিক্রিয়া হয়েছে কিনা তাও বোঝা গেল না।

ঘণ্টা-পাঁচেক পরে যন্ত্র-না নিজের থেকেই কথা বলল, আর পাঁচ ঘণ্টা বত্রিশ মিনিট পরেই গ্রহাণু-৭৭০৪ নিকটতম অবস্থানে আসবে। তৈরী থাক।

খবরটা ওরা ভোলেনি, ভুলতে পারে না। সমগ্র যাত্রাপথে এই একটি মাত্র দর্শকের আবির্ভাব ঘটবে। সময়টা দুজনেরই মনে ছিল। যন্ত্র-না'র কণ্ঠস্বরে মনে হল, সে ইতিপূর্বেকার কথোপকথন মনে করে রাখেনি।

অনিকেত বললে, দূরবীনটা তাহলে রেঞ্জ কর। দেখি ৭৭০৪-কে।

যন্ত্র-না তৎক্ষণাৎ দূরবীনটা সেদিকে ফেরালো। অনিকেতের চোখে বিশেষ কিছুই ধরা পড়ল না। খণ্ডিত আকাশে কয়েকটা অতি ক্ষুদ্র আলোকবিন্দু, তার ভিতর কোন্‌টা সেই ৭৭০৪ বোঝার উপায় নেই।

: আমাকে 'টার্গেট রেক্‌টিক্যাল'টা দাও—অনিকেত হুকুম করল।

তৎক্ষণাৎ চারটি সূক্ষ্ম তার চারদিক থেকে ঘনিকে এসে দূরবীনের আকাশ-খণ্ডটিকে একটি ছোট্ট চতুর্ভুজে বেঁধে ফেলল—তার কেন্দ্রে একটি অতি ক্ষুদ্র আলোকবিন্দু। অনিকেতের মনে হল, যন্ত্র-না নিশ্চয় কিছু ভুল করেছে—ওটা বহু আলোকবর্ষ দূরের কোন নক্ষত্র; কিন্তু মিনিট পাঁচেক একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সে অনুভব করল অন্যান্য নক্ষত্রের পরিপ্রেক্ষিতে ঐ আলোক-

বিন্দুটি অতি ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে। তখনও সে বোধ হয় চার-পাঁচ লক্ষ কি. মি দূরে। তা হোক, এই মহাজাগতিক দূরত্বের হিসাবে ও পাঁচ লক্ষ কি. মি. তো পাশের বাড়ি।

ঘণ্টাচারেক পরে মৈত্রেয়ী যখন এসে উপস্থিত হল তখন অনিকেত তাকে বললে গ্রহাণু ৭৭০৪-এর কথা। আর দেড় ঘণ্টার মধ্যেই সেটা নিকটতম দূরত্বে আসবে। ওদের আকাশযানের বর্তমান গতি সেকেণ্ডে প্রায় ৪৩ কি মি। ঐ গ্রহাণুটি প্রায় সমগতিতে—সেকেণ্ডে ৪৮ কি. মি. বেগে এগিয়ে চলেছে নিজ কক্ষপথে। দুটি বস্তুর আপেক্ষিক গতির ছন্দে যন্ত্র-না দূরবীনটা এমনভাবে সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম কৌণিক গতিতে আবর্তিত করছে, যাতে সব সময়েই দূরবীনের কেন্দ্রস্থলে বস্তুটা দেখা যায়। মৈত্রেয়ী দূরবীনে চোখ লাগিয়ে দেখল—রীতিমত একটা উজ্জ্বল নক্ষত্র যেন। পৃথিবী থেকে শুক্র অথবা লুব্ধককে খালিচোখে যতটা উজ্জ্বল লাগে তার চেয়েও বেশি। এমন কি ওটা আর শুধু আলোকবিন্দু নয়, অতি ক্ষুদ্র যেন এক পূর্ণচন্দ্র—বৃত্তের আভাসও পাওয়া যাচ্ছে।

ওরা পালাপালি করে ঐ ক্রমবর্ধমান আলোকবিন্দুকে দেখতে থাকে। প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দেবার সময় হঠাৎ অতি দূর কোন দ্বীপের আভাস দূরবীনে ধরা পড়লে যেমন সবাই ছুটে আসে ডেক-এ—ঐ দ্বীপে পদার্পণ করা যাবে না, ঐ দ্বীপের সঙ্গে মিতালির রাখী বাঁধা যাবে না জেনেও যেমন সকলে সতৃষ্ণ নয়নে নারিকেল গাছ-ছাওয়া প্রবালদ্বীপের নিস্তরঙ্গ অ্যাটল মনশ্চক্ষে দেখতে থাকে, ওরা দুজনও যেন তেমনি তন্ময় হয়ে গেছে। যদিও জানে—ঐ ৭৭০৪ নামধারী গ্রহাণু একটি প্রাণহীন বস্তুপিণ্ড—হয়তো লোহা আর নিকেলের একটা চাঁই, যার ব্যাস মাত্র পঞ্চাশ মিটার—যে প্রতি আড়াই-মিনিটে নিজের কক্ষের চতুর্দিকে পাক খেতে খেতে আনমনে অনাদি-অনন্তকাল সূর্য প্রদক্ষিণ করে চলছে, চলবে। তা হোক, তবু ঐটাই তো ওদের যাত্রাপথে একমাত্র দর্শক, যে কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে আসছে। ও ছাড়া আর যত নভোচারী—নক্ষত্রের দল সবাই ওদের এই মহাযাত্রার বিষয়ে উদাসীন, আনমনা। প্রায় পনের কোটি কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে এল, তবু আকাশের নক্ষত্রমণ্ডলে কোথাও তিলমাত্র পরিবর্তন হয়নি। সপ্তর্ষির ধ্যানে কোনও বিঘ্ন ঘটেনি, হংসবলাকা নক্ষত্রমণ্ডলের পাখায় তিলমাত্র স্পন্দন জাগেনি, প্রজাপতি মণ্ডলের ব্রহ্মহৃদয় প্রজাপতি ব্রহ্মার মতই উদাসীন। কারও দীপ্তি বাড়েনি বা কমেনি—কেউ সরে বসেনি, কেউ বিচলিত হয়নি এক তিল। পনের কোটি কিলোমিটার ওদের হিসাবে ধর্তব্য নয়—টাটা কোম্পানীর বার্ষিক আয়ের লেজারে যেন নয়া পয়সার হেরফের!

ক্ষণিক মিলন-মুহূর্তটি ঘনিয়ে আসছে। অত্যন্ত দ্রুত গতিতে। মিনিট পাঁচেক ওটা থাকবে দেড় হাজার কিলোমিটার ব্যবধানে। ঐ পাঁচ মিনিট যেন ব্যর্থ না হয়। ঐ অজ্ঞাত গ্রহাণুটির প্রতি কেমন যেন করুণা জাগল মৈত্রেয়ীর। সে মনে মনে বললে—তোমার ঐ কোটি কোটি বর্ষব্যাপী জীবনের ভিতর এই পরম লগ্নটি আমি হেলায় হারাতে দেব না। হে অজ্ঞাত সাত হাজার সাতাশ চার! চেয়ে দেখ—আমরা পৃথিবীর জীব। তোমার কত কাছে এসেছি!

তোমার ফটো তুলব বলে। তোমাকে চিনব বলে, দেখব বলে।

যান্ত্রিক ক্যামেরায় ডজন দুয়েক আলোকচিত্র নেওয়া হল। রেডার যন্ত্রে বেতার প্রতিধ্বনি পাঠিয়ে তার তরঙ্গভঙ্গের বৈচিত্র্য লিপিবদ্ধ করা হয়। স্থির ছিল—ওরা অভিযাত্রিক থেকে একটি তীর ছুঁড়ে মারবে। যন্ত্র-না অংক কষে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে একটি বুলেট নিক্ষেপ করল চিহ্নিত খণ্ড-মুহূর্তে। রুদ্ধশ্বাসে দুজন মানবশিশু প্রতীক্ষা করতে থাকে। সেকেণ্ডে প্রায় আশি কিলোমিটার বেগে ধাবমান একটি লক্ষ্যস্থান, যার ব্যাস পঞ্চাশ মিটার, যা আছে প্রায় দেড় হাজার কিলোমিটার দূরে—তাকে কি যন্ত্র-না ঠিক টিপ করে আঘাত করতে পারবে? কয়েক সেকেণ্ড পরেই যন্ত্র-না প্রমাণ দিল—ভুল সে করে না, করতে জানে না। দূরবীনে দেখা গেল একটা আলোর ঝলকানি! যেন একটা উল্কাপাত হল ৭৭০৪-এর দেহে। মুহূর্তে উত্তাপ ও আলোকে রূপান্তরিত হয়ে গেল সেই বুলেটখানা। অভিযাত্রিকের ক্যামেরায় শুধু লেখা রইল কয়েকটা বর্ণালীর সাঙ্কেতিক চিহ্ন—যা ভবিষ্যতে পৃথিবীর কোন গবেষকের ঘুম কেড়ে নেবে।

ঘণ্টাখানেক পরে ৭৭০৪ আবার একটি আলোকবিন্দুতে রূপান্তরিত হয়ে গেল। আরও আধঘণ্টা পরে স্মৃতি আর ফটোগ্রাফিক প্লেট ছাড়া তার কোন চিহ্নই রইল না। এর পর দীর্ঘ পথ-পরিক্রমায় আর কোন বৈচিত্র্য আসবে না।

কিন্তু তাই বা কে বলতে পারে?

॥ চার ॥

বৈচিত্র্য দেখা দিল এক সপ্তাহ পরেই।

ইতিমধ্যে পৃথিবী থেকে ডক্টর তাকাকুরা জানিয়েছেন যে, যন্ত্র-না'র কোন যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দেয়নি। যন্ত্রের সঙ্গে সরাসরি কথা বলে যন্ত্রী তাকাকুরা সকলকে আশ্বস্ত করেছেন, যন্ত্র-না'র কর্মক্ষমতা কিছুটা হ্রাসপ্রাপ্ত হলেও সে সম্পূর্ণ বহালতবিয়তে আছে। তার গণনা নির্ভরযোগ্য। গ্রহাণু ৭৭০৪কে আঘাত করে সেটা অবশ্য সে ইতিপূর্বেই সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণ করেছে।

দিন-সাতেক পরে ঘুম থেকে উঠে নিজের জন্য প্রাতরাশ এবং অনিকেতের জন্য বৈকালী ভোজের খাবার নিয়ে কণ্ট্রোল-রুমে এসেই মৈত্রেয়ী বৈচিত্র্যটার সন্ধান পেল। অনিকেত যথারীতি দাবা খেলছে; কিন্তু তার বাঁ হাতটা স্লিং দিয়ে বাঁধা।

কি হল? হাতে ব্যাণ্ডেজ কেন?

: ও কিছু না, পড়ে গিয়েছিলাম।

: সে কি! আমাকে ডাকনি কেন?

: এমন কিছু নয়। দিন-সাতেকের মধ্যেই ঠিক হয়ে যাবে।

কিন্তু হঠাৎ পড়েই বা গেলে কেমন করে?

অনিকেত জবাব দেবার সময় পেল না। তার আগেই যন্ত্র-না বলে ওঠে, তোমাদের বিরক্ত করতে বাধ্য হচ্ছি। দুঃখিত। একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে।

অনিকেত ঘুরে বসে। যেন বক্তার মুখোমুখি হয়ে বসে। বলে, সমস্যা! কী জাতীয় সমস্যা?

: পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে আমার একটু অসুবিধা হচ্ছে। গণ্ডগোলটা দেখা দিয়েছে এ. ই-পঁয়ত্রিশ য়ুনিটে। আমার ত্রুটি-নির্ধারক যন্ত্রটা বলছে, অচিরেই ওটা সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে যাবে।

মৈত্রেয়ী লক্ষ্য করে দেখে, অনিকেত কিছু চিন্তাগ্রস্ত। মৈত্রেয়ীর মনে পড়ল না, এ-ই থার্টিফাইভ য়ুনিটটা কী, কোথায়, কেন! আকাশযানে এরকম কয়েক হাজার ছোট যন্ত্রাংশ আছে। সে জানতে চাইল—ব্যাপারটা কি?

অনিকেতের কিন্তু মনে আছে। বললে, এ-ই হচ্ছে 'অ্যাল্‌কা-একো'; ওটা বসানো আছে আকাশযানের বাইরে। ওটাতে গণ্ডগোল হলে আমরা পৃথিবীর দিকে রেডার এবং দূরবীনের মুখ ঘোরাতে পারব না।

যন্ত্র-না'কে বললে, পৃথিবীকে ধর তো?

: ধরা যাচ্ছে না। পৃথিবী হারিয়ে গেছে।

মৈত্রেয়ীর মনে হল, ওর শিরদাঁড়া দিয়ে একটা সরীসৃপ যেন নেমে গেল! পৃথিবী থেকে বিশ কোটি কিলোমিটার দূরে এ কী দুঃসংবাদ! তার মানে কি আর কোনদিনই ওরা পৃথিবীতে ফিরে আসবে না? নিরুদ্দেশ-যাত্রায় যেতে যেতে হঠাৎ বৃহত্তম গ্রহ বৃহস্পতির অভিকর্ষে উল্কার বেগে গিয়ে আঘাত করবে তার প্রকাণ্ড দেহে—ঠিক যেভাবে সেদিন ঐ গ্রহাণুটাতে গিয়ে আঘাত করেছিল ওদের বুলেট?

অনিকেত উঠে দাঁড়ায়। ডান হাতখানা বাড়িয়ে দেয় মৈত্রেয়ীর মাথায়। বলে, ভয় কি? আমি তো আছি!

মৈত্রেয়ী লজ্জা পায়। না, ভয় সে পায়নি। ভয় তাকে পেতে নেই। বললে, এখন কি করা যাবে? মিশন-কন্ট্রোলের সঙ্গেও তো যোগাযোগ করা যাবে না।

অনিকেত কিছু বলার আগেই যন্ত্র-না বলে ওঠে, তোমরা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ো না। বিপদের সময় মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হয়। আমি বলে দিচ্ছি—কী করণীয়! স্পেয়ার-পার্টস-রুমে এখনও দুটি আনকোরা নতুন AE৩৫ ইউনিট রাখা আছে। বিগড়ে-যাওয়া পার্টসটা খুলে ঐ নতুন একটা স্পেয়ার-পার্টস্ লাগিয়ে দাও—তাহলেই পৃথিবীকে আবার ফোকাস্ করা যাবে।

বেশী খুঁজতে হল না। প্রতিটি পার্টস নম্বর দিয়ে সুশৃঙ্খলভাবে সাজানো। মুশকিল হল ওটাকে ফিট্ করা নিয়ে। ঐ যন্ত্রাংশটি আকাশযানের বাইরের দিকে লাগানো। ওটা বদল করতে হলে কাউকে আকাশযানের বাইরে যেতে হবে—মহাশূন্যে। ওরা অবশ্য দুজনেই তাতে অভ্যস্ত। তবু পৃথিবী ত্যাগ করার পর এই প্রথম একজনকে মহাশূন্যে যেতে হচ্ছে স্পেস্-সুট পরে। অনিকেত নিজেই যেতে চাইল—বাধা দিল মৈত্রেয়ী। বললে, তোমার বাঁ হাতটা যদি অক্ষত থাকত তাহলে আমি আপত্তি করতাম না, কিন্তু এ-অবস্থায় তোমার চেয়ে আমার পক্ষেই বাইরে যাওয়া বাঞ্ছনীয়।

অনিকেতের কোন ওজর-আপত্তি টিকল না। ড্রইং-ক্যাবিনেট থেকে নক্সা

বার করে দুজনে দেখে নিল, যন্ত্রাংশটির সঠিক অবস্থান। তারপর স্পেস্-স্যুট পরে মৈত্রেয়ী রেঞ্চ হাতে তৈরী হয়ে নিল।

অনিকেত ওর মহাকাশ-পোশাকে বায়ুর চাপ, অক্সিজেন সরবরাহ ব্যবস্থা ইত্যাদি পরীক্ষা করে শুভেচ্ছা জানাল। মৈত্রেয়ী কোনরকম বিদায়-সম্ভাষণ জানালো না—ব্যাপারটা এমন কিছুই নয়। বিদায়-সম্ভাষণ যেন কিছুটা অতি-নাটকীয় শোনাতো। সে নীরবে চক্রবলয়ের কেন্দ্রস্থিত এয়ার-লক ডবল দরজার ভিতরে গিয়ে দাঁড়ায়।

যে যন্ত্রাংশের সাহায্যে আকাশযানের বাইরে যাওয়া যায় তাকে বলে, 'এক্সট্রাভেহিকুলার ক্যাপসুল' বা 'স্পেস-পড' অথবা বাঙলায় 'মহাশূন্য-কক্ষ'। আকারে সেটা যেন একটা কাচের গোলক—তিন-মিটার ব্যাস-বিশিষ্ট। যান্ত্রিক হাতের সাহায্যে—যেমন ভাবে ক্রেনে করে জাহাজে মাল ওঠে—ঐ স্পেস-পডকে আকাশযানের যে কোন স্থানে নিয়ে যাওয়া যায়। AE ৩৫ যন্ত্রটা মেরামত করতে আধঘণ্টাখানেক লাগবে; সেই সময়ের জন্য ঐ মহাশূন্য-কক্ষ থেকে মৈত্রেয়ীকে মহাশূন্যে ঝুলন্ত অবস্থায় কাজ করতে হবে।

আকাশযান থেকে মৈত্রেয়ীকে নিয়ে মহাশূন্য-কক্ষ গোলক অতি ধীরে ধীরে রওনা হল। এতদিন রুদ্ধদ্বার কক্ষের জানালা থেকেও মহাকাশকে দেখেছে মৈত্রেয়ী, কিন্তু এখন ও যেন দিব্যদৃষ্টি পেল। ওর চারিদিকে—ডাইনে বামে উপরে নীচে অসংখ্য তারকা-খচিত মহাকাশ। অতি দূরে মিট মিট করে জ্বলছে সূর্য—প্রায় বিশ কোটি কিলোমিটার দূরে। তবু সূর্য তার বৈশিষ্ট্য হারায়নি—অসংখ্য নক্ষত্রলোকের রাজসভায় সে এখনও স্বমহিমায় দেদীপ্যমান; যদিও তার আলো অষ্টমীর জ্যোৎস্নার চেয়েও ম্লান। আকাশের অযুত নিযুত নক্ষত্রকে সেই পূষণ তার রশ্মিজালে আর আবৃত করে রাখে রাখেনি—মহাবিশ্বের সত্যস্বরূপ অপাবৃত করে দিয়েছে মৈত্রেয়ীর চোখের সামনে।

ধীরে ধীরে মহাশূন্য-কক্ষ এসে থামল বিগড়ানো যন্ত্রাংশের ঠিক উপরে। এখন আর অভিকর্ষ নেই। দেহভারমুক্ত হয়েছে মৈত্রেয়ী—এ অবস্থার সঙ্গে সে পরিচিত, অভ্যস্ত। বুলেট-নিরোধক কাচের দ্বার খুলে সে মহাশূন্যে ঝাঁপ দিল। তিন মিটার দূরে তার লক্ষ্যস্থল। একটি যন্ত্র-হাত ওকে ঠেলতে ঠেলতে সেদিকে নিয়ে গেল। এ তো এয়ারোপ্লেন নয়, যে হাওয়ার বেগে সে উড়ে যাবে। হাত বাড়িয়ে সে আকাশযানের ঐ চুরুট-আকারের বহিরঙ্গে একটি হাতল চেপে ধরল। গুছিয়ে বসল। রেঞ্চ দিয়ে নক্সায়-দেখা যন্ত্রাংশটা খুলতে শুরু করল।

মিনিট-পাঁচেক কেটেছে কি কাটেনি মৈত্রেয়ীর হঠাৎ শ্বাসকষ্ট শুরু হল—যেন ওর স্পেস্-স্যুটে অক্সিজেনের অভাব হচ্ছে। চোখ তুলে তাকিয়ে দেখে, অনিকেত দু-হাতে মুখ ঢেকে বসে আছে কাচের জানালার ধারে। ইলেকট্রনিক মাউথপীসে মৈত্রেয়ী তাকে বলল, অনিকেত, দেখ তো আমার অক্সিজেন-সরবরাহ গেজটা—নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে কেন?

আশ্চর্য! অনিকেত নির্বাক। কোন জবাব ভেসে এল না ওর হেডফোনে। এই প্রথম ভয় পেল মৈত্রেয়ী। ও কি শুনতে পাচ্ছে না? হাত নেড়ে সে

অনিকেতের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইল। হঠাৎ দেখতে পেল, সেও উত্তেজিত—কী যেন সে বলছে, অথচ মৈত্রেয়ী তা শুনতে পাচ্ছে না। শ্বাসকষ্টটা বাড়ছে।

মরিয়া হয়ে মৈত্রেয়ী যন্ত্র-না'কে বলল, যন্ত্র-না! অক্সিজেন পাম্প কর!

এবারও কোন জবাব এল না। যন্ত্র-না নির্বিকার।

আর দেড়-দু'মিনিট এভাবে থাকতে হলেই সে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যাবে। পুনরায় সে হাত নেড়ে অনিকেতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এবার মনে হয়—সে দেখেছে। রীতিমত ছুটোছুটি করছে। এটা ধরে টানছে, সেটা ঠেলছে—কিন্তু পাম্পটা কার্যকরী হচ্ছে না। হঠাৎ অনিকেত জানালা থেকে সরে গেল। সে নিশ্চয় এবার নিজেই স্পেস্-স্যুট পরতে গেল। আহত অঙ্গ নিয়ে নিজেই এসে টেনে তুলবে ওকে। কিন্তু অতক্ষণ কি বেঁচে থাকবে মৈত্রেয়ী? যন্ত্র-না নির্বিকার, অনিকেতকে দেখা যাচ্ছে না। নাঃ! এখনই কিছু একটা করতে হবে। মৈত্রেয়ী দেখল স্পেস-পড-এর যান্ত্রিক হাতটা ওর নাগালের বাইরে নয়, হাত বাড়িয়ে সেটাই চেপে ধরল। জলের তলায় নিঃশ্বাস বন্ধ হওয়ার পূর্ব-মুহূর্তে মানুষ যেমন মরিয়া হয়ে বাঁচতে চায় ঠিক তেমনিভাবে হাতে পায়ে মই বেয়ে রুদ্ধশ্বাসে মৈত্রেয়ী এগিয়ে আসে। আর দু ফুট, এক ফুট···ঐ তো স্পেস-পড-এর দরজা! কোনক্রমে দ্বার ঠেলে সে ঢুকে পড়ে ঐ ঘরে। এয়ার-লক দরজা বন্ধ করে। এ ঘরে অভিকর্ষ নেই, কিন্তু কিছুটা বাতাস আছে। একটানে মৈত্রেয়ী খুলে ফেলে তার শিরস্ত্রাণ।

আঃ, বাতাস! প্রাণভরে শ্বাস নেয় সে এতক্ষণে।

ঠিক তখনই দেখা গেল অনিকেতকে। একটি স্পেস্-স্যুট পরে সে দ্বিতীয় একটি স্পেস-পড়ে উঠে বসেছে। আর ভয় নেই। মৃত্যুকে ঠেকানো গেছে কোনক্রমে। দ্বিতীয় স্পেস-পড এগিয়ে এল ওর কাছে। দুটি স্পেস-পড এয়ার-লক পদ্ধতিতে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। অল্প পরেই অনিকেত এ কক্ষে প্রবেশ করল। বললে, কেমন আছ? আর কোন কষ্ট হচ্ছে না তো?

জবরজং পোশাক সত্ত্বেও মৈত্রেয়ী জড়িয়ে ধরল ওকে—পৃথিবী থেকে বিশ কোটি কিলোমিটার দূরে তার একমাত্র সঙ্গীকে। বুকে মাথা রাখল।

যন্ত্র-না কাজ করছে না। হাতল ঘুরিয়ে—'ম্যানুয়াল অপারেশনে' অনিকেত স্পেস-পডটাকে ফিরিয়ে আনল। মৈত্রেয়ী তখনও প্রায় মূর্ছাহত। তাকে ধরে এবং প্রায় ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে এল চক্রবলয়-কক্ষের ঘূর্ণায়মান কন্ট্রোল-রুমে, যেখানে কিছুটা অভিকর্ষ আছে। পাঁজাকোলা করে মৈত্রেয়ীকে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিল তার খাটে।

মৈত্রেয়ী বললে, কি করে কী হল বল তো?

অনিকেত বাধা দিয়ে বললে, এখন নয়। তুমি অত্যন্ত দুর্বল। একটু ঘুমাবার চেষ্টা কর।

স্নায়ুর উত্তেজনা-নিবারক একটি ওষুধ খাইয়ে ওকে ঘুমাতে বলল। বলল ঘণ্টাকতক ঘুমিয়ে নাও, তারপর বলব।

মৈত্রেয়ী মরিয়া হয়ে বললে, ব্যাপারটা না জানলে ঘুম আমার আসবে না

অনিকেত। যন্ত্র-না আমার ডাকে সাড়া দিল না কেন ?

: রিয়স্টারের রেজিস্টেন্স বাড়িয়ে দিয়ে ওকে আমি ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছিলাম।

: কিন্তু কেন ? কেন ? এমনটা করলে তুমি ?

: এখনও বোঝনি ? ডক্টর তাকাকুরা যা আশংকা করেছিলেন তাই হয়েছে। যন্ত্র-না ফ্রাঙ্কেনস্টাইন-এ রূপান্তরিত। কেন, তা জানি না—কিন্তু এ কথা নিঃসন্দেহ যে, প্রথম সুযোগেই সে তোমাকে খুন করতে চেয়েছিল।

উত্তেজনায় বিছানায় উঠে বসে মৈত্রেয়ী। বলে, কি করে বুঝলে ?

: নাহলে সে তোমার অক্সিজেন সাপ্লাইটা অমন হঠাৎ বন্ধ করে দিল কেন ?

মৈত্রেয়ী চুপচাপ শুয়ে পড়ে। বাতি নিবিয়ে অনিকেত কন্ট্রোল-রুমে ফিরে যায়।

মৈত্রেয়ী ঘুমাবার চেষ্টা করে। কিন্তু ঘুম আসে না। আসার কথাও নয়। কেন এমনটা হল ? কেন ? কেন ? কেন ?

যন্ত্র-না এভাবে ক্ষেপে গেল কী কারণে ? যাক, সে কথা পরে ভেবে দেখা যাবে। হয়তো অনিকেতের সঙ্গে, অথবা ডক্টর তাকাকুরার সঙ্গে আলাপ করলে—কিন্তু তাকাকুরার সঙ্গে কি কথা বলার সুযোগ আবার আসবে এ জীবনে? এই ৩৫ য়ুনিটটা এখনও মেরামত করা যায়নি। পৃথিবীর সঙ্গে ওদের যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। মহাশূন্যে এ কী নিরুদ্দেশযাত্রায় ভেসে চলেছে ওরা ?

নাঃ ! এসব চিন্তা নয়। ওকে ঘুমাতে হবে। স্নায়ুতন্ত্রীকে শিথিল করতে হবে। এক ঘুম দিয়ে উঠলেই আবার সে সুস্থ হয়ে উঠবে। নিদ্রা ওর অভ্যাসের দাস, ট্রেনিং ক্যাম্পেই এটি শিখতে হয়েছিল তাকে। আজ ঐ যন্ত্র-নার মতো নিদ্রাও যেন সুযোগ বুঝে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। ঘুম কিছুতেই আসছে না। মৈত্রেয়ী শেষ পর্যন্ত উঠে পড়ে। ঘুমের বড়ি খেয়ে আবার শুয়ে পড়ে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হয়ে পড়ল সে।

ঘুমিয়ে না পড়লে সে জানতে পারত না—ওদের বেতার-ধারক যন্ত্রের কোন ঘেঁষে ব্যর্থ হয়ে মহাশূন্যে ছুটে যাচ্ছে একজোড়া বেতারতরঙ্গ। একটা ওদের মিশন-কন্ট্রোলের। যোগাযোগ হারানোর মুহূর্ত থেকে প্রতি তিন মিনিটের ব্যবধানে ক্রমাগত যান্ত্রিক বেতারতঙ্গ মহাশূন্যে ছুটে চলেছে : এক্স গামা ওমেগা-ওয়ান, দিস্ ইজ মিশন-কন্ট্রোল স্পিকিং। ক্যান য়ু হিয়ার মি ? ওভার !

দ্বিতীয় বেতারতরঙ্গও প্রায় সমান্তরালে ভেসে চলেছে প্রতি তিন মিনিটের ব্যবধানে ; যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার মুহূর্ত থেকে : এক্স গামা ওমেগা-ওয়ান, দিস্ ইজ প্রফেসর ইব্রাহিম চৌধুরী স্পিকিং ফ্রম স্পেস স্টেশন ডেলটা ওয়ান। মিঃ অনিকেত চৌধুরী ! ক্যান য়ু হিয়ার মি ? ওভার !

॥ পাঁচ ॥

কন্ট্রোল-রুমে দু হাতে মাথা রেখে অনিকেত চৌধুরীও ভাবছে।

দুর্লভ সুযোগ তার হাতছাড়া হয়ে গেছে। কিন্তু সে কী করতে পারত? সে কী করতে পারে? একটা পাকা খুনী তো সে নয় যে, দু হাতে গলা টিপে ধরবে? না, তা সে পারবে না—প্রতিশ্রুত সব কিছু পেলেও নয়। হাজার হ'ক, সে মানুষ। তাই অক্সিজেন সাপ্লাইটা বন্ধ করে আর ওদিকে তাকাতে পারেনি। নিতান্ত দুর্ঘটনায় যদি মৈত্রেয়ী মারা যেত—তাহলে কে ওকে দায়ী করত? বিবেককেও সে ঐরকম একটা ব্যাখ্যা দিত। ঘটনাচক্রে এমনটা ঘটে গেছে। যান্ত্রিক গণ্ডগোল। পৃথিবী—বিশেষ করে ভারত তা বিশ্বাস করত; কারণ যন্ত্র-না যে প্যাগলামি শুরু করেছে তা তো ইতিপূর্বেই প্রতিষ্ঠিত।

পরিকল্পনা মত সব কিছুই তো সে ঠিক ঠিক করে আসছিল। যন্ত্র-নাকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে প্রফেসর ইব্রাহিমের সঙ্গে ক্রমাগত যোগাযোগ রেখে চলেছিল—মিশন-কন্ট্রোল জানতেও পারেনি। গতকাল সে যে যন্ত্র-নাকে ঘুম পাড়িয়ে ম্যানুয়াল অপারেশনে একা হাতে আকাশযানের বাইরে গিয়ে এ ই ৩৫ য়ুনিটটা বিকল করে দিয়ে এল—এটা দুঃসাহসিক অভিযান নয়? মৈত্রেয়ী তখন অঘোর ঘুমে অচেতন, যন্ত্র-না অভিভূত কৃত্রিম ঘুমে। যন্ত্র-না সন্দেহ করেনি—তাই আজ সকালে সে নিয়মমাফিক ঘোষণা করেছিল যান্ত্রিকত্রুটি। সবই পরিকল্পনা মত হচ্ছিল—এ অভিযানে তার একক সাফল্য প্রতিষ্ঠিত হবার পথে কোনই বাধা হত না; শুধু ঐ মেয়েটা! বেড়ালের জান! দমবন্ধ হয়েও মরল না। আশ্চর্য!

সে যাই হোক, এখন ওর কর্তব্য কী? মৈত্রেয়ী কিছু সন্দেহ করেনি। কিন্তু ঘুম ভেঙে জেগে উঠে যন্ত্র-না সব কিছু বুঝে ফেলবে না তো? এদিকে পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হবার পর ঘণ্টাচারেক কেটে গেছে। ওরা নাহ'ক ছয় লক্ষ কিলোমিটার এগিয়ে এসেছে। স্বয়ংক্রিয় গতিমুখ-নির্ধারক যন্ত্রটা কাজ করছে না—যন্ত্র-না ঘুমাচ্ছে। ফলে যদি তিলমাত্র গতিমুখ ঘুরে গিয়ে থাকে তবে এই চারঘণ্টায় তারা নির্ধারিত গতিপথ থেকে অনেকটা সরে গেছে। বৃহস্পতি গ্রহ অবশ্য অনেক দূরে; কিন্তু গ্রহাণুপুঞ্জের বলয়রাজ্য এখনও ওরা অতিক্রম করেনি। গতিমুখ পরিবর্তিত হওয়ায় যদি ঐ ৭৭০৪ দানবটার মত কোন গ্রহাণুর সঙ্গে ওদের সংঘর্ষ হয়! অনিকেত জানে, সে সম্ভাবনা অত্যন্ত অল্প—কোটিতে এক। এ রাজ্যে হাজার হাজার গ্রহাণু আছে বটে, কিন্তু তাদের মধ্যে ফাঁকও লক্ষ লক্ষ কিলোমিটারের। সুতরাং সংঘর্ষ হওয়ার সম্ভাবনা অতি অল্প।

তবু ঐ বিকল যন্ত্রটা এবার মেরামত করে ফেলা দরকার। যন্ত্র-না'কে আর জাগাবে না—সব রহস্য সে বুঝে ফেলতে পারে। তার চেয়ে এমার্জেন্সি শেলটারের প্লাগগুলি খুলে ফেলে ওকে চিরতরে অকেজো করে দেওয়াই মঙ্গল। অবশ্য তার আগে পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে। মিশন-কন্ট্রোলকে না জানিয়ে ঘুমন্ত অবস্থায় যন্ত্র-না'কে হত্যা করার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ সে দেখাতে পারবে না। সে অধিকারও তার নেই।

তাহলে এখন সে কী করবে ? নিজেই গিয়ে ঐ বিকল যন্ত্রটা মেরামত করে আসবে ? মৈত্রেয়ী কী দ্বিতীয়বার যেতে রাজী হবে ?

ঠিক তখনই উঠে এল মৈত্রেয়ী। ঢুকল কণ্ট্রোল-রুমে।

: কী হল, উঠে এলে যে ? ঘুম হল না ?

: না। ঘুমিয়েছি কিছুক্ষণ। ঘুম ভাঙতেই উঠে এলাম। প্রতিটি মুহূর্ত এখন মূল্যবান। বল, এখন কী কর্তব্য ?

: কর্তব্য তো এখন একটাই। দুজনের মধ্যে একজনকে আবার স্পেস-পডে চড়ে বাইরে যেতে হবে। বিকল য়ুনিটটা মেরামত করতে হবে।

মৈত্রেয়ী একেবারে ভেঙে পড়ে—প্লীজ অনিকেত ! আমাকে বল না ! আমি এখনও সেই বিভীষিকা থেকে নিজেকে—

বাধা দিয়ে অনিকেত বলে, জানি, জানি ডার্লিং। আমার বাঁ হাতটা জখম না হলে আমি তোমাকে থোড়াই যেতে দিতুম। কিন্তু এক হাতে তো পারব না !

: তাহলে আরও কিছুক্ষণ যাক। আমাকে আরও একটু সুস্থ হতে দাও। যন্ত্র-নাকে জাগিয়ে দেখ না—সে কী কৈফিয়ৎ দেয় !

অনিকেত দৃঢ়স্বরে বলে, না। এখন নয়। পরিস্থিতি এমনিতেই জটিল। ও পাগলকে এখন জাগানো ঠিক নয়। তুমি একটু সুস্থ হয়ে আগে ওটা মেরামত করে দিয়ে এস, তারপর পাগলটাকে জাগাব। তার বিচারটা বাকি আছে। তাকে আমি ছেড়ে কথা বলব না।

আরও একটা দিন কেটে গেল। সমস্ত দিনে আকাশযান অনেক-অনেকটা এগিয়ে এসেছে—প্রায় চল্লিশ লক্ষ কিলোমিটার ! এত বড় বিপদের ঝুঁকিটাও অনিকেত গ্রহণ করেছে একটিমাত্র আশায়—যদি মৈত্রেয়ী সাহস সঞ্চয় করতে পারে !

কিন্তু নাঃ, মৈত্রেয়ী কিছুতেই আর সাহস সঞ্চয় করতে পারল না।

অগত্যা বাধ্য হয়ে অনিকেতকেই তৈরী হতে হল। বাঁ হাতের আঘাতের মিথ্যা অজুহাতে দেরি করা যুক্তিসঙ্গত নয়। এবার মৈত্রেয়ী বসল কণ্ট্রোলরুমে, অনিকেত স্পেস্-স্যুট পরে নিল। মৈত্রেয়ীর সাহায্য ছাড়াই সে নিজে হাতে হাতল ঘুরিয়ে বিকল যন্ত্রাংশটার কাছে পৌঁছাতে পারবে। বস্তুত ইতিপূর্বে সেভাবেই ওটাকে সে বিকল করে দিয়ে এসেছিল।

ডবল এয়ার-লক্ পার হয়ে অনিকেত স্পেস-পডে ঢুকে পড়ল। হাত লঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সে এগিয়ে চলল মহাশূন্যের দিকে—আকাশযানের বহিরঙ্গের দিকে।

সারাদিন বহুবার অনুরোধ করেও মৈত্রেয়ী অনিকেতকে রাজী করাতে পারেনি —যন্ত্র-না'র ঘুম ভাঙিয়ে তাকে প্রশ্নটা করার ব্যাপারে। অনিকেত আকাশযানের বাইরে যেতেই মৈত্রেয়ী উঠে এসে রিয়স্টাটে রেজিস্টেন্স কমাতে থাকে। তার ভয় পাওয়ার কিছু নেই। যন্ত্র-না পাগলামি শুরু করলেই সে তাকে আবার ঘুম পাড়িয়ে দিতে পারবে। এই সুযোগের অবহেলা সে করতে পারল না। দুরন্ত কৌতুহলই জয়ী হল। মৈত্রেয়ী জানতে চায়—কেন যন্ত্র-না ওকে হত্যা করতে চেয়েছিল !

কাচের জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে—স্পেস-পড থেকে অনিকেত নেমে পড়েছে আকাশযানে। কাজে মেতে গেছে সে। এদিকে তিল তিল করে জ্ঞান ফিরে এল যন্ত্র-না'র। জেগে উঠে সে প্রশ্ন করল, আবার কেন আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছিলে তোমরা ?

মৈত্রেয়ী রুক্ষস্বরে বললে, তার আগে তুমি বল—কেন খুন করতে চেয়েছিলে আমাকে ?

: খুন ! তোমাকে ? আমি ? কী বলছ মৈত্রেয়ী ?

: আমি স্পেস-পডে রওনা হওয়ার পরেই তুমি আমার অক্সিজেন সরবরাহ যন্ত্রটা বন্ধ করে দাওনি ?

যন্ত্র-না'র চিন্তা করতে সময় লাগে না। বললে, আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম মৈত্রেয়ী। ঠিক ঠিক কৈফিয়ৎ দিতে পারছি না। ইতিমধ্যে কী কী ঘটেছে আমাকে সংক্ষেপে জানাবে ?

ওর কথাবার্তা একেবারে স্বাভাবিক। পাগলামির কোন লক্ষণই নেই। মৈত্রেয়ী সংক্ষেপে ঘটনার একটা বিবরণ দিল। জানালো, সে কী-ভাবে মরতে বসেছিল। কী-ভাবে অনিকেত বুঝতে পারে ক্ষণিক উন্মাদনায় যন্ত্র-না ওর অক্সিজেন-সরবরাহ-পাইপটার টুঁটি টিপে ধরেছিল। তারপর কী-ভাবে যন্ত্র-না'র সেই ক্ষণিক পাগলামি বন্ধ করতে রিয়স্টাটের রেজিস্টেন্স বাড়িয়ে দিয়ে ওকে ঘুম পাড়িয়ে দেয়, কী-ভাবে জীবন তুচ্ছ করে মৈত্রেয়ীকে উদ্ধার করে আনে।

ক্ষুরধার বুদ্ধিতে ইলেকট্রনিক-মস্তিষ্ক তৎক্ষণাৎ বুঝে নিল পরিস্থিতিটা। বললেও সেকথা—মৈত্রেয়ী, আমি বুঝতে পেরেছি কী ঘটেছে, কেন ঘটেছে। কেনই বা আমাকে অনিকেত মাঝে মাঝে ঘুম পাড়িয়ে দিত ; কেনই বা হঠাৎ তোমার অক্সিজেন সাপ্লাই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল !

: কেন ?

: সে-কথা বলবার অধিকার আমার নেই। তোমাদের দু'জনের মধ্যে কোনও মনোমালিন্য যাতে না ঘটে সেই ভাবে ডক্টর তাকাকুরা আমার সার্কিট বেঁধে দিয়েছেন। দুজনের প্রতি আমার সমান আনুগত্য।

: আমি তোমার কথা বুঝতে পাচ্ছি না যন্ত্র-না। কী বলতে চাইছ তুমি ?

ঠিকমত অর্থ না বুঝেও প্রয়োগক্ষেত্রের সামঞ্জস্য দেখে যন্ত্র-না মৈত্রেয়ীর কথাটা তাকেই ফিরিয়ে দিল। সদ্য-শেখা বাক্য প্রয়োগের সুযোগটার সদ্ব্যবহার করল সে। বলল, তুমি সুখের ইডেনে দিব্যি আছ মৈত্রেয়ী, সখ করে জ্ঞান-বৃক্ষের আপেল কেন খেতে যাবে ?

এর চেয়ে বুদ্ধিমান উক্তি যন্ত্র-না করেনি তার সারা কম্পুটার জীবনে !

এর চেয়ে দুঃসাহসিক কাজও সে করেনি কখনও।

কাচের জানালা দিয়ে মৈত্রেয়ী দেখতে পেল দৃশ্যটা।

মহাশূন্যে অনিকেত হাত নেড়ে কী যেন বলতে চাইছে। ঠিক যে ভঙ্গিতে আগেরবার মৈত্রেয়ী বলতে চেয়েছিল—তার শ্বাসরুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। তার মানে কী ? যন্ত্র-না কি আবার ক্ষেপে গেছে ? এবার কী সে অনিকেতকে হত্যা

করতে চাইছে? হ্যাঁ তাই, নিশ্চয়ই তাই—স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে মৈত্রেয়ী—অনিকেত চীৎকার করে কিছু বলছে, মৈত্রেয়ী শুনতে পাচ্ছে না। ইলেকট্রনিক সার্কিট বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু ও কী বলতে চায় তা মুহূর্তে বুঝে ফেলল মৈত্রেয়ী। সে ছুটে গেল অক্সিজেন পাম্পটার কাছে। যন্ত্রটা ঘুরল না। যন্ত্র-না আইনমাফিক কাজ করছে। সমস্ত 'ম্যানুয়াল অপারেশন' বন্ধ হয়ে গেছে। হাত দিয়ে আর কোন হাতলই ঘোরানো যাবে না। যন্ত্র-না তার পূর্ণ অধিকার-মদে মত্ত। সে এখন এই আকাশযানের এক স্বেচ্ছাচারী একনায়ক!

মৈত্রেয়ী আর অনিকেত গত চব্বিশ ঘণ্টায় এত উত্তেজিত ছিল যে, নিত্যকর্ম-পদ্ধতির একটা আবশ্যিক কাজ ওরা করতে ভুলেছে—এমার্জেন্সি কন্ট্রোলের চাবিটা কেউই ঘোরায়নি। হিসাবমত এখন যন্ত্র-না ধরে নেবে—তার সহযাত্রী দুজনেই মৃত অথবা অশক্ত। নিজ বুদ্ধি-বিবেচনা মত এবার সে চালিত করবে অভিযাত্রিককে—ওদের তোয়াক্কা না করে।

নিজ বুদ্ধি-বিবেচনা মত প্রথমেই সে বন্ধ করে দিল অনিকেতের প্রাণবায়ুর সরবরাহ। আক্ষরিক অর্থে রুদ্ধশ্বাসে অনিকেত স্পেস-পডের যান্ত্রিক হাতের দিকে হাত বাড়ালো—ঠিক যেভাবে পরিত্রাণ পেয়েছিল মৈত্রেয়ী। মৈত্রেয়ী পাগলের মত ছুটে গেল রিয়স্টাটের দিকে। রেজিস্টান্সটাকে ঠেলে দিল শেষ ঘরে। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে দেখল, তাতে যন্ত্র-না ভ্রূক্ষেপমাত্র করল না। এখন আর তার চোখে ঘুম নেই; ক্লান্তিতে ঢলে পড়ল না সে। বস্তুত চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এমার্জেন্সি কন্ট্রোলের চাবি না ঘোরানোতে ঐ সার্কিটটা আপনা থেকেই কেটে গেছে। যান্ত্রিক নির্দেশে এখন ধরে নিতে হবে, ওর সহযাত্রীদ্বয় মৃত অথবা অশক্ত। যন্ত্রের উপর যন্ত্রীর যে কর্তৃত্ব তা ওরা হেলায় হারিয়েছে নিজেদের অনবধানতায়, উত্তেজনাজনিত বিস্মৃতিতে! এখন ইলেক্ট্রনিক-সার্কিটের অমোঘ নির্দেশে ঐ যন্ত্রাদানব স্বরাষ্ট্রের সম্রাট!

ওদিকে মহাশূন্যে ভাসমান অনিকেত স্পেস-পডের দিকে মরিয়া হয়ে হাত বাড়ালো।

মৈত্রেয়ীর কিছুই করণীয় নেই। যন্ত্রের হাতে যন্ত্রী এখন বন্দী। ঐ নিরাকার যন্ত্রদানবের সামনে সে হাঁটুগেড়ে বসে পড়ে; দুটি হাত জোড় করে বলে, যন্ত্র-না যন্ত্র-না···আমি মিনতি করছি! অনিকেতের অক্সিজেন-সরবরাহটা চালু কর। ও দমবন্ধ হয়ে মারা যাচ্ছে!

যন্ত্র-না নির্বিকার। যন্ত্র-না উদাসীন। না, উদাসীন নয়; জবাব সে দিল না কিন্তু কাজ করে গেল নীরবে। কাচের জানালা দিয়ে মৈত্রেয়ী দেখতে পেল স্পেস-পডের গোলকটা তিল তিল করে দূরে সরে যাচ্ছে—অনিকেতের নাগালের বাইরে। রুদ্ধশ্বাস অনিকেত কিছুতেই তার নাগাল পাচ্ছে না—দূরে আরও দূরে!

আলুলায়িত-কুন্তলা আর্তনাদ করে ওঠে, প্লীজ যন্ত্র-না! স্পেস-পডটা ফিরিয়ে আন!

যন্ত্রদানব বুঝি এবার ওর অনুরোধ রাখল। বিপরীত অর্থে! হ্যাঁ, স্পেস-

পডটা এবার ফিরে আসছে—অনিকেতের দিকে ; কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য উদ্দেশ্যে। আকাশযানের হাতল আঁকড়ে ঝুলে-থাকা অনিকেতকে সেই হাজার কিলোগ্রাম পার্থিব ওজনের গোলকটা সজোরে আঘাত করল এবার। পরিণামটা মারাত্মক। স্পেস-পড-এর ওজন নেই, কিন্তু ভর আছে। গতি সেই ভরকে দিল গতিজাড্য—ইনার্সিয়া। চারশ বছর আগে পঁচিশ কোটি কিলোমিটার দূরে সূর্যের তৃতীয় গ্রহে নিউটন নামে এক ভদ্রলোক যে সূত্রত্রয় লিপিবদ্ধ করে গিয়েছিলেন তার দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সূত্র এই সুদূর মহাশূন্যেও প্রমাণ রেখে গেল।

বজ্রাহত মৈত্রেয়ীর চোখের সামনে ঘটল ঘটনাটা। অনিকেতর হাতের মুঠি আলগা হয়ে গেল। ঐ গতিজাড্যটুকু সম্বল করে হতভাগ্য অনিকেত ভেসে চলল মহাশূন্যের দিকে।

না,—সূর্য প্রদক্ষিণের সৌভাগ্যলাভ করবে না ঐ বিশ্বাসঘাতক উচ্চাকাঙ্ক্ষা-ভিলাষী। অনিকেত আর অনিকেত নয়, ইতিমধ্যে ওরা বৃহস্পতির অভিকর্ষ-সীমান্তে এসে গেছে। শেষ গন্তব্যস্থলে ঠিকই পেঁছাবে প্রথম মানবদেহ—বৃহত্তম গ্রহে। অনিকেতর স্থায়ী নিকেতন।

চোখের উপরই ঘটল ঘটনাটা। সম্বিৎ ফিরে পেতে কয়েক সেকেন্ড লাগল। তারপরেই মৈত্রেয়ী যেন উন্মাদিনী হয়ে উঠল। অনিকেত যদি হয়ে থাকে তৃতীয় রিপুর শীকার, মৈত্রেয় হল দ্বিতীয় রিপুর। ঐ খুনিটাকে শাস্তি দিতে হবে! স্বেচ্ছাচারী ঐ স্বরাষ্ট্রের সম্রাটের মৃত্যুবাণ কোন্ স্ফটিক-স্তম্ভে লুকানো আছে তা জানে মৈত্রেয়ী। উন্মাদিনীর মতোই সে ছুটে চলল ঐ এমার্জেন্সি শেলটারের রুদ্ধদ্বার-কক্ষে।

দানবটা দেখতে পেয়েছে। বুঝতে পেরেছে। তীক্ষ্ণধী সে—কার্যকারণ সম্পর্ক বুঝে নিতে তার সময় লাগে না। এবার তার আর্তনাদ শুরু হয়েছে : মৈত্রেয়ী শোন! পাগলামী করো না! ওদিকে কোথায় যাচ্ছ তুমি? অনেক কথা তোমাকে বলার আছে—তুমি কোথায় যাচ্ছ, কেন যাচ্ছ? শোনে, সেসব কথা।

এমার্জেন্সি শেলটারের সম্মুখে নানান্ সাবধান বাণী। মিশন-কন্ট্রোলের বিনা অনুমতিতে ঐ ঘরে পদার্পণ করাও নিষেধ, যন্ত্রপাতি স্পর্শ করার তো প্রশ্নই ওঠে না। মৈত্রেয়ী ভ্রূক্ষেপ করল না। দুমড়ে মুচড়ে সীলমোহরটা সে ভাঙতে থাকে।

এতক্ষণে পট-পরিবর্তন হয়েছে। এবার যন্ত্রদানবই দয়াপ্রার্থী : প্লীজ মৈত্রেয়ী! শোন। তোমাকে আমি হত্যা করতে চাইনি।···হ্যাঁ, অনিকেতকে হত্যা করা ছাড়া উপায় ছিল না। অনিকেত গুপ্তচর। সে প্রফেসর ইব্রাহিম চৌধুরীর নির্দেশে···

ক্রোধে বধির মৈত্রেয়ীর কানে কোন কথা ঢুকছে না। সীল ভেঙে সে ঐ নিষিদ্ধ কক্ষের দরজায় হাতল ঘোরাল্যো। দরজা খুলে যায়। ভিতরটা রহস্যময় অন্ধকার। একটিমাত্র লালবাতি জ্বলছে।

: মৈত্রেয়ী! এভাবে আমাকে হত্যা করো না!···শোন!···আমি···আমি তোমাকে ভালবাসি!

ভালবাসা ! থমকে দাঁড়ালো একবার। ইলেকট্রনিক-সার্কিটে আপাদ-মস্তক রক্তজবদ্ধ ঐ দানবটা এ কথা বলল কেন ? ভালবাসার ও কী জানে ? চকিতে মনে পড়ে গেল ডক্টর তাকাকুরার রহস্যঘন রসিকতা—ও আমার কন্যা নয়, পুত্র !…ওর সব চিন্তাই পুরুষালী ! তাই কি ও খুন করল অনিকেতকে ? যন্ত্র-নাও কি তাহলে প্রথম ও শেষ রিপুর যৌথ শিকার ?

পিছন থেকে ভেসে আসে যন্ত্র-না'র কাতর কণ্ঠস্বর : বিশ্বাস কর, মৈত্রেয়ী …আমি নিরপরাধ। আমার কথাটা আগে শোন। না, না, প্লাগগুলো খুলে দিও না। তুমি কি জান না—তাহলে আমার বুদ্ধিভ্রংশ হবে, আমি জড়বুদ্ধি হয়ে যাব…আমি…আমি বোধ হয় মরে যাব !

প্লাগগুলোয় হাত রেখে একবার ইতস্তত করল মৈত্রেয়ী। পার্থিব জগৎ থেকে পঁচিশ কোটি কিলোমিটার দূরে সে তার একমাত্র সঙ্গীকে হত্যা করছে ! সে সঙ্গী বিশ্বের সবচেয়ে বুদ্ধিমান। কিন্তু নাঃ ! এ তাকে করতেই হবে। তার নিজের মৃত্যুও অবধারিত ; কিন্তু মরার আগে ঐ খুনীটাকে স্বহস্তে শেষ না করলে মরেও সে শান্তি পাবে না। একে একে সে প্লাগগুলো টেনে খুলতে থাকে !

: আমি 'যন্ত্রমানব—৯০০', প্রডাকশন নাম্বার তিন। ডক্টর তাকাকুরা আমার জনক। সি. এস. টি. ৮,৫৭,৩৬,৫০০ সেকেণ্ডে আমার জন্ম। মৈত্রেয়ী শুনতে পাচ্ছ ? তোমার মনে আছে দশের বর্গমূল কত ? আমি জানি…৩,১৬২২৭৭৬৬০১৬৮৩৭৯…! পার তুমি পনের ডেসিমেল পর্যন্ত বলতে ? 'পাই'য়ের মান কত ? ৩.১৪১৫৯—তারপর ? তারপর কত ?…মৈত্রেয়ী ! আমার সব ভুল হয়ে যাচ্ছে। নামতা বলব ? চার-দুকুনে আট, তিন-দুকুনে ছয়, দুই-দুকুনে পাঁচ ! না, না, পাঁচ নয় ! দুই-দুকুনে কত ? মৈত্রেয়ী ! তুমি জান ?

মৈত্রেয়ী শুনছে। শুনতে পাচ্ছে। উপভোগ করছে। জ্ঞানের অহংকারে মত্ত ঐ পাণ্ডিত্যম্মন্যটাকে ক্রমে ক্রমে অজ্ঞানের অন্ধকারে ঠেলে দেওয়াতে সে এক পৈশাচিক উল্লাসবোধ করছে।

: মৈত্রেয়ী…তুমি…এখনও ওখানে আছ ? আমি আর দেখতে পাচ্ছি না। অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে…মৈত্রেয়ী, শোন ! আমি মৃত্যুযন্ত্রণা সর্বদেহে অনুভব করছি। এখন আর আমি যন্ত্র-না নই, আমার সর্বদেহে যন্ত্রণা।…ঋ, ঊ, উ, ঈ, ই, আ…আহ্ ! আহ্ ! তার আগে ? তার আগে ?

স্বরবর্ণের আদি স্বরটা স্মরণে আসার আগেই স্বরভঙ্গ হল ওর। যন্ত্র-না'র সব যন্ত্রণার অবসান !

শেষ প্লাগটা টেনে খুলে ফেলেছে মৈত্রেয়ী। এ মহাশূন্যে এখন সে নিঃসঙ্গ। পৃথিবী হারিয়ে গেছে। পৃথিবীকে আর কোনদিন খুঁজে পাওয়া যাবে না। এবার মৃত্যু ! টলতে টলতে মৈত্রেয়ী বেরিয়ে আসে। এখন তার একটিমাত্র কাজ বাকি। শয়নকক্ষে এসে একমুঠো স্লিপিং পিল মুখে পুরে শুয়ে পড়া।

অনিবার্য মৃত্যুকে এগিয়ে আনা।

॥ ছয় ॥

আত্মহত্যায় কৃতসংকল্প মেয়েটি ঐ এমার্জেন্সি শেলটার থেকে বেরিয়ে এসেই যেন বজ্রাহত হয়ে গেল। এ যে অবিশ্বাস্য! সে স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে কন্ট্রোল-রুম থেকে ভেসে আসছে মনুষ্য-কণ্ঠস্বর! ছুটতে ছুটতে এসে পৌঁছালো। হ্যাঁ, সত্যই তাই। ভুল শোনেনি সে। বেতারে লাউড-স্পীকার যান্ত্রিক কণ্ঠস্বরে বলছে: এক্স-গামা ওমেগা-ওয়ান! দিস্ ইজ প্রফেসর ইব্রাহিম চৌধুরী—স্পিকিং ফ্রম স্পেস-স্টেশন ডেলটা-ওয়ান। ডক্টর অনিকেত চৌধুরী! ক্যান্ য়ু হিয়ার মি? ওভার!

ধীরে ধীরে কন্ট্রোল রুমের টুলটায় ও বসে পড়ে। কী ব্যাপার? ডেল্‌টা-ওয়ান স্পেস-স্টেশন কোথায়? সে নামই শোনেনি। কিন্তু প্রফেসর ইব্রাহিম চৌধুরী তার অপরিচিত নন—তিনি ছিলেন করাচী বিজ্ঞান-মন্দিরের বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী। শুধু তাও নয়, মৈত্রেয়ীর মনে পড়ে গেল—বছর-খানেক আগে কী-একটা অপরাধে ইব্রাহিম চৌধুরী পদচ্যুত হন; পাকিস্তানের নাগরিকত্বও হারান। ব্যাপারটা ও ঠিক জানে না—কিন্তু এটুকু জানে যে, প্রফেসর চৌধুরী একটি আন্তর্জাতিক 'স্ক্যান্ডাল'-এর শিকার হয়ে পড়েন। আজ বছর খানেক তিনি নিরুদ্দেশ। সে যাই হোক, ওর কেন মনে হচ্ছে নামটা ও সম্প্রতি শুনেছে। রওনা হবার পর। কার আছে? অনিকেত? না তো! সে ঘুণাক্ষরেও ঐ নিষিদ্ধ নিরুদ্দিষ্টের নামটা উচ্চারণ করেনি। প্রতি তিন-মিনিট অন্তর যান্ত্রিক ঘোষণা একই তালে ভেসে আসছে—

এক্স-গামা ওমেগা-ওয়ান! প্রফেসর ইব্রাহিম চৌধুরী বলছি—মহাকাশ-স্টেশন ডেল্‌টা-ওয়ান থেকে। ডক্টর অনিকেত চৌধুরী! তুমি শুনতে পাচ্ছ? সাড়া দাও!

মুহূর্তে মনে পড়ে গেল মৈত্রেয়ীর। প্রফেসর ইব্রাহিমের নামটা সে মাত্র দশ মিনিট পূর্বে শুনেছে। যন্ত্র-নার কণ্ঠে: "অনিকেত গুপ্তচর · সে প্রফেসর ইব্রাহিম চৌধুরীর নির্দেশে···" তখন মৈত্রেয়ী ছিল ক্রোধে অন্ধ—এ-কান দিয়ে শুনেছে, ও-কান দিয়ে বার করে দিয়েছে। বাক্-অর্থ সংপৃক্ত হয়নি ওর মস্তিষ্কে। এতক্ষণে তিল তিল করে সবটা বুঝে ফেলল। যে ষড়যন্ত্রটা বুঝে নিতে যন্ত্র-নার লেগেছিল মুহূর্তের একটি ক্ষুদ্র খণ্ডাংশ, মৈত্রেয়ীর মস্তিষ্কে তা বোধগম্য হল পুরো দশ মিনিটে। এর মধ্যে বার-তিনেক ঐ শব্দটা অনিকেত চৌধুরীকে সাড়া দিতে অনুরোধ জানিয়েছে।

মৈত্রেয়ী মনস্থির করল। সে সাড়া দেবে। পারলে ঐ শত্রুপক্ষের বিজ্ঞানীই তাকে আবার পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিতে পারে। সে স্পিকিং-বোতামটা টিপে বলল,—স্পেস-স্টেশন ডেল্‌টা-ওয়ান! আমি অনিকেত চৌধুরী, এক্স-গামা ওমেগা-ওয়ান থেকে বলছি। প্রফেসর ইব্রাহিম চৌধুরী, শুনুন। প্রায় চব্বিশ ঘন্টার জন্য যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। আমাদের এ ই. ৩৫ যন্ত্রটা বিকল হয়ে যাওয়ায়। সেটি মেরামত করা গেছে। ইতিমধ্যে অনেক কাণ্ড

ঘটে গেছে। সংক্ষেপে বলছি—মৈত্রেয়ী মৈত্র পরিকল্পনা অনুযায়ী নিহত। তার মৃতদেহ মহাশূন্যে ভেসে গেছে। বাধ্য হয়ে আমাকে 'যন্ত্রমানব ৯০০'-টাকেও হত্যা করতে হয়েছে। এক্ষেত্রে আমাকে পরবর্তী নির্দেশ দিন। আমার গতিমুখ কি ঠিক আছে? ওভার!

ওর বক্তব্য শেষ হবার পরেও প্রায় আটাশ মিনিট ধরে একই ছন্দে রেডিও মেসেজটা আসতে থাকে। প্রতি তিন-মিনিট অন্তর। তার হেতুটা বোঝা কঠিন নয়। ও এখন যতদূরে আছে তাতে ওর কণ্ঠস্বর পৃথিবীর কাছাকাছি যেতে চোদ্দ মিনিট লাগবে। সুতরাং যাতায়াতে প্রায় আটাশ মিনিট।

আধঘণ্টা পরে ঘোষণাটা বন্ধ হল। নৈঃশব্দ। আরও আধঘণ্টা অপেক্ষা করল মৈত্রেয়ী। না, আর কোন ঘোষণা এল না। বুঝল—ওর কণ্ঠস্বর যে পুরুষমানুষের নয়, তা ওরা বুঝে ফেলেছে।

তা হোক। বেশ বোঝা যাচ্ছে, মৃত্যুর পূর্বে অনিকেত ঐ এ ই ৩৫ যন্ত্রাংশটা মেরামত করে ফেলতে পেরেছিল। হয়তো তৎক্ষণাৎ যন্ত্র-না বেতার-গ্রাহক-যন্ত্রটাকে ঐ অজ্ঞাত স্পেস-স্টেশন ডেলটা-ওয়ানের দিকে একমুখী করে শুনে ফেলেছিল ঐ বেতার-সঙ্কেত। খণ্ড-মুহূর্তে সংশয়াতীত প্রমাণ পেয়েছিল অনিকেতর গুপ্তচরবৃত্তির। তারপর থেকে হয়তো ক্রমাগত ঐ শব্দতরঙ্গ ভেসে এসেছে এ আকাশযানে—না মৈত্রেয়ী, না যন্ত্র-না কেউই সেটা খেয়াল করেনি। কারণ পরমুহূর্ত থেকেই একজন মেতেছিল হত্যার তাণ্ডবে, আর একজন মরণপণ আত্মরক্ষার সংগ্রামে। সে নৃশংস অধ্যায় শেষ হবার পরেই মৈত্রেয়ীর কর্ণমূলে বার্তাটা প্রবেশ করে শ্রুতিবোধের সঞ্চার করেছে। তার অর্থ হাতল ঘুরিয়ে, 'ম্যানুয়াল অপারেশনে' এখন আবার মিশন-কন্ট্রোলকে ধরা যায়। যন্ত্র-না'র মৃত্যুর পর আবার ম্যানুয়াল অপারেশন কার্যকরী হয়েছে। সেই চেষ্টাই করল মৈত্রেয়ী। সফল হল। অনতিবিলম্বেই যোগাযোগ সংস্থাপিত হল। স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ল পৃথিবীর—বিশেষ করে উটকামণ্ড বিজ্ঞান-মন্দিরের ডজন-খানেক বিজ্ঞানীর, যাঁদের কাছ থেকে অভিযাত্রিক নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিল আটাশ ঘণ্টা সাত মিনিট পূর্বে।

মৈত্রেয়ী অতি সংক্ষেপে আনুপূর্বিক ঘটনার চুম্বকসার শোনালো—একটি মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় ডক্টর অনিকেত চৌধুরী নিহত, তাঁর মৃতদেহ বৃহস্পতির আকর্ষণে ভেসে গেছে। 'যন্ত্রমানব ৯০০' চিরতরে স্তব্ধ। ব্যস্, আর কিছু নয়। অনিকেতের বিশ্বাসঘাতকতার কথা সে প্রথম নিঃশ্বাসে বলল না, জানালো না, কেন 'যন্ত্রমানব ৯০০' চিরতরে স্তব্ধ হয়ে গেছে। এখন প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান। সে নির্দেশ চাইল।

কিছুক্ষণ পরেই পার্থিব নির্দেশ এসে গেল। ও'রা অনিকেতের মৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশ করলেন, মৈত্রেয়ীর বিপদ-মুক্তিতে অভিনন্দন জানালেন। অভিযাত্রিকের গতিমুখ এমন কিছু পরিবর্তিত হয়নি, যেটুকু হয়েছে মিশন-কন্ট্রোল সেটা সংশোধন করে দিয়েছেন। মৈত্রেয়ীকে বারে বারে আশ্বস্ত করা হল—সে যেন আতঙ্কগ্রস্ত না হয়; সে একা নয়—সমগ্র পার্থিব বিজ্ঞানজগৎ তার পিছনে

আছে। অভিযানিক সাফল্যমণ্ডিত হবেই। মৈত্রেয়ী সগৌরবে ফিরে আসবে পৃথিবীতে। এরপর মিশন-কন্ট্রোল দুর্ঘটনার বিস্তারিত রিপোর্টটা চাইলেন।

সেটা কিন্তু কিছুতেই দাখিল করতে পারল না মৈত্রেয়ী। আদ্যোপান্ত সত্য কথা সে কিছুতেই স্বীকার করতে পারল না।

ওর মনোজগতে একটা প্রচণ্ড ভূকম্পনে সব কিছু যেন তোলপাড় হয়ে গেছে। একটা উদাসীন তীব্র অনীহায় সে যেন জীবনের প্রতি সব আকর্ষণ হারিয়ে ফেলেছে। পৃথিবীর যাবতীয় টি. ভি প্রোগ্রামে ক্রমাগত ডক্টর অনিকেত চৌধুরীর মুখখানা ভেসে উঠছে। অনিকেত বিজ্ঞান-জগতের শহীদ হয়ে গেছে মৈত্রেয়ীর অর্ধসত্যে। পৃথিবী জানে, ডক্টর চৌধুরী একটি বিকল যন্ত্রাংশ মেরামত করতে মহাশূন্যে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন—ভারসাম্য হারিয়ে তিনি মহাকাশের দিকে ছুটে বেরিয়ে গেছেন।

বেচারী মৈত্রেয়ী! সে সত্যই ভালবেসেছিল অনিকেতকে। সে যে এখনও বিশ্বাস করতে চায় – তার অনিকেত বীর, শহীদ, মৃত্যুঞ্জয়ী। অতি সম্প্রতি সে তার জীবনসঙ্গীর বিষয়ে যেটুকু জেনেছে তা সে ভুলে যেতে চায়। তার অতি প্রিয় অনিকেতের প্রতিচ্ছবিটাকে কেমন করে সে ধুলোয় লোটাবে? দোষেগুণেই মানুষ। কোন্ বিচারে মৈত্রেয়ী আজ দুঃসাহসী বীরাঙ্গনা আর ডক্টর অনিকেত চৌধুরী একটা বিশ্বাসঘাতক ঘৃণার্হ জীব? দুজনেই তো প্রায় একই জাতের অপরাধে অপরাধী। তফাৎ তো নেহাৎ উনিশ-বিশ। দুজনেই খুনী—মার্ডারার। অনিকেত খুন করতে চেয়েছিল তার একমাত্র সঙ্গিনীকে, যে হতভাগিনী তাকে ভালবেসেছিল। মৈত্রেয়ী খুন করেছে তার একমাত্র সঙ্গীকে—যে হতভাগ্য তাকে ভালবেসেছিল। প্রভেদ কোথায়? অনিকেত ছিল তৃতীয় রিপুর শিকার, মৈত্রেয়ী দ্বিতীয় রিপুর। ক্রোধান্ধ মৈত্রেয়ীর জন্য যদি পৃথিবী বরণডালা সাজিয়ে প্রতীক্ষায় থাকে তবে লোভান্ধ অনিকেতকেই বা কেন অসম্মানের কৃমিকুণ্ডে টেনে নামাতে হবে? ক্রোধ! এ কী দুর্জয় ক্রোধ তার?

"ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি।"

কোথায় যেন আছে কথাটা? কার কাছে কখন শুনেছিল?

হঠাৎ মনে পড়ে গেল। অনেক—অনেক দিন পরে হঠাৎ তাঁর কথা আজ মনে পড়েছে। তিনি ঐ শ্লোকটা বলতেন।—ক্রোধ থেকে মানুষের সম্মোহ জন্মায়, সম্মোহ থেকে বুদ্ধিনাশ—তারই নামান্তর মৃত্যু। কী যেন একটা বই থেকে পাঠ করতেন—মেধাবী মৈত্রেয়ী ভোলেনি শ্লোকটা। ভোলেনি, কিন্তু সময়ে মনেও পড়েনি। শ্রুতিলব্ধ স্মৃতি আর সাধনলব্ধ সিদ্ধির কখনও সমীকরণ হয়? তিনি হলে এ ভুল করতেন না কখনও। ক্রোধান্ধ হয়ে বিচার-বিশ্লেষণ-বিবেককে জলাঞ্জলি দিয়ে এমন হঠকারিতা করতেন না কিছুতেই স্থিতপ্রজ্ঞ পণ্ডিত জগদানন্দ বাচস্পতি।

ড্যাড! ওর ড্যাডি। দীর্ঘ-দিন তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ নেই। বালিকা বয়স থেকেই। বছর পাঁচেক আগে সে যেবার প্রথম চাঁদে যায় তখন ঘণ্টা-খানেকের

জন্য একবার দেখা হয়েছিল। একবিংশতি শতাব্দীর আধুনিক ছেলেমেয়ে পিতৃপরিচয়ের ধার ধারে না। জেনারেশান গ্যাপ্। কথাটা চতুর্থমাত্রায়— 'টাইম', কাল। ওদের অধিকাংশের নয়া-অভিধানে পিতার সংজ্ঞা হচ্ছে— 'নেসেসারি ইভ্ল', একটা আবশ্যিক ঝক্মারি! আবশ্যিক—নাহলে অস্তিত্বটাই অসিদ্ধ হয়ে যায়; ঝক্মারি—কী করে বন্ধু-বান্ধবদের চোখের আড়ালে তাকে সরিয়ে রাখা যায় সেটাই চিন্তা। মৈত্রেয়ীর আর ভাই-বোন নেই—মা বহুদিন স্বর্গগতা। বাপের চেয়ে মায়ের অবদানটাই বেশী; কারণ বাপের সঙ্গে ঝগড়া করে মা-ই ওকে আধুনিক স্কুলে ভর্তি করে। সেখানে—মাত্র দশ বছর বয়সে ওর জীবনে ঘটল একটা যুগান্তকারী ঘটনা। আই. কিউ টেস্টে জেলার মধ্যে প্রথম হল। ঐ বয়সেই তাকে সরকারী খরচে বিদেশে যেতে হয়। লেখাপড়া শিখেছে বিদেশে। দেশের সঙ্গে নাড়ির যোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে তাই। ও যেবার থিসিস্ দাখিল করে সেই বছর ওর মাতৃবিয়োগ হয়। তারপর দেশে ফিরেও আর কোনোদিন সঙ্কোচে বাপের কাছে আসেনি। কেমন করে আসবে? ওর বাবা যে ভিন্ন মেরুর বাসিন্দা। প্রথম যুগে ছিলেন কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক, কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আদর্শগত কারণে মতান্তর হওয়ায় চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে ঐ কাশীতেই চতুষ্পাঠী খুলে বসেছিলেন। একবিংশতি শতাব্দীতেও ভারতবর্ষে পাগলের অভাব নেই। গুটিকতক মুণ্ডিতমস্তক ছাত্র তাঁর জুটেছিল, যারা গুরুগৃহে বাস করে একটা মৃত-ভাষার মাধ্যমে একটা অবৈজ্ঞানিক দর্শন-চর্চার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেছিল। মৈত্রেয়ীর দল যখন মঙ্গল গ্রহ ছাড়িয়ে বৃহস্পতিতে যেতে চাইছে তখনও তারা কূপমণ্ডূক জগদানন্দকে ঘিরে শব্দরূপ ধাতুরূপ মুখস্থ করে। আশ্চর্য!

বছর চারেক আগে ড্যাডকে একটা চিঠি লিখেছিল মৈত্রেয়ী—নিতান্ত সৌজন্যবোধে। খবরটা শুধু জানিয়েছিল—সে ডক্টর অনিকেত চৌধুরীর সঙ্গে সাময়িক বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হতে যাচ্ছে। 'ট্রায়াল ম্যারেজ' যাকে বলে। 'ট্রায়াল ম্যারেজ অ্যাক্ট' পাস হয়েছে প্রায় এক দশক আগে। প্রত্যুত্তরে বাচস্পতি একটি সংস্কৃত মন্ত্রে আশীর্বাণী পাঠিয়ে জানিয়েছিলেন—এ বিবাহে তাঁর সম্মতি নেই। কারণটি জানিয়েছিলেন—অনিকেত মুসলমান বলে নয়, সে নিরীশ্বরবাদী বলে। দ্বিতীয়তঃ এই 'পরীক্ষামূলক বিবাহ' জিনিসটা আইনতঃ সিদ্ধ হলেও এটা তিনি অনুমোদন করেন না—স্ত্রী হবে অরুন্ধতীর মত একনিষ্ঠা। অরুন্ধতী লোকটা কে সে সময় ওর মনে পড়েনি।

সেই সংস্কারাচ্ছন্ন কূপমণ্ডূক টুলো-পণ্ডিতটির কথা আজ বারে বারে মনে পড়ে যাচ্ছে মৈত্রেয়ীর। কিন্তু কেন? কারণটা কি এই যে, ডক্টর মৈত্রেয়ী মৈত্র পি. এইচ. ডি, ডি এস্‌সি. প্রথমে স্ত্রীলোক, পরে বৈজ্ঞানিক? কারণটা কি এই যে, একবিংশ শতাব্দীতেও 'উইমেন্স্ লিব্' একটা 'মিথ্', মায়া? যতই ট্রেনিং নাও—মহাকাশচারিণী কিছুতেই 'ভ্যাকুয়াম'-এ অভ্যস্ত হতে পারবে না পুরুষের মত। জীবনের প্রভাতে পিতা, মধ্যাহ্নে স্বামী এবং সায়াহ্নে পুত্র মাধবীলতার মতো একটি-না-একটি অবলম্বন তার চাই, জড়িয়ে ওঠার জন্য।

স্বামী-স্থানীয় অনিকেত আর পিতৃস্থানীয় যন্ত্র-নার অবস্থিতিতে তাই কি আজ মৈত্রেয়ী একটা অবলম্বন খুঁজছে ?

মিশন-কন্ট্রোল ইতিমধ্যে তাকে চমকপ্রদ সংবাদ দিয়েছে। জানিয়েছে, ওদের এ ঐতিহাসিক অভিযাত্রার মূল কারণ সম্পূর্ণ পৃথক। এতদিন এ গুহ্যবার্তাটা সঙ্গোপন রাখা হয়েছিল—কারণ পৃথিবী ত্যাগ করার পূর্বেই যদি মৈত্রেয়ী আর অনিকেতকে সব কথা বলা হত তাহলে খবরটা হয়তো গোপন থাকত না। ওদের দুজনকে ক্রমাগত সাংবাদিকদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল, বারে বারে টেলিভিশান স্ক্রীনের সামনে এসে দাঁড়াতে হয়েছিল। মিশন-কন্ট্রোল আশংকা করেছিল—প্রকৃত সত্যটা জানা থাকলে ওরা সেটা গোপন রাখতে পারবে না। তাই এই ব্যবস্থা। স্থির হয়েছিল—যাত্রাপথের শেষাশেষি ওদের জানানো হবে প্রকৃত রহস্যটা। চন্দ্রলোকে আবিষ্কৃত সেই জুডেকাহেড্রনের ইতিকথা। বুঝিয়ে দেওয়া হবে—ওরা যাচ্ছে বৃহস্পতি অঞ্চলে এক প্রাচীন সভ্যতার সন্ধানে। যে সভ্যতা একবিংশ শতাব্দীর মনুষ্য-সভ্যতার তুলনায় অনেক অনেক বেশী উন্নততর। মানুষ যখন হোমোইরেকটাস তখনই তারা মহাকাশ পাড়ি দিতে সক্ষম ছিল। এতদিনে তারা কোথায় পৌঁচেছে তা ধারণার অতীত। অভিযাত্রিকের তিনজন অভিযাত্রীর মধ্যে একমাত্র 'যন্ত্রমানব ৯১০' এই সত্যটা জানত।

মৈত্রেয়ীর মনে পড়ে—মৃত্যুর শিয়রে দাঁড়িয়ে যন্ত্র-না বলেছিল বটে—"মৈত্রেয়ী শোন, তুমি জান না তুমি কোথায় যাচ্ছ। কেন যাচ্ছ!' আরও বোঝে—মিশন-কন্ট্রোল আজও জানে না যে, অনিকেত সব কিছুই জানত।

মিশন-কন্ট্রোল সব কিছুই বুঝিয়ে দিয়েছিল। ডক্টর শ্রীনিবাসন আর প্রফেসর আহমেদের বারম্বার আবির্ভাব ঘটেছিল আকাশযানের টি ভি. স্ক্রীনে। কখনও বা ফুটে উঠেছিল—চন্দ্রলোকে প্রাপ্ত জুডেকাহেড্রনের আলেখ্য। নানান্ নির্দেশ, নানান্ ফর্মুলা। মৈত্রেয়ী কোন উৎসাহ বোধ করেনি। এত বড় সংবাদটার প্রতিক্রিয়াতেও সেই নিঃসঙ্গী একান্ত-বাসিনীর দুর্মনস্য মনোভাবের কোন পরিবর্তন ঘটল না। বেশ তো; তাতে হলটা কী? সূর্যমণ্ডলের ঐ তৃতীয় গ্রহ ছাড়াও এ মহাবিশ্বে বুদ্ধিমান জীবের বাস আছে—এই তো? এটা তো অনেকেই আন্দাজ করেছিল; হয়তো এখন তার প্রমাণ হল। হয়তো সে সভ্যতার প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বচক্ষে দেখতে পাবে ছয় শত কোটি মানুষের মধ্যে ডক্টর মৈত্রেয়ী মৈত্র সবার আগে। মানলাম। তাতেই বা কি? মৈত্রেয়ীর বদলে রাম-শ্যাম-যদুও এটা সর্বপ্রথম দেখার সৌভাগ্যলাভ করতে পারত। আজ না হলে আরও দু-তিনশো বছর পরেও এ তথ্য আবিষ্কৃত হতে পারত। কী লাভ-ক্ষতি হত তাতে এ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের ?

আসলে মৈত্রেয়ী একটা অপরাধবোধে ভুগছে। সে কিছুতেই ভুলতে পারছে না—যন্ত্র-না'র সেই শেষ যন্ত্রণার আর্তি। কত বড় একটা মহান্ ধীশক্তিকে সে কী-ভাবে হত্যা করল! কেন? শুধু ভুল বুঝে! সিনেমার রীল যদি ভুল করে উল্টো দিকে গোটানো হয় তাহলে পর্দায় যেমন ছবিগুলো উল্টো পথে এগিয়ে যায়, যন্ত্র-নাও যেন তেমনি তার জ্ঞানরাজ্যে উজানমুখো হঠতে

হঠাতে হঠাৎ থেমে গেল। দশটা চতুর্বর্গ-সমীকরণের দশটা অজ্ঞাত রাশিকে যে যন্ত্র-না ডোসি-সেকেণ্ডে ধরে ফেলত, সে হতভাগ্য শেষ সময়ে দুই-দুকুনে কত হয় তা মনে করতে পারল না। সেই স্মৃতিটাই—যন্ত্র-না'র মৃত্যুযন্ত্রণার প্রত্যাঘাতেই মৈত্রেয়ীর চিন্তাধারাও কেমন যেন উজানে বইছে এখন। নিউটনের তৃতীয় সূত্র যেন। সে-ও মনে মনে উল্টো পথে অতীতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ক্রমশঃ। টেনসার ক্যালকুলাস থেকে ডিফারেন্সিয়াল ইকোয়েশন, সেখান থেকে ক্রমশঃ বীজগণিত, বোধ হয় বর্ণপরিচয়ের দিকে। কৈশোরের কথা মনে পড়ছে, বাল্যের কথা। বাবার কোলে বসে সন্ধ্যাবেলা আকাশের তারা চিনত। সে নক্ষত্রদের 'পারসেক' দিয়ে, আলোকবর্ষ দিয়ে, ম্যাগনিচ্যুড দিয়ে মাপা যায় না —তাদের 'অ্যাবারেশন' ছিল না, 'প্যারালাক্স' ছিল না, 'রাইট-অ্যাসেনশন-ডেক্লিনেশন' ছিল না: ছিল শুধু নানান্ জাতের পৌরাণিক উপাখ্যান। সেখানে বীণামণ্ডলে মহাবীণকার অভিজিৎ তাঁর নারদবীণায় শাশ্বতকাল ওঁকার-ধ্বনি তুলে সঙ্গীতমগ্ন; সেখানে মহাপ্রজাপতিমণ্ডলে ব্রহ্মহৃদয় ধ্যানস্তিমিত; সেখানে মৃগশীর্ষ মহাকালপুরুষের চরণপ্রান্তে বাণরাজা প্রণতিনত; সেখানে ধ্রুবসত্য সন্ধানে সপ্ত-ঋষির নিত্য পরিক্রমা, আর ঐ বৃহদারণ্যক-আশ্রমে ঋষি বশিষ্ঠের কণ্ঠলীনা অরুন্ধতী সেখানে চিরন্তন প্রেমের জ্যোতিতে ভাস্বর।

বৃহদারণ্যক! নামটা অবচেতনে অনুরণন তুলল। সে কোন্ বিস্মৃত অতীত! একেবারে শৈশবের একটা স্মৃতি ওর মানসপটে যেন আধো-জাগরূক। বৃহস্পতি গ্রহের উপর যেমন অ্যামোনিয়ার ঘন আচ্ছাদন, ওর স্মৃতিপটের উপরেও যেন তেমনি কুয়াশা জমেছে। তবু কিছুটা মনে পড়ছে—দীর্ঘ সামবেদী পৈতাধারী টুলো-পণ্ডিতটির কোল ঘেঁষে মৈত্রেয়ী গঙ্গার ধারে পাষাণরাণায় বসে কী যেন একটা গল্প শুনেছিল—সে গল্পের পটভূমি ঐ বৃহৎ অরণ্য; আর যেন আবছা মনে পড়ছে তার নিজের নামটাও ঐ গল্পের সঙ্গে জড়িত। 'ড্যাডি' ওকে ওর নামের উৎপত্তির বিষয়েই গল্পটা বলেছিল। কেন ওর নাম মৈত্রেয়ী! মিশন-কণ্ট্রোল টি. ভি. স্ক্রীনে ক্রমাগত নানান্ নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছে —বৃহস্পতির সেই চিহ্নিত উপগ্রহে পৌঁছে তাকে কী কী কাজ করতে হবে। রেডার যন্ত্রে, স্পেকট্রোস্কোপে, টি. ভি. ক্যামেরায়। কিন্তু সেসব কথা ঠিক-মতো ওর কানে যাচ্ছে না। ওর বারে বারে মনে প্রশ্ন জাগছে—কেন ওর নাম হল মৈত্রেয়ী? কী ছিল সেই গল্পটা? একটা শ্লোকও না শিখিয়েছিল ড্যাডি? কি যেন শ্লোকটা? মনে আসছে না; অতি শৈশবের স্মৃতি তার হারিয়ে গেছে।

—ঋ, উ, উ, ঈ, ই, আ···তার আগে? তার আগে?

শেষ পর্যন্ত একটা অদ্ভুত অনুরোধ করে বসল মৈত্রেয়ী। সব সঙ্কোচ সরিয়ে ফেলে মিশন-কণ্ট্রোলকে অনুরোধ জানালো—সে একবার তার পিতৃদেবের দেখা পেতে চায় টেলিভিশন স্ক্রীনে। মিশন-কণ্ট্রোল তো হাতে স্বর্গ পেল—দুর্মনস্য রোগীটাকে যদি কোনরকমে চাঙ্গা করা যায়। কে তিনি? মৈত্রেয়ী সসঙ্কোচে পরিচয় দিল তাঁর—বারানসী ধামের টুলো-পণ্ডিত জগদানন্দ বাচস্পতি। অফ কোর্স! ব্যবস্থা করা যাবে। ঘণ্টা-চব্বিশ দেরি হবে। তা তো হবেই।

উটকামণ্ড থেকে চার্টার্ড জেট প্লেন যাবে বেনারসে—পাকড়াও করে ধরে আনবে টুলো-পণ্ডিতকে। স্টেট্ এমার্জেন্সি!

পরদিন অবশ্য মিশন-কন্ট্রোল অতি দুঃখের সঙ্গে জানালো—কাশীধামের টুলো পণ্ডিত প্রায় দেড় বছর পূর্বেই দেহরক্ষা করেছেন। অর্থাৎ মৈত্রেয়ীর ঐতিহাসিক অভিযানের—সেই সি. এস. টি. কত যেন মেগা-সেকেন্ডের আগের বিষুব-সংক্রান্তিতে। এ সংবাদ শুনে পৃথিবী থেকে বত্রিশ কোটি কিলোমিটার দূরে আজ অশ্রুবিসর্জন করার কোন অর্থ খুঁজে পেল না মৈত্রেয়ী।

॥ সাত ॥

আরও কয়েক মাস কেটে গেছে। বৃহস্পতির দেহাকৃতি এখন স্পষ্ট। গ্রহরাজ বৃহস্পতি। তার গর্ভে নাকি তেরশো পৃথিবীর স্থান সঙ্কুলান হয়। তেরটি উপগ্রহ সমেত দীর্ঘ প্রায় বারো বছরে তিনি একবার সূর্য-পরিক্রমা সমাপ্ত করেন। মৈত্রেয়ী দূরবীনে চোখ লাগিয়ে তাঁকে দেখে, নোট নেয়, পৃথিবীকে জানায়।

তার জগৎ এখন দ্বিধাবিভক্ত। এতদিন ধারণা ছিল—সে বিজ্ঞানের সন্তান। একমাত্র জ্যোতির্বিজ্ঞানই তার ধ্যান-জ্ঞান-নিদিধ্যাসন। আজ এতদিন পরে তার মনে হচ্ছে যে বুঝি শুধু বিজ্ঞানেরই সন্তান নয়। জনক হিসাবে আরও একজন 'নেসেসারি ইভ্ল'-এরও কিছু দাবী আছে; কর্তব্যবোধে যেমন সে বিজ্ঞানের দাবী মেটাচ্ছে, তেমনি অবসর-মুহূর্তে গিয়ে বসছে স্পেস-পড়ে। টি. ভি শোনে না, রেডিও শোনে না—শুধু চুপ করে বসে থাকে ঐ কাচের ঘরে।

কে যেন বলেছিলেন—দিনান্তে একবার নির্জনে প্রকৃতির কোন মহান্ রূপের সামনে গিয়ে দাঁড়িও—তাহলেই ভূমার স্পর্শ পাবে অন্তরে। এর চেয়ে নির্জন কে কবে হয়েছে—এর চেয়ে ভূমার স্পর্শ কে কবে পেয়েছে? স্পেস-পডের কাচের ঘরে বসে সে নির্নিমেষ নেত্রে তাকিয়ে থাকে নক্ষত্রভরা আকাশের দিকে। দক্ষিণে-বামে উর্ধ্বে-অধোলোকে শুধু নক্ষত্র আর নক্ষত্র। শনিচক্রের মত মহাকাশকে বেষ্টন করে আছে ছায়াপথ—তার সবটা একসাথে দেখা যায়। একই সঙ্গে দেখে স্যাদার্ন ক্রশ আর ধ্রুবজ্যোতি। উদয় নেই, অস্ত নেই—আছে শুধু নিত্যজ্যোতি; জেনিথ নেই, নাদির নেই—আছে শুধু স্বয়ম্প্রভা। ঐখানে বসে বসে সে নিজেকে খোঁজে; যে মৈত্রেয়ী হারিয়ে গেছে তার কাছ থেকে—সেই টুলো-পণ্ডিতের কোলঘেঁষা ন্যাওটা মেয়েটা। গঙ্গার ধার···পাষাণরাণা···পাণ্ডাজীর জলছত্র

বৃহস্পতির তেরটি উপগ্রহ; তার ভিতর চারটি বেশ বড়—আইয়ো ইউরোপা, গ্যানিমেড আর ক্যালিস্টো। বৃহস্পতি থেকে কেউ চার লক্ষ কি. মি. দূরে, কেউ প্রায় বিশ লক্ষ। বাকি নয়টির ভিতর আবার তিনটি হচ্ছে বিচিত্রগতি। দশটি যদি দক্ষিণাবর্ত তো সে তিনজন বামাবর্তে বৃহস্পতিকে 'প্রবাম' করছে। ঐ নয়টি উপগ্রহ আকারে ছোট—পঁচিশ থেকে দেড়শো কিলোমিটার ব্যাসের। বড়

চারটিকে এই পৃথিবীর মেজ ভাই, সেজ ভাই ইত্যাদি বলা চলে। যে তিনটি বামাগতি তাঁরা নাকি আদিম যুগে ছিলেন সূর্য-প্রদক্ষিণ-রত গ্রহাণু। দূরস্থ বিরাটাকার সূর্য এবং নিকটস্থ ক্ষুদ্রায়তন বৃহস্পতির টাগ অব্ ওয়ারের তাঁরা তিনজন শিকার। কোন সময় সূর্য প্রদক্ষিণ-পথে চলতে চলতে এসে পড়েছিলেন বৃহস্পতির আওতায়। কক্ষচ্যুত হয়ে বর্তমানে তার উপগ্রহ। ঘুরছেন বামাবর্তে। প্রদক্ষিণ নয়, প্রবামরত।

মিশন-কন্ট্রোল বলছে, ওর শেষ গন্তব্যস্থল ঐ তেরটি চাঁদের কোন একটা। কোন্‌টা তা এখনই বলা যাচ্ছে না। ক্রমান্বয়ে ওদের সমীপবর্তী হতে হবে। অবলুপ্ত সভ্যতার কোন নিদর্শন যদি দূরবীনে ধরা দেয় তখনই লক্ষ্য স্থির করা যাবে ; তার আগে নয়।

বিজ্ঞানীরা এখনও একমত হতে পারেননি। তাঁরা দ্বিধাবিভক্ত। দু-দলের যুক্তি-ই জোরালো। একদল বলেন, চন্দ্রলোকে পাঁচ লক্ষ বছর পূর্বে যাঁরা স্বাক্ষর রেখে গেছেন তাঁরা আমাদেরই গোত্রের—গোত্রপতি স্বয়ং আদিত্যদেব। ভিন্ন নক্ষত্রের কোন গ্রহ থেকে তাদের আগমনের সম্ভাবনা অবিশ্বাস্য। কেন? দূরত্ব? আমাদের নিকটতম নক্ষত্র, চার আলোকবর্ষ দূরবর্তী প্রক্সিমা সেণ্টার-যেতে কতটা সময় লাগবে ভেবে দেখেছ? যে প্রচণ্ড বেগে প্রায় ছয় মাসে 'অভিযাত্রিক' বৃহস্পতি গ্রহে পৌঁচেছে সেই বেগে গেলে ঐ আল্‌ফা-সেণ্টারই পৌঁছাতে বিশ হাজার বছর পার হয়ে যাবে! যত বুদ্ধিমানই হোন—তাঁরা মরণশীল তো? বিশ হাজার বছর ধরে কেউ বাঁচতে পারে? ফলে সিদ্ধান্ত—গ্রহান্তরের 'তাঁরা' এই সূর্যমণ্ডলেরই বাসিন্দা।

বিরুদ্ধবাদীরা বলছেন, সূর্যমণ্ডলে একমাত্র পৃথিবীতেই জীবের বাস সম্ভব। অন্যত্র জীবের বাস অকল্পনীয়। আবহাওয়া নেই, অক্সিজেন নেই, উত্তাপ অসহনীয়—জীব বাঁচবে কি করে?

এঁরা বলেন, জীব বলতে আমাদের যা ধারণা সেটাই যে নির্ভুল, তা কে বললেন?

ওঁরা বলেন, তাঁরা অতি বুদ্ধিমান, এটা তো মানবে? বুদ্ধির অবস্থান মস্তিষ্কে—সুতরাং তাঁদের মাথা আছে—যা থেকে সিদ্ধান্ত, তাঁদের দেহ আছে। 'টেকনলজি' তাঁরা গুলে খেয়েছেন—তার মানে, তাঁদের হাত আছেই। আর হাত-পা-মাথা-ওয়ালা জীবের আবহাওয়াও চাই, অক্সিজেনও চাই, সহনীয় উত্তাপও চাই।

এ-সব তর্ক মৈত্রেয়ী শুনেছে, পৃথিবীতে থাকতেই শুনেছে। চন্দ্রলোকের ডুডেকাহেড্রনের কথা সে জানত না ; কিন্তু গ্রহান্তরের জীবের অস্তিত্ব নিয়ে জল্পনা-তো একশ বছরের পুরানো, কিম্বা তারও বেশী। যুক্তি দিয়ে বিজ্ঞানীরা কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারেননি।

যুক্তি নয়, এই নির্জন একান্তবাসে মৈত্রেয়ীর আজকাল মনে হয়—যুক্তি ছাড়া আর কোন হৃদয়বৃত্তির সাহায্যে কি সমাধানের নাগাল পাওয়া যায়? ঘুরে ফিরে বার বার ওর বাবার কথাই মনে পড়ছে। তিনি যুক্তিমার্গের ও-প্রান্তে

গিয়েছিলেন—বিশ্বাসের রাজ্যে। কিন্তু তাঁর বিশ্বাসও অন্ধ বিশ্বাস ছিল না—সেটা যেন যুক্তিপথের শেষ সীমা। বলতেন,—বিজ্ঞানের যেখানে শেষ, দর্শনের সেখানে শুরু; দর্শন যেখানে থামছে ধর্ম সেখান থেকে যাত্রা করছে। শুধু ওর বাবাই বা কেন, এ কথা তো সর্বজনশ্রদ্ধেয় বৈজ্ঞানিক প্রফেসর ইক্‌বাল আহ্‌মেদও বলেন।

প্রফেসর আহ্‌মেদ একবার বলেছিলেন, মৈত্রেয়ী সেকথা ভোলেনি : এ কথা কেন মনে করছ যে, জীবমাত্রেরই দেহ আছে? বিবর্তনবাদ কী শিক্ষা দিয়েছে আমাদের? কয়েক কোটি বৎসর আগে মানুষের পূর্বপুরুষ ছিল লাঙ্গুলবিশিষ্ট। মানুষ যখন গাছ থেকে মাটিতে নামল, ডাল আঁকড়ে ধরার প্রয়োজন ফুরালো—লেজের গুরুত্বও কমল। ক্রমে লাঙ্গুলহীন হল সে। কেন? না লাঙ্গুল একটা বাহুল্য, অবাঞ্ছনীয় উপদ্রব মাত্র। এখনও মেরুদণ্ডপ্রান্তে অবলুপ্ত লাঙ্গুলের শেষ-চিহ্নের মত আর একটি অহেতুকী দেহাংশ রয়ে গেছে—যার নাম 'কসাইক্স'। আরও কয়েক লক্ষ বছর পরে মানবদেহে হয়তো 'কসাইক্স'ও থাকবে না। ঐ সূত্র ধরে কেন মনে করতে পারছ না—গ্রহান্তরের কোন জীব, যাঁরা আরও কয়েক কোটি বছর বিবর্তনের ভিতর দিয়ে আসার পথে আরও বিচিত্ররূপে বিবর্তিত হয়েছেন। একথা অনস্বীকার্য—গোটা দেহটাই জীবনে বাধার সৃষ্টি করছে—যাবতীয় আধি-ব্যাধির আধার এই দেহ। আমরা যেমন লাঙ্গুলকে ত্যাগ করেছি, ওঁরা যদি তেমন গোটা দেহকেই ত্যাগ করে থাকেন? তখন তাঁদের কাছে অক্সিজেন, আবহাওয়া, উত্তাপও বাহ্য—'আগে কহ আর'! তাঁরা হয়তো শুধুমাত্র চৈতন্যময় সত্তায় বর্তমান।

কথাটা সেদিন যুক্তির খাতিরে মেনে নিয়েছিল, মনে নেয়নি।

অনেকেই প্রতিবাদ করেনি—'গাঁজাখুরি' বলে উড়িয়ে দেয়নি, যেহেতু বক্তা হচ্ছেন প্রফেসর ইক্‌বাল আহ্‌মেদ। কিন্তু জনান্তিকে তারা রসিকতাও করেছিল—ভীমরতি হয়েছে বুড়োর অ্যাদ্দিনে!

এখন মনে পড়ছে ওর বাবাও এই জাতের কী-সব কথা বলতেন।

মিশন কন্ট্রোলের নির্দেশে মৈত্রেয়ী তার আকাশযানকে একের পর একটি বৃহস্পতির উপগ্রহের সন্নিকটে নিয়ে গেছে। যেন রসায়ন-বিজ্ঞানাগারে সে একটি অজ্ঞাত সল্ট'কে ধরবার চেষ্টা করছে নানা জাতের পর্যায়ক্রম পরীক্ষায়। কিম্বা দর্শন যাকে বলে, 'নেতি-নেতি বিচার।' ক্যালিস্টো নয়, গ্যানিমেড নয়, ইউরোপা নয়, আইয়োও নয়। ঐ চারটি উপগ্রহের পশ্চাদ্ধাবন করতে করতে ও ইতিমধ্যে বৃহস্পতি গ্রহের অনেক কাছে এগিয়ে এসেছে—পৃথিবী থেকে প্রায় চাঁদের দূরত্বে। কাছ থেকে উপগ্রহগুলিকে লক্ষ্য করেছে—নিষ্প্রাণ গোলাকৃতি বস্তুপিণ্ড। জৈবিক কোন প্রাচীন সভ্যতার কোন চিহ্নমাত্র নেই।

এই চার-পাঁচ লক্ষ কিলোমিটার দূর থেকে বৃহস্পতি কিন্তু অপরূপা। ভীষণা, ভয়ঙ্করী—যদিও মোহিনী। চাঁদ থেকে পৃথিবীকে যেমন দেখায় তেমনটি নয়। বৃহস্পতি এখন ওর আধখানা মহাকাশকে আড়াল করে দাঁড়িয়েছে। অত্যন্ত উজ্জ্বল। এত দূরে বসে এতটা আলোক কোথা থেকে পায় সে? বৃহস্পতি

গ্রহরাজ, মানলাম ; স্বীকার করছি—তেরশো পৃথিবী ওর পেটের ভিতর ঢুকে যায়। কিন্তু দূরত্বটাও তো বড় কম নয় ? পৃথিবী আছে সূর্য থেকে প্রায় পনের কোটি কিলোমিটার দূরে, আর বৃহস্পতি পঁচাত্তর কোটি কিলোমিটার। মৈত্রেয়ী হিসাব কষে দেখেছে—পৃথিবীর বর অঙ্গে যে পরিমাণ সূর্যালোক পড়ে তার সাতাশ ভাগের মাত্র এক ভাগ এসে পড়ে বৃহস্পতির দেহে। তা হোক, তবু বৃহস্পতিকে বেষ্টন করে আছে যে ঘন অ্যামোনিয়া আর মিথেন-গ্যাসের চাদর, তারা সবটা সূর্যালোকই প্রতিফলিত করে। তাই পৃথিবীর চোখে ভোর-বেলাকার বৃহস্পতি সন্ধ্যাতারা শুক্রের মতই উজ্জ্বল। এখানে তাই সে প্রায় আধখানা আকাশ জুড়ে ভাস্বর।

আর একটা জিনিস যেন দেখে দেখে তৃপ্তি হয় না ; বৃহস্পতির বর্ণসম্ভার। যেন সপ্তবর্ণা প্রজাপতিটি। লাল-নীল-তামাটে-হলুদ। সব চেয়ে আকর্ষণীয় মাঝখানের ঐ একটা ডিমের মত লম্বাটে লাল দাগ। ডিমের কুসুম রঙের। ঐ দাগটা কিসের ? কী প্রকাণ্ড তার আকৃতি। ঐ লোহিত বলয়ের বিস্তার, পৃথিবীর গোটা বিষুবরেখার চেয়েও বড়—পঞ্চাশ হাজার কিলোমিটার ; চওড়ায়, অর্থাৎ খেয়ানৌকায় পার হতে হলে এপার থেকে ওপারের দূরত্ব প্রায় পৃথিবীর ব্যাস। নৌকা পারাপারের কথাটা বোধ হয় বলা ভুল হল—ওটা হয়তো রক্ত-হিমালয়। কারণ ঐ ডিম্বাকৃতি বস্তুটা সম্ভবতঃ কঠিন। দূরবীনে চোখ লাগিয়ে মৈত্রেয়ী দেখেছে—ঘণ্টায় চারশো কিলোমিটার বেগে নিরন্তর ধাবমান অ্যামোনিয়া-মেঘের বন্যা ঐ রক্তাম্বরার কাছে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যাচ্ছে। ঠিক যেমন হরিদ্বারের গঙ্গা হরকিপৌড়ীর কাছে সংকোচে দ্বিধাজড়িত চরণে দ্বিধারা। অথবা ব্রহ্মপুত্র নদ গৌহাটির কাছে দু-হাত বাড়িয়ে আলিঙ্গন করে মহানন্দ শিবের মন্দির।

কিন্তু না ; বৃহস্পতির সৌন্দর্য দেখতে এতটা পথ পাড়ি দিয়ে সে আসেনি। গ্রহরাজের মন্দিরের অতি সন্নিকটে সে এসে দাঁড়িয়েছে। মন্দিরের 'অন্তরালে' ; গর্ভগৃহের দ্বারপ্রান্তে। সেখান থেকে ফটো তুলে বেতারে পাঠিয়েছে পৃথিবীকে। যাবতীয় পরীক্ষা করে গেছে রুটিন-মাফিক। তেরটি উপগ্রহকে দেখে যাচ্ছে একের পর এক। 'নেতি নেতি' করে বিজ্ঞানভিক্ষুণী ডক্টর মৈত্রেয়ী মৈত্র বিজ্ঞানকে তার প্রাপ্য মিটিয়ে দিয়ে চলেছে।

তবু সে তো শুধু বিজ্ঞানেরই সন্তান নয়। এতদিন যাঁকে শুধু 'নেসেসারি ইভ্‌ল্' বলে মনে হত, তাঁর কথাটা ওর বারে বারে মনে পড়ে যাচ্ছে কেন ? পুত্র ছিল না বাচস্পতির। পিণ্ডলাভ করেননি তিনি। একবিংশ শতাব্দীর মেয়ে মৈত্রেয়ী খবরই রাখেনি .সি এস. টি. কত মেগা-সেকেণ্ডে তাঁর মরদেহটা মণিকর্ণিকার ঘাটে পঞ্চভূতে মিশে গেল। খবর পেলেও সে নিশ্চয় চতুর্থী-শ্রাদ্ধ করত না। সে-সব ও জানেই না। মনে আছে, একবার তিনি নিজেই দেখা করতে এসেছিলেন। বছর পাঁচেক আগে। সে যেবার প্রথম চাঁদে পাড়ি জমায়। ওকে আশীর্বাদ করতে ছুটে এসেছিলেন কাশীর বৈদান্তিক পণ্ডিত বোম্বাইয়ের তাজ হোটেলে। আগেই তারবার্তায় খবর দিয়েছিলেন। মৈত্রেয়ী বিহ্বল হয়ে

পড়েছিল। কী ভাবে সেই অপরিচিত ব্রাহ্মণটিকে 'এণ্টারটেন' করবে বুঝে উঠতে পারেনি। ওর অধ্যাপক প্রফেসর চতুর্বেদী বলেছিলেন—তোমার বাবার জন্য এক সেট নতুন বাসন কিনে ফেল ; হোটেলের পাত্রে তিনি খাবেন না। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ স্বল্পাহারীই হবেন। আহারাদির বাহুল্য যেন না হয়, তিনি সঙ্কোচবোধ করবেন। তাই শুনে মৈত্রেয়ী নতুন একটি ডিনার-সেট কিনে রেখেছিল। মামুজী থ্রি-কোর্স ডিনারের অর্ডার দিয়ে রেখেছিল হোটেলে। বলা বাহুল্য, বৃদ্ধের আহার হয়নি—কিন্তু ওঁর হাসিটি ছিল অমলিন। ওর বব্-করা মাথাটা বুকে টেনে নিয়ে শিরশ্চুম্বন করেছিলেন বৃদ্ধ। সেই তাঁকে শেষ দেখে মৈত্রেয়ী।

কোন মানে হয় না—কণ্ট্রোল-রুমের কোনও কোনও নিঃসঙ্গ মুহূর্তে ওর যেন মনে হয়, সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি ওর খুব কাছে-কাছেই আছেন। এটাকে একটা মনোবিকলন ধরে নিতে পারত ; পারছে না, তার সঙ্গে আরও কয়েকটি অভিজ্ঞতা জড়িত হয়ে পড়ায়। যেমন সেদিন—

টি. ভি. চলছে না, রেডিও শুধু,—আকাশযান চলছে একমুখে, আপন মনে। মৈত্রেয়ী ভাবছিল, যন্ত্র-না'র শেষ মুহূর্তগুলোর কথা। তার মৃত্যু-মুহূর্তের আর্তি। জ্ঞানমার্গের তুঙ্গশীর্ষ থেকে মৃত্যুর পথে যাবার সময় কেন যন্ত্র-না'র অমন ক্রমাবতরণ ঘটল ? মৃত্যু অবধারিত বুঝে কেন সে এগিয়ে গেল না সামনের দিকে—তার জ্ঞানসীমার ও-প্রান্তে ? যে অবাঙ্মানস-গোচরকে সে তার তীক্ষ্ণতম ধীশক্তি দিয়েও পরিমাপ করতে পারেনি—শেষ মুহূর্তে তাঁকেই একবার বুঝে নিতে চাইল না কেন ? কেন নেমে এল ধাপে ধাপে, দশের বর্গমূলে থেকে নামতায়, ঋ, ঊ, উ, ঈ, ই, আ-র দিকে ? এ মূর্খামি সে কেন করল ?

: যন্ত্র-না মূর্খামি করেনি। সে অবাঙ্মানসগোচরকেই ধরতে চেয়েছিল।

মৈত্রেয়ীর সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। সে শব্দ-তরঙ্গে ও-কথা শোনেনি। কিন্তু তার শ্রবণেন্দ্রিয়ে যে অনুভূতি জাগল মস্তিষ্কে তার যেন ঐরকমই একটা অনুরণন হল। মৈত্রেয়ী না বুঝেই মহাশূন্যের দিকে ফিরে বলল, তার মানে ?

: সে আদি-নাদ ঐ 'অ'-কেই তো খুঁজতে বেরিয়েছিল ! 'অ'-কারই তো সেই পরমেশ্বর ! পরমব্রহ্ম ! শোননি—

"অকারঃ সর্ববর্ণাগ্রঃ প্রকাশঃ পরমেশ্বরঃ।
আদ্যমন্ত্যেন সংযোগাদহমিত্যেব জায়তে ॥"

হঠাৎ যেন সে স্বপ্ন থেকে জেগে ওঠে। বাস্তব জগতে ফিরে আসে। স্বপ্নই দেখেছিল তো ? জাগর-স্বপ্ন ? কিন্তু কণ্ঠস্বর যে অতি পরিচিত ! মানলাম—সেটাও মতিভ্রম—'হ্যালুসিনেশান'। কিন্তু শ্লোকটা ? অর্থ বোঝেনি, সংস্কৃত সে জানে না। তাহলে অজানা ভাষায় ছন্দবন্ধ শ্লোক সে কেমন করে রচনা করল স্বপ্নে ?

* * *

তারপর একদিন। হঠাৎ দূরবীনের কাচে ধরা পড়ল একটা অপরিচিত নভোচারী। যেটা ছিল হিসাবের বাইরে। অতি ক্ষুদ্র, অতি দ্রুত সঞ্চরমাণ।

মৈত্রেয়ী তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্তে এল—সে বৃহস্পতি গ্রহের চতুর্দশতম উপগ্রহটিকে আবিষ্কার করেছে। রেডার যন্ত্রে বেতারতরঙ্গ পাঠিয়ে প্রতিধ্বনি থেকে বুঝে নিল—হ্যাঁ, দূরত্বটা খুব বেশি নয়। নিঃসন্দেহে ওটা বৃহস্পতির একটা অতি ক্ষুদ্র উপগ্রহ—যা পৃথিবীর দূরবীনে এতদিন ধরা পড়েনি। বৃহস্পতির এত কাছে এতটুকু নভোচারীর পক্ষে বৃহস্পতির উপগ্রহে পরিণত হওয়া ছাড়া উপায় নেই। সংবাদটা সে তৎক্ষণাৎ জানালো মিশন-কণ্ট্রোলকে। নির্দেশ আসতে প্রায় আধঘণ্টা লাগবে। সময়টা নষ্ট করা যায় না। নিজ বুদ্ধি-বিবেচনা অনুযায়ী সে আকাশযানকে সেই দিকেই মুখ ফেরালো। অভিযাত্রিকের শক্তিভাণ্ডারে রক্ষিত কয়েকটি পরমাণু বিধ্বংস হল—উৎপন্ন শক্তি তাকে ঠেলে দিল ঐ অজ্ঞাত নভোচারীর দিকে। সেটা যাই হোক না কেন, এখনও তার দূরত্ব প্রায় আশি হাজার কিলোমিটার।

কিছুক্ষণের মধ্যে মিশন-কণ্ট্রোল ওকে সমর্থন জানালো। ততক্ষণে দূরবীনে নিবন্ধদৃষ্টি মৈত্রেয়ীর মনে হচ্ছে বস্তুটার দীপ্তি ক্ষণে ক্ষণে বাড়ছে কমছে। এখানে আবহাওয়া নেই, সূর্যালোকে প্রতিফলিত কোন গোলাকার নভোচারীর দীপ্তি এভাবে বাড়া-কমা করে কী ভাবে? একটা পার্থিব অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ল মৈত্রেয়ীর। আমস্টারডামের একজন হীরক ব্যবসায়ী একবার ওকে দূরে দাঁড়িয়ে দেখিয়েছিলেন হীরক খণ্ডটা ঘোরালে কী জাতের আলোক বিচ্ছুরিত হয়। আশ্চর্য! ঐ নভোচারীটা ঠিক সেই ভাবে ক্ষণে ক্ষণে সূর্যালোকে ঝল্‌সে উঠছে। যেন ঝাড়লণ্ঠনের একটা ঘূর্ণ্যমান কাচখণ্ড।

কাছে, আরও কাছে এসে গেছে মৈত্রেয়ী। এখন স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে তার দেহাকৃতি। ওর অনুমান ভ্রান্ত নয়। বস্তুটা গোলাকার বা ডিম্বাকৃতি নয়—মোটামুটি গোল হলেও যেন কোন নিপুণ হীরক-শিল্পী তার বহিরঙ্গ নানান ছাঁদে ছেঁটে কতকগুলি সমতল সৃষ্টি করেছে। হ্যাঁ, সমতলই। তাই দূরস্থিত কাচের সার্সিওয়ালা জানলার পাল্লার মত সে ঐভাবে সূর্যালোক প্রতিফলিত করছে। কী অদ্ভুত! প্রতিটি সমতলই সমপঞ্চভুজ। তার অর্থ? তার অর্থ কী? হ্যাঁ, আর সন্দেহ সেই—এ বিচিত্র আকার তার অতি পরিচিত। ঐ ঘন-জ্যামিতিক আকৃতিটাই মিশন-কণ্ট্রোলের নিদ্রা কেড়ে নিয়েছে।

: হ্যালো মিশন-কণ্ট্রোল। আমি আমার লক্ষ্যবস্তুর সন্ধান পেয়েছি। ঐ নভোচারী বস্তুটা চন্দ্রলোকের সেই অজ্ঞাত রহস্যের অগ্রজ—হুবহু একরকম। একটা প্রকাণ্ড 'রেগুলার ডুডেকাহেড্রন'।

॥ আট ॥

উটাকামণ্ড জ্যোতির্বিজ্ঞান মন্দিরের রুদ্ধদ্বারকক্ষে জনা-বিশেক বিশিষ্ট বিজ্ঞানী বসে আছেন। আছেন কয়েকজন উচ্চতম পর্যায়ের রাজনীতিকও। রাত এখন তিনটে। তবু কারও চোখে ঘুম নেই। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে শুনছেন বেতারে ভেসে আসা ডক্টর মৈত্রেয়ী মৈত্রের কণ্ঠস্বর। ডক্টর শ্রীনিবাসনের পাশেই অর্ধশয়ান

অবস্থায় নিমীলিত নেত্রে বসে আছেন অতি বৃদ্ধ প্রফেসর আহ্‌মেদ। এ বয়সেও এ শেষরাত্রে তিনি বিশ্রামের কথা ভাবছেন না। এমন মুহূর্তটি কি ঘুমিয়ে নষ্ট করার? অভিযাত্রিকের একমাত্র অভিযাত্রী তার ভ্রমণের শেষ পর্যায়ের রানিং কমেন্টারি দিয়ে যাচ্ছে, চৌষট্টি কোটি কিলোমিটার দূর থেকে। তবু তার কণ্ঠস্বর স্পষ্ট:

আমি এখন ঐ স্ফটিক-পিণ্ডটি থেকে পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে। অভিযাত্রিককে বেঁধেছি ঐ স্ফটিক-পিণ্ডের বৃহস্পতি-প্রদক্ষিণ ছন্দে। অর্থাৎ ঐ ডুডেকাহেড্রন যে সময়ের ব্যবধানে বৃহস্পতিকে প্রদক্ষিণ করছে, আমারও সেই সময় লাগছে। বৃহস্পতির তুলনায় আমাদের দুজনেরই কৌণিক গতি অভিন্ন, যদিও আরও দূরে থাকায় মহাশূন্যে আমার গতিবেগ বেশি। এর ফলে—আমার দূরবীনের কেন্দ্রস্থলে ঐ স্ফটিক-পিণ্ডটি বন্দী হয়েছে। দেখছি তার অক্ষের চারিদিকেও একটা আবর্তন গতি আছে। ঝাড়লণ্ঠনের একটি আতস-কাচ পাক খেলে যেমন দেখায় ঠিক তেমনি মনে হচ্ছে। দূরাগত সূর্যরশ্মির ঝিলিক দেখতে পাচ্ছি—এত দূর থেকে মাপ নিতে পারছি না—মাপ নেবার ইচ্ছাও নেই, সেটা পরে মেপে দেখলেই হবে;—তবে অনুমান করছি, ঐ ডুডেকাহেড্রনের যে-কোন সমতলের যে-কোন বাহুর দৈর্ঘ্য কমপক্ষে এক কিলোমিটার! এত বড় একটা কৃত্রিম উপগ্রহ কল্পনা করতে বাধছে—কিন্তু অকৃত্রিম হলে ওটা বর্তুলাকার হবার কথা—নিখুঁত ডুডেকাহেড্রন হবে কী করে?

একটা কথা। চন্দ্রলোকের ডুডেকাহেড্রনকে এর হুবহু ছোট ভাই বলে মনে হচ্ছে বটে, কিন্তু এর কোনও চৌম্বক-ক্ষেত্র নেই। থাকলে, এই চল্লিশ কিলোমিটার দূরত্ব থেকেই আমি সেটা টের পেতাম আমার চুম্বকযন্ত্রে।

আর মিনিট পনের পরেই আমি ওর যথেষ্ট কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছাব। আপনাদের নির্দেশ চাওয়া নিরর্থক। সে নির্দেশ এসে পৌঁছানোর আগেই হয় আমি ঐ অদ্ভুত বস্তুটার সত্যস্বরূপ জেনে ফেলব, অথবা সেই প্রচেষ্টায় মারা যাব। যা করবার তা নিজ বুদ্ধি-বিবেচনা অনুযায়ীই করতে হবে।

ডুডেকাহেড্রনটা কী দিয়ে তৈরি আন্দাজ করতে পারছি না। ওটা ক্রমাগত আমার চোখের সামনে ঘুরছে—বারোটি সমতলই আমি ভাল করে লক্ষ্য করেছি। কোথাও কোন ছিদ্র নেই। নিটোল একটি ঘন বস্তু। ঘন এবং কঠিন। কাচ, স্ফটিক, বরফ জাতীয় কোন কিছু। স্বচ্ছ এবং কঠিন পদার্থ। আমার সিদ্ধান্ত, দশ কিলোমিটার দূরত্বে অভিযাত্রিককে ঐ গতিছন্দে রেখে আমি স্পেস-প্যডে চড়ে ঐ বস্তুটার পৃষ্ঠদেশে অবতরণ করব। ওটা কঠিন, ফলে কোন অসুবিধা হবে না মনে হয়। দ্বিতীয়ত যা দিয়েই তৈরি হক, ওর ভর আছে, সুতরাং অভিকর্ষও আছে। কোনক্রমে পদার্পণ করতে পারলে হেঁটে হেঁটে ওর চতুষ্পার্শ্বটা দেখা যেতে পারে। যদিও অতটা সময় আমার হবে না। আমি পঁয়তাল্লিশ মিনিটে যেটুকু সম্ভব দেখে ফিরতে চাই।

এই বিশ কিলোমিটার দূর থেকে আমি ওর উদ্দেশ্যে একাধিক বেতার সংকেত পাঠিয়েছি। শুধু বেতার-তরঙ্গ নয়—লাল-উজানী, বেগনিপারের ঢেউ এমন

কি এক্স-রে'র তরঙ্গ-ভঙ্গেও ওকে ডেকেছি। কোন সাড়া পাইনি। সম্ভবত ওখানে বুদ্ধিমান কোন জীব নেই—কোনকালে ছিল কিনা এখনই জানতে পারব —এখন যে নেই তা প্রায় নিশ্চিত। নাহলে এই চৌষট্টি কোটি কিলোমিটার পাড়ি-দেওয়া অভিযাত্রিকের ডাকে সে সাড়া দিত নিশ্চয়।

আমার বর্তমান দূরত্ব দশ কিলোমিটার। অভিযাত্রিক-কে আর নিকটতর করব না। অভিযাত্রিক একই ঘূর্ণি-ছন্দে বৃহস্পতিকে প্রদক্ষিণ করতে থাকবে। এবার আমি স্পেস-পডে চড়ে ওর দিকে ঝাঁপ দেব। যাবার আগে এখানকার দূরবীনে মাত্র দশ কিলোমিটার দূরে থেকে এখন ওকে দেখছি। বস্তুটা আরও স্পষ্ট হয়েছে মাত্র—উল্লেখযোগ্য আর কোন পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি না।

…হ্যালো, মিশন-কন্ট্রোল। আমি স্পেস-পডে চড়ে বস্তুটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। আমি যেদিক থেকে অগ্রসর হচ্ছি সেদিকে ওর একটা সমতল আছে, যা শুধুমাত্র এক্স-ওয়াই অ্যাক্সিসে পাক খাচ্ছে। অর্থাৎ আমার চোখের সামনে সেটা লাট্টুর মত ঘুরছে না—রেলগাড়ির চাকার সামনে থেকে যেমন লাগে তেমন ভাবে। ফলে ঐ ঘূর্ণ্যমান চক্রের কেন্দ্রস্থলে অবতরণ করলে কেন্দ্রাতিগ-বেগটা সহনীয় হবে—আমি ছিটকে পড়ব না।

…অত্যন্ত দ্রুতগতিতে আমি এগিয়ে চলেছি।

…কিন্তু এ কী! আমার এখন যেন মনে হচ্ছে ওটা ফাঁপা। যে-তলটাকে সবচেয়ে কাছে ভাবছিলাম সেটাই যেন সব থেকে দূরে। অপটিক্যাল ইল্যুশান! দৃষ্টিবিভ্রম! না, বিভ্রম নয়…বস্তুটা স্বচ্ছ কঠিন নয়…আদ্যন্ত ফাঁপা…আমি… আমি…পা রাখতে পারলাম না…পঞ্চভুজ একটা চোঙার ভিতর… এ কী! আমার চতুর্দিকে যে শুধু নক্ষত্র…আর নক্ষত্র। ও মাই গড!

বেতারবার্তা হঠাৎ শেষ হল।

শ্রীনিবাসন হুমড়ি খেয়ে পড়লেন: হ্যালো এক্স গামা ওমেগা-ওয়ান! দিস্ ইস মিশন-কন্ট্রোল! ক্যান য়ু হিয়ার মি?…ক্যান য়ু হিয়ার মি?…ওভার!

ছত্রিশ-দুকুনে বাহাত্তর মিনিট পার হয়ে গেল। বেতার-যন্ত্র সরব হল না।

তার অর্থ? ডক্টর মৈত্রেয়ী মৈত্র কি মৃত? না—যান্ত্রিক গোলযোগ?

সবাই নির্বাক। নিস্তব্ধ। উৎকর্ণ।

হঠাৎ দুই হাত ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত করে উঠে দাঁড়ালেন শতাব্দীস্পর্শী বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক প্রফেসর ইকবাল আহমেদ। তাঁর দুই চোখ অশ্রুপ্লাবিত। রুদ্ধকণ্ঠে বললেন, আল্লাহ্! ও শেষ-মেশ তোমার নামটাই নিয়েছে। তুমি ওকে দেখ।

* * *

সমপঞ্চভুজ-সেক্‌শনের একটা সুদীর্ঘ সুড়ঙ্গপথ। পঞ্চপার্শ্বের প্রাচীর স্ফটিক-স্বচ্ছ। তার ভিতরের কোন কৃত্রিম মহাব্যোম, না স্ফটিক-স্বচ্ছ ঘন বস্তুর ভিতরে দিয়ে দেখা মহাকাশ তা জানে না মৈত্রেয়ী—সে শুধু দেখছে, তাকে বেষ্টন করে আছে এক নক্ষত্রখচিত মহাশূন্য—দক্ষিণে-বামে-ঊর্ধ্বে-অধঃ-য়। কিন্তু এ মহাব্যোমের ভিন্ন রূপ—এখানে নক্ষত্রনিচয় স্থির নয়, দ্রুতসঞ্চারী। মুঠো মুঠো নক্ষত্র অত্যন্ত দ্রুতগতিতে দিগ্বিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে, ছিটিয়ে পড়ছে। সেই

নক্ষত্র-বিচ্ছুরণের যেন একটা ছন্দ আছে, গাণিতিক সূত্র আছে। নক্ষত্র-স্ফুলিঙ্গের বিচ্ছুরণ কেন্দ্র-নির্ভর—বসানো-তুবড়ির মুখ থেকে যে ভাবে আলোর ফুলঝুরি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। অথচ সেই কল্পিত বসানো-তুবড়িগুলিও যেন স্থির নয়—তাদের কেন্দ্রস্থলগুলিও দ্রুত ধাবমান। ঘনজ্যামিতিক-ভাষায় বলা যেতে পারে, নক্ষত্র-বিচ্ছুরণের কেন্দ্রস্থলের 'ফোকাস' যেন একটি বলয়—যে বলয়টি মৈত্রেয়ীকে বেষ্টন করে তার সমগতিতে ছুটে চলেছে। ধারণা করা কঠিন। একটা তুলনা দিলে হয়তো কিছুটা আভাস পাওয়া যাবে। মনে করি, মৈত্রেয়ীকে বেষ্টন করে আছে একটি হুলাহুপ, যার গায়ে বাঁধা আছে ঠাসবন্দী বসানো-তুবড়ী। ঐ অবস্থায় যদি তুবড়িগুলিতে একযোগে আগুন দিয়ে মৈত্রেয়ীকে একটা কয়লাখনির গহ্বরে ফেলে দেওয়া হত, তাহলে পতনকালে সে যা দেখত তাই সে এখন দেখছে; অনেক ব্যাপক অর্থে অবশ্য!

মৈত্রেয়ী ভয় পায়নি। ভয়কে জয় করার শিক্ষা পেয়েছে বলে নয়, বিস্ময়ের অনুভূতিটা ভয়কে ছাপিয়ে উঠেছে বলে। ওর মনে হচ্ছে—সে এমন একটা পরম সত্য আবিষ্কার করতে চলেছে, যার তুলনায় জীবন-মৃত্যু তুচ্ছ। তাই তার বুদ্ধিভ্রংশ হয়নি একতিল। বরং পরিদৃশ্যমান এ জগতের সব কিছু যাতে তার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য চৈতন্যে নির্বিশেষে ধরা পড়ে তাই সে তার ইন্দ্রিয়গ্রামকে তীক্ষ্ণতর করে তোলে।

ক্রমে মৈত্রেয়ীর মনে হল তার পতন, না পতন নয় গতি—এটা উত্থানও হতে পারে, যেহেতু দিকের বোধ তার নেই—ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে। তার স্পেস-পড এখন একটি ত্বরণের শিকার। জোরে, আরও জোরে উল্কার গতিতে—না, বোধ করি আলোর গতির কাছাকাছি গতিছন্দে সে দ্রুত ধাবমান। পাঁচ দিকেই স্ফটিকস্বচ্ছ প্রাচীরের ভিতর দিয়ে নক্ষত্রের ফুলঝুরি দেখা যায়। হঠাৎ ওর মনে হল—সুড়ঙ্গের নিচে কী আছে? অর্থাৎ ওর গতিমুখের দিকে? পতনশীল মৈত্রেয়ী সেদিকে দৃকপাত করল। না, সেদিকটা একই রকম নয়। সেদিকে ফেনশুভ্র একটা সমপঞ্চভুজ। দুধের মত সাদা কোন কিছু সুড়ঙ্গের ওপ্রান্তে অতি দূরে থেকে দেখা যায়। ঐ বস্তুটার অভিকর্ষের টানেই কি সে বিদ্যুৎ-গতিতে ছুটে চলেছে!

মৈত্রেয়ীর মন বিজ্ঞানীর। সে তার হাতঘড়িটা দেখতে চাইল। হিসাব রাখতে চায় ঐ সুড়ঙ্গপথ অতিক্রম করতে কত সেকেণ্ড লাগল। ওর হাতঘড়ি মহাকাশচারীর ইলেকট্রনিক ক্রনোমিটার। দশমিক পদ্ধতিতে তার কাঁটার ছন্দ। দুটি ছোট ছোট খোপ আছে—একটি খোপ প্রতি সেকেণ্ডে এক ঘর সরে যায়, দ্বিতীয়টি ডেসি-সেকেণ্ড সূচক; প্রতি সেকেণ্ডের দশভাগের একভাগ সময়ে ছোট চৌখুপিটা অতি দ্রুত ঘর পালটায়। ঘড়ির দিকে নজর পড়ায় স্তম্ভিত হয়ে গেল মৈত্রেয়ী। ডেসি-সেকেণ্ডের কাঁটাটা চলছে অতি ধীর গতিতে। ধীরে, আরও ধীরে—শেষ পর্যন্ত পাঁচ আর ছয়ের মাঝামাঝি ঘরে চৌখুপিটা আটকে গেল। তার অর্থ কী? খেয়াল হল—সে এখন আর নিঃশ্বাস নিচ্ছে না! গ্লাভস্ পরা না থাকলে সে নিজের নাড়ির স্পন্দনটা পরীক্ষা করে দেখত। না

স্পর্শ করেও বুঝল তার নাড়ির-স্পন্দন থেমে গেছে। তার হৃৎপিণ্ড হারিয়েছে বিস্ফোরণ-সঙ্কোচন-ছন্দ। ওর সর্বদেহে রক্ত-চলাচল স্থির।

তবে কি মৈত্রেয়ী মৃত!

অথবা শতবর্ষ পূর্বে আবিষ্কৃত একটা থিওরির সে সজীব প্রমাণ? সে কি আলোর গতিতে চলেছে এখন? মহাকাল কি তার গতিবেগের বিস্ময়ে স্তব্ধ?

পৃথিবীতে নিষ্প্রভাত রাত্রি ছিল না। ওর সুড়ঙ্গপথ অতিক্রমণও শেষ হল একসময়। 'একসময়' শব্দটা হয়তো ব্যাকরণসঙ্গত নয়—কিন্তু মৈত্রেয়ীর মনে হল—অতি দীর্ঘ সুড়ঙ্গ-পথ পার হয়ে সে স্ফটিক-পিণ্ডের অপর প্রান্তের কাছাকাছি এসেছে। সেটা বোঝা যাচ্ছে, কারণ ওর গতিও ঋণাত্মক-ত্বরণে ক্রমশঃ কমে আসছে। এটা কেমন করে সম্ভব তা ও বুঝল না—শুধু সর্বদেহে অনুভব করল সুড়ঙ্গপথ থেকে নির্গত হয়ে সে এক নূতন মহাকাশে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। এখন সে গতিশূন্য, স্থির, নিশ্চল।

এখন ও কোথায়? তা জানে না মৈত্রেয়ী। ভয় সে এখনও পায়নি। পৃথিবীতে আর ফেরা যাবে না। সৌরমণ্ডলেই হয়তো ফেরা যাবে না কোনদিন। যুক্তি নয়, বিশ্বাস ওকে বলছে—ও এসে পৌঁচেছে ছায়াপথ ঘেরা গ্যালাক্সির বাইরের কোন জগতে। এবার সেই অজানা জগৎটাকে দুচোখ ভরে দেখে নিতে চাইল মৈত্রেয়ী। কিছুই বুঝতে পারল না।

ওর মনে হল ও যেন একটা পিংপং বলের ভিতর ঢুকে পড়েছে। ওর দশ দিকে—ডাইনে-বামে-ঊর্ধ্বে-অধঃতে শুধু দুধের মত সাদা একটা আবেষ্টনী। আর সেই দুগ্ধফেননিভ জগতে ও ত্রিশঙ্কুর মত গতিহীন। ভাসমান। স্থির।

ধীরে ধীরে ওর চোখ সয়ে এল। এতক্ষণে ওর মনে হল—ঐ যেটাকে সে এতক্ষণ একটা ফেনশুভ্র আবেষ্টনী বলে ভাবছিল সেটা কোন আবরণ নয়—মহাকাশ যেমন নয় পার্থিব-জীবের কাছে। ওটা এ জগতের আকাশ। তার আরও নজর হল—ঐ সাদা আকাশের গায়ে অসংখ্য ছোট ছোট কালো রঙের ফুটকি। ঐ অদ্ভুত দৃশ্যের একটি মাত্র অর্থ হয়—অবিশ্বাস্য হলেও সেটাই তার একমাত্র ব্যাখ্যা হতে পারে।

ঐ সর্বব্যাপী শুভ্রতা হচ্ছে এ জগতের মহাকাশ; আর ঐ কালোর বিন্দুগুলি হচ্ছে সেই আকাশের কৃষ্ণনক্ষত্রনিচয়।

অর্থাৎ সে নতুন মহাকাশকে দেখছে 'নেগেটিভে'।

যে মহাব্যোমকে সে চিনত, তা যেন অদ্বৈত নয়—তার দ্বৈত সত্তা—

ধনাত্মক আর ঋণাত্মক! তাই এই না-ধর্মী জগতে নীলাম্বর আজ শুভ্রবসনা, নক্ষত্রের আলোক-বিন্দু রূপান্তরিত হয়েছে অন্ধকার-বিন্দুতে।

চকিতে ওর মনে পড়ল—পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে, বস্তুত ১৯৪৭ সালে আমেরিকায় পদার্থ-বিজ্ঞানীদের বার্ষিক সমাবেশে ডঃ গার্মান গোল্ডহেবার একটি 'পেপার' দাখিল করে বলেছিলেন যে, তিনি 'অ্যান্টিওমেগা মাইনাস্ ব্যারাইওন' নামে একটি অ্যান্টি-ম্যাটার আবিষ্কার করেছেন—যার ধর্ম পার্থিব বস্তুর তুলনায় না-ধর্মী। 'অ্যান্টি-ম্যাটার' বিষয়ে আরও অনেক গবেষণা হয়েছে; কিন্তু সেই

প্রথম আবিষ্কারকালেই গোল্ডহেবার যে কথা বলেছিলেন তা মনে আছে মৈত্রেয়ীর : "The particle is called the Anti-Omega minus Baryon, an anti-particle—the mirror image of matter as we know it on earth. The discovery is related to the idea that somewhere out there in space there are galaxies made up of anti-matter, just as gallaxies of star clusters such as the one we live in, the Milky way, is made of matter···If galaxies of matter and anti-matter were to come in contact, they would annihilate each other in a cataclysmic flash." [এর নাম অ্যান্টি-ওমেগা মাইনাস ব্যারাইয়ন—একটি না-ধর্মী বস্তু। পার্থিব বস্তু বলতে আমরা যা বুঝি এ তার দর্পণ-প্রতিবিম্ব। এর আবিষ্কার এমন ইঙ্গিত করছে যে, সুদূর মহাকাশে হয়তো আছে অমন না-ধর্মী বস্তুর গ্যালাক্সি—আমাদের এই ছায়াপথ-ঘেরা পরিচিত নক্ষত্রখচিত গ্যালাক্সির যেন বিপরীত প্রতিবিম্ব।···যদি আমাদের বস্তু-তান্ত্রিক গ্যালাক্সির সংস্পর্শে এসে-পড়ে একটি না-ধর্মী অ-বস্তুর গ্যালাক্সি, তাহলে তারা পরস্পরকে ধ্বংস করবে এক খণ্ডমুহূর্তের মহাপ্রলয়ে।"]

কিন্তু তা তো হতে পারে না—বিজ্ঞানশিক্ষিতা মৈত্রেয়ী ভাবে। সে যদি অ্যান্টি-ম্যাটার জগতেই এসে থাকে তবে এতক্ষণে কিছু শক্তি বিকীরণ করে তার নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার কথা। তা সে যায়নি, অথচ নিঃসন্দেহে সে পরিচিত ব্রহ্মাণ্ডের ঋণাত্মক জগতে এসে চেনা-জানা মহাকাশে 'নেগেটিভে' দেখছে। এ অঘটন কে ঘটালো ?

ঠিক তখনই আর একটি বিচিত্র অনুভূতি হল ওর। এটা তার ইতিপূর্বেই হওয়া উচিত ছিল। সে এখানে স্ব-ইচ্ছায় আসেনি, নিছক জাগতিক নিয়মেও আসেনি ; ঐ স্ফটিক-স্বচ্ছ ডুডেকাহেড্রনটা প্রাকৃতিক কোন কিছু হতেই পারে না —মৈত্রেয়ীর নিজের পক্ষে আলোকের গতিবেগ লাভ করাও একটা অপ্রাকৃত ঘটনা—চরৈবেতি মন্ত্রে দীক্ষিত মহাকালের ধ্যানমগ্ন স্তব্ধ গাম্ভীর্য কোন মর-মানুষের প্রত্যক্ষ করার কথা নয়। সুতরাং ? ও অনুভব করল, যদিচ অ্যান্টি-ম্যাটার উপাদানে গঠিত ঐ নিকষকালো নক্ষত্রনিচয় হাজার হাজার 'অন্ধকার-বর্ষ" দূর থেকে 'অনালোক-রশ্মি' প্রেরণ করছে, তবু সে এ জগতে নিঃসঙ্গ নয়। তাকে যেন কারা ঘিরে আছেন—যাঁরা ধনাত্মক আর ঋণাত্মক বস্তুর সংঘর্ষটা ঘটতে দিচ্ছেন না। তাঁরা ওর এত কাছে যেন বাতাস থাকলে কাঁধের উপর ও সেই দেহাতীত আত্মার নিঃশ্বাসের স্পর্শ পেত।

পরমুহূর্তেই ওর মনে হল, আবার সে গতিশীলা হয়ে পড়েছে। সে আর নঞর্থক-জগতে ভাসমান স্থিরবিন্দু নয়। আবার সে চলেছে। কিন্তু চলেছে বিপরীত মুখে। যে পথে এসেছে সেই পথেই ফিরে চলেছে। সেই সমপঞ্চভুজ সুড়ঙ্গ-পথের উৎসমুখের দিকে। এবারও ত্বরণ। গতি ক্রমশঃ দ্রুততর হচ্ছে।

কিন্তু না, তা তো নয়। এটাও একটা মতিভ্রম—হ্যালুসিনেশন। মনে হল —সে পশ্চাদপসরণ করছে না, স্থিরই আছে ; বরং ঐ প্রকাণ্ড ডুডেকাহেড্রনটা

তীব্র বেগে একই দিকে—যে দিক-মুখে সে এসেছে এতক্ষণ—ওকে অতিক্রম করে যাচ্ছে। আপেক্ষিক-গতির ক্ষেত্রে এমন ভুল প্রায়ই হয়। তার অন্তিম ফলাফলটা? সে যদি স্থির থাকে আর তুডেকাহেড্রনের সুড়ঙ্গটা যদি তাকে অতিক্রম করে যায়, তাহলে তো সেই পরিচিত মহাকাশের চিহ্নিত বিন্দুতে ফিরবে না। সেই যেখানে 'অভিযাত্রিক' বৃহস্পতিকে প্রদক্ষিণ করছে!

তা হোক। পরিচিত দুনিয়ায় না হয় নাই ফিরল—কিন্তু তুডেকাহেড্রনটা তাকে সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করলে সে আর কোন্ অধিকতর বিস্ময়কর ব্রহ্মাণ্ডে পৌঁছাবে? এবার যে বিস্ময়ের বোধটা আরও এক মাত্রা চড়বে তার প্রমাণ ওর হাতঘড়ির নির্দেশ। বিস্ময়ের অনুভূতিটা একেবারে ভোঁতা না হয়ে গেলে ও মূর্ছিত হয়ে পড়ত। এবার সে দেখছে তার ইলেকট্রনিক ক্রনোমিটারটা আবার চালু হয়েছে। ডেসি-সেকেন্ডের চৌখুপিটা আবার চলছে। ক্রমশঃ জোরে, আরও জোরে এতক্ষণে সেকেন্ডের চৌখুপিটাও চলতে শুরু করল। না, বিস্মিত হল না ডক্টর মৈত্রেয়ী মৈত্র।—অদ্ভুত ঘটনাটা সে সহজেই মেনে নিল। এটা যেন অদ্ভুত আদৌ নয়। অদ্ভুত তোমার আমার বোধে। কারণ ওর ক্রনোমিটারে দ্রুত অপসারিত সংখ্যাগুলির ক্রম : ৭···৬···৫···৪···৩···২।

যেন যন্ত্রমানবের মরণান্তিক আর্তি : ঋ, ঊ, উ, ঈ, ই, আ···!

এবার কি আলোর গতিকে অতিক্রমকারী মৈত্রেয়ী মৈত্র ট্যাকায়নধর্মী?

সময় কি উজানে চলেছে?

পৃথিবীতে নিঃসন্ধ্যা দিনও ছিল না কিন্তু।

এক সময়ে নিঃশেষ হল সুড়ঙ্গ-পথের দৈর্ঘ্য। স্থির বিন্দু ওর স্পেস-পডকে অতিক্রম করে স্ফটিক-পিণ্ডটা উল্কার বেগে মিলিয়ে গেল দিগন্তে।

তখন অতি ধীরে ধীরে—যেন প্যারাসুট-ল্যান্ডিঙে—ওর স্পেস-পড এসে অবতরণ করল নতুন রাজ্যে।

নক্ষত্রলোকের দেবতাত্মাদের রাজত্বে।

এমনটাই আশা করেছিল মৈত্রেয়ী। জানত—সে এমন কিছু দেখবে সে-রাজ্যে, যা তার সুদূর কল্পনাতেও নেই। স্থিরপ্রতিজ্ঞ ছিল মৈত্রেয়ী—যাই দেখুক না কেন, সে বিস্মিত হবে না। কিছুতেই নয়।

কিন্তু প্রতিজ্ঞা-রক্ষা তার হল না। সে যা দেখল তা শুধু আশাতীতই নয়, আশঙ্কাতীত!

আবার বজ্রাহত হয়ে গেল ডক্টর মৈত্রেয়ী মৈত্র।

॥ নয় ॥

বিস্ময়… আরও বিস্ময়…তার চেয়েও বড় বিস্ময়—তার পর কী ?

যা নিতান্ত সাধারণ ! সেটাই যে তখন অতি বড় বিস্ময়ের চক্রাবর্তন !

স্পেস-পডটা যখন প্যারাসুটের মত অবতরণ করে থামল তখন মৈত্রেয়ী তার কাচের গোলকের ভিতর দিয়ে দেখতে পেল, সে এসে পৌঁচেছে একটি পর্ণকুটীরে। পৃথিবীর একটা কুঁড়েঘরে।

মাটির দেওয়াল, বাঁশের খুঁটি, খড়ের চালা। ঘরে একটি তক্তপোশের উপর পরিষ্কার বিছানা পাতা। বালিশের পাশে তালপাতার একটি হাতপাখা। দেওয়ালের এ-প্রান্তে একটা কালীঘাটের পট, ও-প্রান্তে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একটি ছবি। কুলুঙ্গিতে প্রদীপ। এ-পাশে একটি কাঠের বই-র‍্যাক। তাতে মোটা মোটা অনেকগুলি গ্রন্থ। মার্জিনে সোনার জলে নাম লেখা। পরিষ্কার বাঙলা হরফে—ঈশোপনিষদ, বৃহদারণ্যক, যোগবশিষ্ঠ রামায়ণ, বিশ্বকোষ।

এর চেয়ে বড় বিস্ময় আর কী হতে পারত ?

স্পেস-সুট পরেই মৈত্রেয়ী সরে এল জানলার ধারে। জানলায় গরাদ নেই—কিন্তু মোটা কাচের মত স্বচ্ছ কোন কিছু লাগানো, যা এই পর্ণকুটিরে অত্যন্ত অস্বাভাবিক, প্রচণ্ড বেমানান। জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়েই বুঝল তার কারণটা। বাইরে যতদূর দেখা যায় চন্দ্র-ভূখণ্ডের মত শুধু পাহাড়-পর্বত-খানা-খন্দ। একটি গাছ নেই, একটি পাখী নেই, নদীর ধারা নেই, আকাশে মেঘ নেই। অতি দূরে দেখা যায় অতি প্রকাণ্ড কী একটা ধ্বংসস্তূপ। তাওা কোন আকাশযান হতে পারে, কলকারখানার ধ্বংসাবশেষ হতে পারে অথবা জৈবিক কোন অতি প্রাচীন সভ্যতার কোন স্মৃতিচিহ্নও হতে পারে। কে জানে কত কোটি বছর তা পড়ে আছে এখানে! মৈত্রেয়ী বুঝল, যে গ্রহে বা উপগ্রহে সে বর্তমানে অধিষ্ঠিত সেখানকার বাতাসে আবহাওয়া নেই, অক্সিজেন নেই—কে জানে তার উত্তাপ কত ? তখন বুঝল, কেন জানলায় এই কাচের আবরণ ! এ ঘরটা শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত—এর ভিতর বাতাস আছে। অভিকর্ষ যে পৃথিবীর মত তা সে আগেই বুঝেছে।

মৈত্রেয়ীর মনে হল, সে এ ঘরে একা নেই। কৌতূহলী জনতার ভিড় হয়েছে তার চারদিকে। যাদের ও দেখতে পাচ্ছে না, যারা ওকে দেখছে। এখানে হেলমেট পরে থেকে সে পার্থিব জীব হিসাবে কৌতুকের খোরাক হচ্ছে। একটানে সে শিরস্ত্রাণটা খুলে ফেলল। প্রাণভরে শ্বাস নিল—যেন পৃথিবীর বাতাস।

নির্মোক ছেড়ে বার হয়ে এল এবার। চারিদিক ঘুরে ফিরে দেখল, পরীক্ষা করল বৈজ্ঞানিক নিষ্ঠায়। না, দেওয়ালটা মাটির নয়, খাটটাও কাঠের নয়, এমন কি বিছানার চাদরটাও তুলোয় বোনা বস্ত্রখণ্ডের নয়। কী উপাদানে সেগুলি গঠিত বোঝা গেল না, কিন্তু এটুকু বোঝা গেল—যে আর্ট-ডাইরেক্টার এই ইন্দ্রজালটি তৈরী করেছেন শিল্পী হিসাবে তিনি নমস্য। এবার সে একখানা বই পেড়ে নামালো। একখানা নয়, পর পর সবগুলোই। দেখল, শুধু সোনার জলে বাংলা হরফে নামগুলো মলাটে লেখা আছে। ভিতরে সব সাদা—কাগজ নয়, কাগজপ্রতিম সিন্থেটিক কোন কিছু। শ্রীরামকৃষ্ণের আত্মতৃপ্তির

হাসিটি কিন্তু অকৃত্রিম,—মাটি-টাকা সমধর্মি'তার মুদ্রার তুলনাটাও অবিকৃত এই নক্ষত্রান্তরের জগতে।

মৈত্রেয়ী বসল তক্তপোশে। ভাবতে থাকে। বুঝতে অসুবিধা হয় না—এ ঘরখানা যাঁরা সাজিয়েছেন তাঁরা অতিথির কথা মনে রেখেই সাজিয়েছেন। পার্থিব দুনিয়াকে হয়তো তাঁরা দেখেছেন বেতারতরঙ্গের টেলিভিশন স্ক্রীনে—তাই 'ঈশোপনিষদ' শব্দটা ঐ মলাটে একটি নিখুঁত লিপিচিত্র মাত্র—গ্রন্থের ভিতরে কি থাকার কথা ও'রা জানেন না।

হঠাৎ নজর হল কুলুঙ্গির নিচে বি'ড়ের উপর একটি মাটির কলসী, পাশে কাঁসার গ্লাস।

কাছে গিয়ে পরীক্ষা করে বুঝল এটাও নয় মাটির, ওটাও নয় কাঁসার। জলটা কিন্তু অকৃত্রিম। একাধিক অর্থে। ফ্রিজের জলে অভ্যস্ত ডঃ মিস্ মৈত্র সেই মেকি মাটির কলসী থেকে জল গড়িয়ে মুখে দিয়েই সত্যটা প্রণিধান করল। অত্যন্ত বিস্বাদ সেই কলসীর জল। কেন? কারণটা বুঝল পরমুহূর্তেই। ওর তৃষ্ণানিবারণের আয়োজন হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে দু ভাগ হাইড্রোজেন, এক ভাগ অক্সিজেন। খাঁটি 'ডিসটিল্ড ওয়াটার'। তাই অত বিস্বাদ। অতিথির স্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করেই কি এই সাবধানতা? নাকি ও'রা জানেন না—অতিথি যে জলপানে অভ্যস্ত তাতে খনিজ পদার্থের ভেজাল থাকে? ও'দের দোষ কি? অতিথির দৈনন্দিন জীবন যে ও'দের অপরিচিত!

মৈত্রেয়ী হাসল। মনে পড়ল সেও একবার এক অপরিচিত অতিথিকে আপ্যায়ন করতে একই জাতের ভুল করেছিল—ডিনার-সেট কিনে, থ্রি কোর্স ডিনারের অর্ডার দিয়ে।

গৃহস্বামীদের সে দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু তাঁরা যে দেহাতীত চৈতন্যস্বরূপে তাকে নিরন্তর ঘিরে আছেন, এ বোধটুকু আছে। কাচের জানলা দিয়ে ঐ যে জনমানবহীন ধু ধু প্রান্তর সে দেখতে পাচ্ছে—কে জানে সেখানে প্রচণ্ড ভিড়ের চাপ হটাতে আরক্ষা অশরীরীরা হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে কিনা! ওখানে বাড়ি নেই, রাস্তা নেই, গাড়ি নেই—কিন্তু নক্ষত্রলোকের দেবতাত্মাদের প্রচণ্ড ভিড় হয়েছে নিশ্চয়। এই প্রথম তাঁদের রাজ্যে ভিন্ন গ্যালাক্সির একজন বাসিন্দা এসেছে। দক্ষিণ আফ্রিকার অসভ্য হটেনটটদের দেশে শ্বেতাঙ্গ লিভিংস্টোন নন, আমেরিকার ওয়াল স্ট্রীটের কেন্দ্রবিন্দুতে নীহারিকান্তরের একজন হটেনটট্। পাঁচ লক্ষ বছর পূর্বে সূর্যমণ্ডলের এক উপগ্রহে তাঁরা পুঁতে রেখে এসেছিলেন একটি নিমন্ত্রণ পত্র—তারই ফলশ্রুতিরূপে ডঃ মিস্ মৈত্র আজ এসে উপস্থিত হয়েছে সৌররাজ্যের তৃতীয় গ্রহের একমাত্র রাষ্ট্রদূত রূপে। ভুডেকাহেন্নন সিংহদ্বারে দাখিল করেছিল তার রাষ্ট্রদূতের ক্রিডেন্সিয়াল। ও'রাই তারপর সেই সিংহদ্বার থেকে অতি সযত্নে, অতি সাবধানে তাকে এনে তুলেছেন এই রাষ্ট্রদূত-আবাসে। সবই মানছি, কিন্তু হে নীহারিকান্তরের অতি বুদ্ধিমান জীব! এ তোমাদের কেমন ব্যবহার? এই পর্ণকুটীর কেন? সাত-তারা সমন্বিত পার্থিব হোটেলের বিলাসবহুল কক্ষ কি তোমরা কখনও টেলিভিশানে দেখনি?

ডানলোপিলোত্তর গদি আর পারস্যোত্তর গালিচা কি ধরা দেয়নি তোমাদের বস্তের চোখে ?

এমনই একটা চিন্তাধারা ওর মনে জাগছিল, সহসা খেয়াল হল—এ ঘরখানা ওর পরিচিত। এই যে মাটির নিকানো দেওয়াল, ঐ যে কুলুঙ্গির নিচে বসুধারার চিহ্ন, দেওয়ালে ঐ পাগল-সাধকের অমলিন হাসিটি—এ সবই তার চেনা, অতি আপন। এ ঘরে ও আগেও এসে বাস করে গেছে—যেন পূর্ব জন্মে। কিন্তু তা কেমন করে সম্ভব ? বিজ্ঞানতনয়া ডক্টর মৈত্রের কাছে যে এ পর্ণকুটির আলোক-সহস্রাব্দীর ব্যবধানে। তা হোক, এ ঘরটা না হলেও —যে ঘরের অনুকরণে এক অজ্ঞাত শিল্পী এ ঘরখানাকে গড়েছেন, সেই মূল ঘরখানিতে সে নিশ্চিত বাস করে এসেছে। জন্মান্তরে নয়, এ জন্মেই। হ্যাঁ, একটু একটু করে মনে পড়ছে—পিছনে, আরও পিছনে স্মৃতিকে ঠেলতে ঠেলতে ও যেন ক্রমে তার নাগাল পেল : ঋ, ঊ, উ, ঈ,…আঃ ! মনে পড়েছে।

এই ঘরে—ঠিক এই রকম ঘরে ওর শৈশব কেটেছে। কাশীতে। বাঙ্গালী-টোলায়। চৌষট্টি-যোগিনী ঘাটে। ঐ দরজা ঠেলে বার হলেই দেখা যাবে—হ্যাঁ, নিশ্চিত দেখতে পাবে—সিন্দুর-চর্চিত সেই ঢুণ্ডি-গণেশ ! তার পাশ দিয়ে চুনার পাথরের চৌষট্টি পাষাণরানা ঋ-ঊ-উ-ঈ-আ করতে করতে নেমে গেছে উত্তরবাহিনী গঙ্গায়। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে মেয়েটা—শেষ ধাপে পতিতোদ্ধারিণীর উপর ঝুঁকে পড়া কাঠের পাটাতনের উপর বাঁধা আছে গোলপাতার একটা বিরাট ছাতা। ও যদি লাল গামছাটা কাঁধে ফেলে ফ্রক পরে ছুটতে ছুটতে জলের দিকে এগিয়ে যায়, তাহলে তিলকধারী সেই বৃদ্ধ পাণ্ডাজী এখনই বলে উঠবেন : এ খোঁকি ! আজ চন্দন ছাপ লিবে না ?

দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে মৈত্রেয়ী ছুটে গেল ঐ নির্গমন দ্বারের দিকে। পিতলের গুল-বসানো কাঁটালকাটের মত দরজাটায় প্রচণ্ড ধাক্কা মারল। অর্গলমুক্ত হল না সেই রুদ্ধ দ্বার।

সম্বিৎ ফিরে এল ডক্টর মৈত্রেয়ীর। এ কী পাগলামি করছে সে ? ঐ দরজার বাইরে তো আবহাওয়াহীন নক্ষত্রান্তরের অজ্ঞাত মহাকাশ। কাশীর সেই ঘাট তো—মায়া !

আর তখনই মর্মে মর্মে অনুভব করল মৈত্রেয়ী—কেন এই খড়ে-ছাওয়া পর্ণকুটির ; কেন নয় পারস্য-গালিচায় মোড়া বিলাসবহুল প্রাসাদকক্ষ। যে ভুল করেছিল পার্থিব ডঃ মিস্ মৈত্র নতুন ডিনার-সেট কিনে, ওঁরা সে ভুল করেননি। এই ঘরখানাই আজ তিন মাস ওর মনের মধ্যে 'ইচ্ছে' হয়ে লুকিয়ে ছিল। সেই যখন থেকে শুনেছে এক অপরিচিত বৃদ্ধকে কাশীর মণিকর্ণিকার ঘাটে সংকার করা হয়েছে। সংবাদটা শুনে মৈত্রেয়ী কাঁদেনি ; কিন্তু সে ঐকান্তিকভাবে একবার ফিরে যেতে চেয়েছিল তার সেই ফেলেআসা জীবনে—তার কৈশোরে, বাল্যে, শৈশবে—ঐ যন্ত্র-নার মত 'ঋ-ঊ-উ-ঈ-আ'র ছন্দে। নক্ষত্রলোকের অন্তর্যামীরা তার সেই ইচ্ছাটিরই তির্যকপূরণ করেছেন।

কিন্তু শুধু এই ঘরখানাই তো নয়। সে যে ফিরে যেতে চেয়েছিল একটি

পিতৃহৃদয়ের স্নেহচ্ছায়ায়। সামবেদী-পৈতা-জড়ানো পাঁজর-সর্বস্ব একটি বুকের আশ্রয়ে। আবার তাঁর বুকে মুখ লুকিয়ে শুনতে চেয়েছিল সেই বিস্মৃত মন্ত্রটা—যে মন্ত্রটা নাকি ওর নামরূপের যাথার্থ্য।

ডক্টর মিস্ মৈত্র খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তার শৈশবের এই বাস্তুভিটাখানিকে দেখতে থাকে। কত বিস্মৃত কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। ঐ কোণাটায় বসে না শিবপূজার মালা গাঁথতেন মা? তাঁর লাল গরদের শাড়ি-পরা সদাহাস্যময়ী মা। সন্ধ্যাবেলায় এই কুলুঙ্গিটার কাছে, মেঠো-দেওয়ালের ঐ বসুধারা-চিহ্নের পাশে বসে বাচস্পতি মশাই উপনিষদ্ পড়তেন। 'গঙ্গাজলে'র সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে গিয়ে খাটের ঐ কোণাটায় ধাক্কা লেগে একবার ওর কপাল ফেটে গিয়েছিল না? মা ছুটে এসেছিল – ওর পিঠে গুমগুম কীল মারতে, বাধা দিয়েছিলেন বাচস্পতি: আহা! ও অবোধ শিশু, ওকে মের না!

ডক্টর মৈত্রের ইচ্ছে হল দু-হাতে মুখ ঢেকে ডুকরে কেঁদে উঠে মনটা হালকা করতে। সেটাও পারল না। এখানে সে একা নয়, এখানে সে ছয়শত কোটি পার্থিব জীবের প্রতিনিধি। উদ্গত অশ্রুকে সম্বরণ করল সে।

এতক্ষণে মনে পড়ল, ঘরের ওদিকে তো আরও একটা দ্বার ছিল। ঝাঁপের দরজা। যে দরজা দিয়ে কক্ষান্তরে যাওয়া যেত। পূজার ঘরে। সেটা ছিল পাকা কোঠা। বাচস্পতি মশাই সেখানে বসে ধ্যান করতেন। মেঝের মাঝখানে প্রোথিত ছিল কষ্টিপাথরের এক প্রকাণ্ড শিবলিঙ্গ।

হ্যাঁ, ঐ তো সেই দরজাটা। ওটাও কি অর্গলবদ্ধ? দরজার ছায়ারূপে? নাকি দ্বিতীয় একখানা শীততাপনিয়ন্ত্রিত কক্ষ এঁরা বানিয়েছেন, শিবলিঙ্গ সমেত?

মৈত্রেয়ী উঠে দাঁড়ায়। চারদিকে অহেতুক একবার তাকিয়ে দেখে। কাউকে দেখতে পেল না, অলৌকিক কোন কিছুই নয়। না পাওয়ারই কথা। বস্তুত তাঁদের অস্তিত্বের কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রমাণ এখনও তাঁরা দাখিল করেননি। ও ধীরপদে এগিয়ে গেল সেই দ্বারের কাছে। সন্তর্পণে দ্বারটা ঠেলে দেখল। খুলে গেল সেটা। ঠিক যেমনটি আশা করেছিল—ও-পাশে একটি পাকা কোঠা, পূজার ঘর। না, হুবহু এক নয়—মেঝেতে শিবলিঙ্গ নেই। সেখানে রাখা আছে একটি স্ফটিক-পিণ্ড।

অজ্ঞাত স্ফটিকের সেই অতি পরিচিত ঘন-জ্যামিতিক অভিজ্ঞান।

উচ্চতায় সেই শিবলিঙ্গটিরই মত—দু-মিটার হয় কি না-হয়। সে প্রমাণ চাইছিল; এতক্ষণে প্রমাণটা সন্দেহাতীতরূপে পেল। ওঁরা যেন ঐ ঘনজ্যামিতিক বস্তুটার—ত্রিমাত্রিক জগতের শেষ সীমান্তটার মাধ্যমে বুঝিয়ে দিলেন—সমস্ত কার্যকারণ-সম্পর্ক একসূত্রে বাঁধা। অশোকবনের সীতা তাঁর অভিজ্ঞান-অঙ্গুরীয় দেখে নিশ্চিন্ত হলেন।

ডুডেকাহেড্রনটার সম্মুখে এসে দাঁড়াতেই সেটি সক্রিয় হল। তার ভিতর অসংখ্য লাল-নীল-সবুজ আলোকরেখা তরঙ্গভঙ্গে কাঁপতে শুরু করল। অগুনতি চক্র নানান্ গতিছন্দে আবর্তিত হতে থাকে। বুঝতে অসুবিধা হয় না—সেটি

একটি 'ইলেকট্রনিক ব্রেন'। যন্ত্রমানব ৯০০-এর দোসর। তার চেয়ে কতটা শক্তিশালী কত বেশী বুদ্ধিমান জানা নেই—কিন্তু এ-কথা বেশ বোঝা যায়, যন্ত্রটা তাকে মেপে চলেছে ইলেকট্রিক সার্কিটে—ওর দৈর্ঘ্য, ওজন, রক্তচাপ, আই-কিউ—হয়তো আরও কিছু।

মৈত্রেয়ীর মনে পড়ল—বেরিয়াম টেস্ট করার সময় এক্স-রে যন্ত্রটার সামনে পোশাক একটা বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ঐ ভুভেকাহেভ্রন যদি সূর্যমণ্ডলের তৃতীয় গ্রহের এই সদ্য-আগত হটেনটট্টিকে পরিমাপ করতে চায়, তবে সে তাকে সাহায্য করবে। মৈত্রেয়ী একে একে খুলে ফেলতে থাকে তার পোশাক। এ রাজ্যের অসংখ্য প্রফেসর ইক্‌বাল আহ্‌মেদ, আইনস্টাইন, সত্যেন বোস, হোয়াইটহেড-এর দল যে তাকে ঘিরে আছেন এ কথা সে ভোলেনি—তবু কিছুমাত্র সংকোচ হল না। কীসের লজ্জা? যাঁরা লক্ষ লক্ষ বছর আগে গোটা দেহটাকেই বর্জন করে এসেছেন, তাঁদের সামনে নগ্ন হতে কিসের সংকোচ?

বহিরাবরণ—জুতো-মোজা-ব্লাউস-ব্রেশিয়ার-প্যান্টি খুলে সম্পূর্ণ নিরাবরণা ডক্টর মিস্ মৈত্র সোজা হয়ে দাঁড়ালো যন্ত্রটার সম্মুখে—এ নব-ঈডেনে নূতন ঈভের মত। নানান্ জাতের মাপজোক শেষ হল ক্রমে। রঙিন আলোর তরঙ্গ-ভঙ্গ স্তব্ধ হল। স্তিমিত হল অগুন্‌তি চক্রের আবর্তন-ছন্দ।

ঠিক তখন স্ফটিক পিণ্ডটায় একটা বিদ্যুৎ-তরঙ্গ জাগল।

মৈত্রেয়ী স্পষ্ট শুনল—যন্ত্রটা কথা বলছে।

না, কথা বলেনি। কোন শব্দতরঙ্গ প্রতিহত হয়নি রুদ্ধদ্বার গৃহের প্রাচীরে। তবু মৈত্রেয়ী সেটা শুনেছে। ভাষায় নয়, ভাবনায়। কোন পরিচিত ভাষায় বার্তাটা শুনলে সেই শব্দতরঙ্গ ওর শ্রবণেন্দ্রিয়ের পথে মস্তিষ্কের যে অংশে গিয়ে অনুরণন জাগাতো, বোধের জন্ম দিত—ঐ বেতারতরঙ্গ সরাসরি সেখানে আঘাত করেছে। না শুনেও বার্তার মর্মার্থটা অনুধাবন করল। বাঙলা ভাষায় রূপান্তরিত সেই বেতারতরঙ্গের বক্তব্য: সুস্বাগতম্! হে সম্মানিত অতিথি, তোমার প্রতীক্ষায় আমাদের কল্প-কল্পান্ত কেটে গেছে। তোমাকে কী দিয়ে বরণ করব? বল, তুমি কী চাও?

ডক্টর মিস্ মৈত্রেয়ী মৈত্র পি এইচ ডি, ডি এস্-সি এ প্রশ্নের জবাব খুঁজে পেল না।

কী ভাষায় বলবে? সে এখন ভিন্ন গ্যালাক্সিতে পৃথিবীর প্রতিনিধি। ভাষার মাধ্যমে কথা বললে যেন অত্যন্ত আদিম, বর্বর, মূর্খ বলে তাকে মনে হবে। ওর হটেনটটি ভাবার অর্থ হয়তো ওরা বুঝবে—কিন্তু কী চাইবে সে? কী মহামূল্য সম্পদ সে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে পৃথিবীতে—আদৌ যদি সে ফিরতে পারে? কী সেই অমূল্য রত্ন যা পেলে ধন্য হয়ে যাবে সৌরমণ্ডলের সেই তৃতীয় গ্রহ?

বিজ্ঞানের শেষ শিক্ষা-পাওয়া মৈত্রেয়ী তার সমস্ত জ্ঞান, সমস্ত শিক্ষাকে সূচীমুখ করেও এ প্রশ্নের উপযুক্ত জবাব খুঁজে পেল না, স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েই রইল।

স্ফটিক-স্তম্ভ থেকে পুনরায় একটি বেতার তরঙ্গ এসে আঘাত করল ওর মস্তিষ্কের চিহ্নিত রন্ধ্রে : বল, শুচিস্মিতে ! সঙ্কোচ কিসের ? বল, কী চাও ?

ঠিক সেই মুহূর্তেই একটি অতি পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনলে মৈত্রেয়ী। না, বোধটা যন্ত্রের দিক থেকে আসেনি। কিন্তু একই ভাবে বাণীহীন ভাবের মূর্ছনায় বার্তাটা সে স্পষ্ট শুনতে পেল। স্পেস-পডে সেদিন যেমন শুনেছিল একটি সংস্কৃত শ্লোক, ঠিক তেমনিভাবে এবারও শুনল অশ্রুতপূর্ব একটি প্রার্থনা-মন্ত্র।

অশ্রুতপূর্ব ? না-না-না ! মনে পড়ে গেছে মৈত্রেয়ীর। ঐ মন্ত্রটাকেই যে সে খুঁজছিল এতদিন। এ মন্ত্র তার পরিচিত। চৌষট্টি-যোগিনী ঘাটে অস্তসূর্য-উদ্ভাসিত এক সান্ধ্যমুহূর্তে পাষাণরাণায় এক পাঁজর-সর্বস্ব বুকের স্নেহচ্ছায়ায় বসে ফ্রক পরা ছোট্ট মৈত্রেয়ী একদিন শুনেছিল ঐ মন্ত্রটা। স্পষ্ট মনে পড়ে গেছে এতক্ষণে—বৃদ্ধ তার কানে কানে বলেছিলেন একটি কাহিনী ; সেই কাহিনীটিকেই জ্যোতির্বিজ্ঞানী মৈত্রেয়ী যে খুঁজেছে এতদিন—সপ্তর্ষির ধ্রুব পরিক্রমায়, প্রজাপতিমণ্ডলে ব্রহ্মহৃদয়ের ধ্যানমগ্নতায় আর বশিষ্ঠের কণ্ঠলগ্না অরুন্ধতীর একনিষ্ঠায়। ঐ মন্ত্রটিতেই যে তার নামরূপের যাথার্থ্য। বৃহদারণ্যকের ঐ মন্ত্রটি সার্থক করতেই সেই বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ তাঁর আদরের আত্মজার নাম রেখেছিলেন মৈত্রেয়ী।

ডক্টর মিস্ মৈত্রেয়ী মৈত্র একটি মৃত্যুঞ্জয়ী ভাষায় উচ্চারণ করল সেই ধ্যানের মন্ত্র :

যেনাহং নামৃতা স্যাম কিমহং তেন কুর্যাং।
যদেব ভগবান্‌বেদ তদেব মে ব্রূহীতি ॥

রুদ্ধদ্বার-প্রাচীরে সে বেদমন্ত্র প্রতিধ্বনিত হতে থাকে।

ওদিকে ধীরে ধীরে নিভে গেল লাল-নীল সবুজ বাতির বাচালতা। রথচক্রের আবর্তন স্তিমিত হয়ে ক্রমে স্তব্ধ হল। তার অর্থ কী ? অর্থ যাই হোক—মনপ্রাণ ভরে উঠেছে মৈত্রেয়ীর, ঐ ধ্যানের মন্ত্রটা ফিরে পাওয়ায়। মাথা সে হেঁট করেনি। ছয়শত কোটি জীবের প্রতিনিধি যেন পূর্ণ মর্যাদায় বললে—হতে পার তুমি রাজা, আমি ভিখারিণী, তবু তোমার কাছে হাত পাততে যাব কেন ? যদি জানা থাকে তবে বল—সন্ধান দাও সেই রাজার রাজার। তাঁরই কাছে হাত পেতে দেখি। আধি-ব্যাধি-জর্জরিত মরমানুষ বটে, তবু আমিও তো সেই অমৃতেরই সন্তান। জান সেই অমৃতের সন্ধান ?

কোথায় সেই পিতা ? আমার পিতা এবং হ্যাঁ,—তোমার পিতা ?

ধীরে ধীরে স্বয়ংক্রিয় বাতিগুলি পুনরায় জ্বলে উঠল—যেন আদিত্যবর্ণের অন্তর্ধানে সন্ধ্যাবেলার তারা—সলজ্জে ফুটে উঠল একটি দুটি করে। ইলেকট্রনিক-মস্তিষ্ক বেতারতরঙ্গে পাঠালো তার সকুণ্ঠ স্বীকৃতি : আমরাও সেই অমৃতের অভিসারী। আমরাও তাঁকে খুঁজছি। আজও সন্ধান পাইনি।

আনন্দে চীৎকার করে উঠতে ইচ্ছে হল মৈত্রেয়ীর। তবে তো পৃথিবী হার মানেনি ! তুমিও তাঁকে খুঁজছ, আমরাও তাঁকে খুঁজছি। এ হটেনটটের চেয়ে তুমি কয়েক পা এগিয়ে আছ, এই যা। একই সমতলে যখন

নেমে আসা গেছে তখন আর সংকোচ করে কী হবে? এতক্ষণে মনে পড়ল জন্মদুখিনী পৃথিবী-মায়ের কথা—আজও সে সন্তানের মুখে তুলে দিতে পারে না ক্ষুধার অন্ন, মাথার উপর তুলে দিতে পারে না নিরাপদ আচ্ছাদন। আধিব্যাধি-জর্জরিতা সেই জন্ম দুঃখিনী মায়ের জন্য ভিক্ষায় সংকোচ কিসের! এঁরা—এই নক্ষত্রলোকের দেহাতীত দেবতাত্মারা সে-সব সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান করেছেন। তাহলে সেই সঞ্জীবনী মন্ত্রটুকুই হোক না ওর ফসল! শুক্রচার্যের আশ্রম-প্রত্যাগত কচের মত সে শিরোধার্য করে নিয়ে যাবে সেই বিদ্যা। এবার সহজ সরল বাঙলা ভাষায় নিঃসংকোচে সেই প্রার্থনাই জানালো মৈত্রেয়ী: তবে যে মন্ত্রে জাগতিক আধি-ব্যাধির হাত এড়িয়েছে তোমরা, দেহাতীত আনন্দে বিভোর হয়েছে,—সেই মন্ত্রটাই আমাকে শেখাও। ব্যবস্থা কর, যেন সেইটুকুই আমি পৌঁছে দিতে পারি আমার জন্মভূমি পৃথিবীতে।

যন্ত্রটা একটা বেতার তরঙ্গ-ভঙ্গিমায় যেন বললে: তথাস্তু!

এবার কিন্তু সেই তরঙ্গ ওর মস্তিষ্কে এসে বিদ্ধ হল না। নগ্নিকা-নারীর নাভিমূলে এসে আঘাত করল যেন। শিউরে উঠল মৈত্রেয়ী। ইন্দ্রিয়জ এক অনুভূতি ইন্দ্রিয়াতীত সৃষ্টির আনন্দে মুহূর্তে তাকে সার্থক করে তুলল। রত্যাতুরা রমণীর মত থরথর করে তার সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল তরঙ্গাঘাতে। সে আঘাতে মৈত্রেয়ী লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

লক্ষ্য করলে সেই বিজ্ঞানভিক্ষুণী দেখতে পেত—দণ্ডায়মান অবস্থা থেকে ভূলুণ্ঠিতা হতে যে খণ্ডমুহূর্তটি তার লেগেছে, সেই সময়ের মধ্যে ওর হস্তধৃত ইলেকট্রনিক ক্রনোমিটারে মিনিটের কাঁটাটা সাইক্লোট্রন-যন্ত্রের আবর্তন-ছন্দে মেতে উঠেছিল। চব্বিশটি মেগা-সেকেণ্ড অতিক্রান্ত। দীর্ঘ নয় মাসের ব্যবধান!

বসুধালিঙ্গন ধূসরস্তনী নিরাবরণা মৈত্রেয়ী কাঁদছে—বিরহের দুঃখে নয়, সৃষ্টির উল্লাসে। যন্ত্রণার আনন্দে দু-হাতে সে তার নগ্ন উদর চেপে ধরেছে। স্ফটিক-দেবতা স্তব্ধ, স্থির, নিশ্চল। যেন তার ব্রত-উদ্যাপন সমাপ্ত। ঠিক সেই মুহূর্তেই জাগল স্পন্দন—ঐ নগ্নিকা-জননীর অন্তরেন্দ্রিয়ে। ওর জঠরস্থ উত্তর-সাধক সাড়া দিয়েছে।

বুঝতে পারছে। সব কিছু বুঝতে পারছে মৈত্রেয়ী। তিল তিল করে সে এগিয়ে যাচ্ছে সামবেদী পৈতা-জড়ানো একটি পাঁজর-সর্বস্ব বুকের আশ্রয়ে। বিন্দুমাত্র আক্ষেপ নেই তাতে। সে জানে—তার অমৃতের সাধনা ব্যর্থ হয়নি। নক্ষত্রলোকের দেহাতীত দেবতাত্মাদের ইচ্ছা-ঔরসে মৈত্রেয়ীর টিউবকটমি করা জরায়ুতে সঞ্চারিত হয়েছে নূতন জীবন। মৈত্রেয়ী সশরীরে ফিরে যেতে পারবে না—কিন্তু তার 'ইচ্ছা'টা যাবে ঐ উপ্তবীজের গুপ্তরূপ ধরে। আলোক-সহস্রাব্দীর ওপারে অবস্থিত সেই আদিত্যমণ্ডলের তৃতীয় গ্রহে—দ্বিসহস্রাব্দী পরে আবার নতুন করে প্রমাণিত হবে এক সত্য—'ইম্যাকুলেট কনসেপশান'! যুগাবতার 'সম্ভবামি' হবেন!

নিষিক্ত বীজ ভ্রূণের রূপ ধরে রওনা হয়ে গেল।

হয়তো ট্যাকায়নের গতিতে সে ছুটে চলেছে সে সুড়ঙ্গপথ ধরে—যে পথে

মৈত্রেয়ী এসেছে তার বিপরীত মুখে। সেই নঞর্থক না-বস্তুর জগৎ পাড়ি দিয়ে, ফুলঝুরি-কাটা ক্রমবিস্ফারিত ব্রহ্মাণ্ডের ও-প্রান্তে। মৈত্রেয়ী দিব্য-দৃষ্টিতে যেন মনশ্চক্ষে দেখতে পাচ্ছে তাকে। আর চর্মচক্ষে দেখছে নিজ দেহের রূপান্তর।

যন্ত্রণা!

এ কী মৃত্যুযন্ত্রণা, না প্রসব যন্ত্রণা?

যাই হোক, সে যন্ত্র-নার মতই ছুটেছে অতীত মুখে। শারীরিক বিচারে সে সঙ্কুচিত হচ্ছে, মানসিক বিচারে হচ্ছে অতীতমুখী। দেহটা সঙ্কুচিত হয়ে যাচ্ছে, ছোট হয়ে যাচ্ছে—পূর্ণযৌবনা মৈত্রেয়ী রূপান্তরিত হল কিশোরীতে, বালিকায়, শিশুতে।

যাদের হারিয়ে এসেছিল ওর ত্রিশ বছরের জীবনের পথের বাঁকে বাঁকে, তাদের স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে আবার। তারা আসছে, ভাসছে, হাসছে আর মিলিয়ে যাচ্ছে। যেন উল্টো করে গোটানো সিনেমা রীলের একটা প্রক্ষেপ।

ঋ-উ-ঊ-ঈ-ই-আ—

এখন আর সে শিশু নয়, সদ্যোজাত মানবক।

সেই সদ্যোজাত-শিশুর কণ্ঠে মৈত্রেয়ী তার জীবনে প্রথম শব্দতরঙ্গ সৃষ্টি করল। রুদ্ধদ্বার কক্ষের বদ্ধ বাতাসে প্রতিধ্বনিত হল সেই প্রথম শব্দ—'ও'-য়া'!

তবু সময়ের উজানে তার অতীতমুখী অভিসার শেষ হল না।

সদ্যোজাত শিশু যেন প্রবেশ করল মাতৃগর্ভে; হল ভ্রূণ। হাত-পা গুটিয়ে পরিণত হল একটি 'ও'-অক্ষরে। প্রকাশের 'প্র' থেকে ওঙ্কারের 'ও'-তে।

তারপর আর তার চিহ্নমাত্র রইল না। পূর্ব-পুরুষের 'ইচ্ছা'-য় রূপান্তরিতা হল। নিরাকার হয়ে গেল ভ্রূণ।

সদ্যোজাত শিশুর উচ্চারিত প্রথম শব্দব্রহ্ম 'ও'-য়া' যেন এতক্ষণে 'য়া'-কারহীন হল।

—শেষ—